কবিতা

প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৬০ □ সর্বস্বত্ব লেখকের
উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ □
মুদ্রণে প্রদ্যোৎকুমার মান্না, বিশ্বকর্মা প্রেস, ২/১এ আশুতোষ শীল লেন,
কলকাতা-৯

সূচীপত্র

কবিতা কী এবং কেন

কবিতা কী এবং কেন এবিষয়ে মানুষের জন্মের আদিতম কাল থেকে এত আলোচনা হয়েছে যে নতুন কিছু সামান্যই বলার থাকে। বাল্মীকির শোকের উৎসারে যে শ্লোকের উদ্ভব হয়েছিল তার উত্তরাধিকার দেশে দেশে কালে কালে ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যারিস্টটলের কাব্যরূপের চিন্তা আজো আমাদের আলোচ্য বস্তু। কবির যেমন শেষ নেই—শেষ নেই তেমনি কাব্য আলোচনারও।

আলোচনার আরম্ভেই আমার মনে পড়ে গুরু-শিষ্যের সেই কথোপকথনটি :

বসওয়েল—তাহলে স্যর কবিতা কী ?

জনসন—কেন স্যর, কবিতা কী নয় সেটা বলাই ত আরো সহজ। আমরা সবাই জানি আলো কী, কিন্তু সেটা কী তা কথায় প্রকাশ করা সহজ নয়।

হাডসন অন্য এক প্রসঙ্গে সেণ্ট অগাস্টিনের উক্তির কথা উল্লেখ করেছেন এই ব্যাপারে—"যদি জিগ্যেস না করো, তাহলে আমি জানি, যদি জিগ্যেস করো, তাহলে জানি না।"

কবিতার সংজ্ঞায় কী এসে যায়—সব শিল্পের বেলায়ই তাই। কবিতা লেখার বিরাম নেই, বিরাম নেই কবির অহংকারী বাচনের : আমার এই শক্তিধর ছন্দ মর্মর কিংবা স্বর্ণখচিত স্মৃতিস্তম্ভের চেয়েও দীর্ঘায়ু, ধুলো-জমা ও সময়ের রূঢ় হাতে রুক্ষ পাথরের চেয়েও আমার এই শিল্পকর্মে তুমি উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকবে (সেক্সপীয়র, সনেট ৫৫)।

কীটস গভীরে গিয়ে বলেছিলেন—"গাছের পাতার মত স্বাভাবিকভাবে কবিতার প্রকাশ না ঘটলে কবিতা একেবারে না প্রকাশিত হওয়াই ভালো।" তিনি তাঁর কাব্যচিন্তা এইরকমভাবে জানিয়েছিলেন : "সূক্ষ্ম মাত্রাতিরেকের সাহায্যে কবিতা বিস্ময় জাগাবে, এককত্ব দিয়ে নয়, কবিতা পড়ে যেন পাঠকের মনে হয় এটা তার মহত্তম চিন্তার শব্দরূপ, যেন একটা স্মৃতিচারণ" (জন টেলরকে লিখিত পত্র, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৮)। কীটস আমাদের বিতর্কের জগতে চলে এসেছেন যখন তিনি বলেন : "স্পষ্টত উদ্দেশ্যমূলক কবিতা আমরা অপছন্দ করি —যদি মেনে না নিই ত মনে হয় সে তার ব্রিচেসের পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। কবিতাকে মহৎ হতে হবে, যেন সে গায়ে-পড়া না হয়—এমনই এক বস্তু যেন ও।

আত্মায় প্রবেশ করে, যা নিজের জন্যে চমক লাগায় না, বিষয়ের গুণেই চমক লাগায়" (রেনল্ডসকে পত্র, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৮)।

হয়ত কীটসের শেষ উক্তিটি থেকেই আমরা আমাদের যুগে চলে আসতে পারি যখন কবিতা নানাভাবে চমক লাগাচ্ছে। মধুসূদন যে-প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন—'কে কবি, শবদে শবদে বিয়া দেয় যেইজন,' সে-প্রশ্নের উত্তর-মীমাংসা কোন শেষ নিরিখে পৌছোয় নি। জীবনানন্দের সেই সন্দেহ স্মর্তব্য —'সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি'। জীবনানন্দ থেকে আমাদের যে সাম্প্রত আধুনিকতার সূত্রপাত সেই আধুনিকতার উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা কি নৈরাজ্য দেখছি না, দেখছি না কি শব্দে শব্দে যেমন-তেমন বিবাহের আয়োজন ? মধুসূদন ও জীবনানন্দ এই দুই মেরুর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথও ত কাব্যের আধুনিকতার কথা ভেবেছিলেন, তিনিও নানারকম সংশয়ের দোলায় দুলে-ছিলেন। তাঁব উক্তি : "যদি বলা হয় আগেকার কবিরা বাছাই করে কবিতা লিখতেন, অতি আধুনিকরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে, এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাত এই যে, এঁরা সর্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার শখ আছে।··· বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বল সেন্টিমেণ্টালিজম, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে" (আধুনিক কাব্য) ; "রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিন্তু রিয়ালিস্টিক বলে নয়, কবিতা বলেই···দিনক্ষণ এমন হয়েছে যে, ভাঙা ছন্দে মদের দোকানে মাতালের আড্ডার অবতারণা করলেই আধুনিকের মার্কা মিলিয়ে যাচনদার বলবে 'হাঁ, কবি বটে,' বলবে 'একেই তো বলে রিয়ালিজম্'।—আমি বলছি বলে না।···বিষয়-বাছাই নিয়ে তাব রিয়ালিজম্ নয়, রিয়ালিজম্ ফুটবে রচনার জাদুতে" (সাহিত্যের স্বরূপ)।

রবীন্দ্রনাথ যে-কথাগুলি বলেছিলেন তার যাথার্থ্য আজো লুপ্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। কাজেই আমাদের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতটি বুঝে নেওয়া দরকার এবং সেভাবেই বিজ্ঞানভিত্তিক তথা ইনডাকটিভ পদ্ধতিতে আলোচনা সম্ভব। আমাদের কবিতার আধুনিক বাগ্‌ধারা রবীন্দ্রনাথের সমসময়েই সুরু হয়েছিল। তিরিশের যুগের সেই সব কবিদের অনেকেই রবীন্দ্রবাগ্‌ধারায় লালিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে গেছেন তাঁদের বাচনিক অভিনবত্বে—যেমন

জীবনানন্দ গেছেন তাঁর চিত্রকল্পের ব্যাপ্তি ও গভীরতায়, আবিশ্ব ইতিহাসচেতনা তথা শাশ্বত মানবিক যন্ত্রণায়। যন্ত্রণা তথা বিষাদ তাঁদের এই যুগের নিঃসঙ্গ মানুষের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে; যেমন বিষ্ণু দে তাঁর ছন্দবৈচিত্র্যের আলোড়নে মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক বিক্ষোভের মূলকেন্দ্রে পৌঁছোতে চেয়েছেন। এর পরেই আমরা এসে গেলাম চল্লিশের যুগে যে-যুগকে ভূগোলের ভাষায় 'গর্জনশীল চল্লিশা' বলা যেতে পারে। বিক্ষুব্ধ সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিলই —তার মধ্যেই নানাভাবে মুখর কবিতা রচনা করলেন অনেক কবি। অনেকেই রাজনৈতিক কবিতা লিখলেন—দেশে তখন দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, যুদ্ধ ইত্যাদির দুঃস্বপ্ন ঘরে ঘরে। কবিরা সেই যুগকে তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত করে সত্য ও সুন্দরেরই রূপকার হয়েছেন। তারপর এল আমাদের পঞ্চাশের কাল।

পঞ্চাশের কালে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থিতিলাভ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে লিরিক চর্চাই প্রধান ছিল। 'শতভিষা' পত্রিকাটি এ বিষয়ে অগ্রণী ছিল। 'কৃত্তিবাস' ছিল আর একটু সোচ্চার। সামান্য কজনই এই যুগের প্রথমে রচনা সুরু করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে ষাট দশকে এসে ভঙ্গি পাল্টাতে লাগলো—দেহবাদী চমকে কবিতার চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। এল তাতে আমেরিকান প্রভাব, গরীব মধ্যবিত্তের বেমানান নাটুকেপনা—যেমন সামাজিক আচরণে, তেমনি কাব্যভাষায়। কবিতা একটা বিশিষ্ট শিল্পরূপ হয়ে দাঁড়ালো ঠিকই—আর ঢাউস পত্রিকার পাদপূরণ নয়, এলো লিটল ম্যাগাজিনের যুগ—সেখানেই যদি কবিতা তার ঔজ্জ্বল্য বজায় রেখে আটকে থাকতো তাহলে ভাল বই মন্দ হত বলে মনে হয় না। সে যাই হোক, ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যপুষ্ট মধ্যবিত্ত মানস তাবৎ ধনী দেশগুলির কাছে 'আউর হমু লাও'-এর মত চারিত্র্য অর্জন করতে তৎপর হয়ে উঠলো। দেশে দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর এমনই একটা নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কবিতা হতে গেলে কি শুধু দেহের বিশ্লেষণই হবে—লোকে অনুচ্চার্য শব্দের উচ্চারণে চমক খেয়ে ফিরে যাবে কবি সম্মেলন থেকে, এইটেই কবি ও কবিতার একমাত্র লক্ষ্য হবে? কে কার কথা শোনে? কবিতাকেও সংবাদের মতন তাৎক্ষণিক তথা চটুল হতে হয়েছে। দলে দলে তারপর কবির আবির্ভাব হতে থাকলো—ষাট দশক, সত্তর দশক, আশির দশক। কিশোরী মহিলা-কবি এখন ফেলাসিও বিষয়ে কবিতা লেখেন—না লিখলে চমক জুটতো না। এখন ভাঙা ছন্দের মোটামুটি কিছু একটা লিখলেই কবিতা হয়। এখনও 'আউর হমু লাও'-এর অভিনব দর্শনের

ওপর নির্ভর করে কবিতা লেখা হচ্ছে, কবিতা লেখেন লিটল ম্যাগাজিনের কবিরা, লেখেন যাঁদের খরচ করার মত কিছু পয়সা আছে, যাঁরা একটা না একটা কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করে চলেছেন। কাজেই এখন কবিতার নৈরাজ্যের যুগ। পঞ্চাশের আরম্ভে যে একটা সুস্থ সৌন্দর্য ছিল তা অকবির ভিড়ে ও পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ডূয়নে বর্তমানে বিপর্যস্ত। কবিতা মূলত কবিরাই পড়েন বলে, সৎ কবিরাই এবিষয়ে তৎপর হতে পারেন ভাল লিখে এবং 'আউর হয়ু লাও-এর শিকার না হয়ে।

উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে আমরা চিরকালের ও একালের কবিতা কী ও কেন ভাবতে বসেছি। আমরা ইতিহাসে দেখেছি বহতা নদীর খানিকটা এদিক-ওদিক গিয়ে মাঝে মাঝে বিল-এর সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যে তথা কবিতাতেও তেমনি ফ্যাশন নিতান্তই তাৎক্ষণিক ব্যাপার, কিছুকাল বাজার গরম করলেও বহতা ঐতিহ্যের স্রোত থেমে যায় না, সেই স্রোতই আবার মুখর করে তোলে চারিদিক। হয়ত কিছু কবি আসবেনই যাঁরা আমাদের সৎ লিরিক ঐতিহ্যের ধারকবাহক হবেন যখন বামাকণ্ঠে অশ্লীল উচ্চারণ ভাল লাগবে না, যখন ঔপনিবেশিক সমাজের মধ্যবিত্ত মন চমকে-চটকে আর ভুলবে না, যখন কবিকে খেটে খেতে হবে, যখন এই বিচিত্র বিশাল দেশের নানা দিক উদ্ঘাটন করার মত বিশালহৃদয় কবি এগিয়ে আসবে—তার রাষ্ট্রীয় কিংবা প্রতিষ্ঠানিক পুরস্কারের প্রয়োজন হবে না।

কবিতা সত্য ও সুন্দরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে কবিতা ত পড়ারই জিনিস—তাতে পাঠক নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয়আলোড়নকারী কোন ভাবধারা দেখতে চাইবেন। কিছুকাল আগেও রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা অনেকের কণ্ঠস্থ দেখা গেছে—অতি আধুনিক কবিতা কি সেই সৌভাগ্য অর্জন করেছে? এখন বহু লোকের রচিত বিভিন্ন কবিতার প্রায় একই রূপ—তাতে সত্য ও সুন্দর কতটা উদ্ভাসিত হচ্ছে সেইটেই বড় কথা। আমার মনে হয় কবিতা সুরু হয় এক আন্তর স্ফুলিঙ্গ থেকে—একটি শব্দ, একটি চিত্রকল্প হয়ত সেই স্ফুলিঙ্গের চাবি-কাঠি যার সাহায্যে বিরাট বিশ্বে ঢুকে পড়ে যে যার শক্তির মাধ্যমে আগুন জ্বালায়। সৌন্দর্যের সেই আগুনে পাঠক যদি আচ্ছন্ন না হন ত কিসের কবিতা? কবিতা কী, বলতে আমার প্রথমেই মনে হয় কবিতা নিছক একটা ফ্যাশন নয়, কবিতার ঐ ছোট্ট চেহারায় যে অগ্নিগর্ভ সুস্থতা আছে তার সঙ্গে হীরকেরই তুলনা করা চলে—অন্যান্য শিল্পমাধ্যমে নানারকম জোড়াতালি দেওয়ার সুযোগ

আছে, কবিতা তার স্বল্পায়তন সুচিসূক্ষ্মতায় সেরকম সুযোগ পায় না, তার সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি, অভিজ্ঞতা, সমাজবীক্ষা—সব কিছুর বোধই যেন একত্রিত হয়। তবে কবিতা সাধারণ লোকে বড় বেশি পড়ে না কেন? পড়ে না তার কারণ আমাদের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কোথাও একটা দৈন্য থেকে গেছে—না হলে, সব শিল্পের মতই পুনঃ পুনঃ পাঠে ও পাঠগ্রহণে কবিতার প্রতি নিশ্চয়ই অনুরাগ জন্মাবে। কিন্তু কবিতা নিজেই যদি ধাপ্পা হয়, ঢক্কানিনাদপুষ্ট হয়, তাহলে পাঠক কী করবে? পাঠককে এই জন্যেই ত পুনঃপাঠ ও চিরকালের কবিতার সঙ্গে আজকের কবিতার তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে সৎ কবিতাকে চিনতে হবে—এবং সে-ব্যাপারে পাঠক শেষ পর্যন্ত সফল হবেনই। পাঠক নিজেই দেখবেন সব যুগেই সমসাময়িককালে কত 'মিথ' সৃষ্টি হয়—কত কবি অন্যবিধ সাফল্যের জন্যে কবি বলে পরিগণিত, কত কবির নেহাৎ বাজে কবিতাই পৃষ্ঠকণ্ডূয়নের জোরে বাজার মাত করছে। সৎ পাঠককে সে-কারণেই মহাকালের নির্দেশ মেনে সৎ কবিতার বিচার করতে হবে, ঢক্কানিনাদে বিভ্রান্ত হলে চলবে না।

কিন্তু, কবিতা কেন? এর উত্তরও স্পষ্ট। কবিতা একটা শিল্পরূপ, এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী শিল্পরূপ, তাকে আমরা ফেলে দেব কেন? মানুষের মন বলে একটা জিনিস আছে—সেখানে কবিতার সুর, ছন্দ, চিত্র নিশ্চয়ই এক গভীর আনন্দ এনে দেয়।

জীবনানন্দের ভাষায়: জীবনকে সকলের তরে ভালো ক'রে
পেতে হলে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান, অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই। (পৃথিবীতে)

সব শিল্পকর্মই ত মানুষের জন্যে, জীবনের জন্যে। জীবন বড় না শিল্প বড়, জীবন স্থায়ী না শিল্প স্থায়ী—এই সব তর্কের মধ্যে না গিয়ে স্পষ্টতই আমরা দেখতে পাই শিল্প তথা কবিতা মানুষের জন্যেই এবং মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্যেই রচিত। ভাল কবিতাকে কিন্তু সরাসরি উদ্দেশ্যমূলক হতে হয় না, তার সৌন্দর্য স্বতঃস্ফূর্ত।

কবিতাকে এর বেশি চেনাতে গেলে যে-কোন পাঠকের জীবনানন্দের সেই কবিতাটি মনে পড়তে পারে:

'বরং নিজেই তুমি লেখনাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর;

বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক…' (সমারূঢ়)।

দুই

প্রয়োগিক বা ফলিত কবিতার কথা বলতে গেলে লোককবিতার কথা মনে আসে যার আবেদন তাৎক্ষণিক, যার প্রকাশ নাট্যশিল্পের মত ঋজুতায়, চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক সুবিধা যার সীমিত। কবিতা যখন গীত হত—জনসভায়, রাজদ্বারে—, যখন রামায়ণ মহাভারতের ললিতকঠোর অংশগুলি গায়কের গলার গুণে শ্রোতার হৃদয়ে বিঁধে যেত, কৃষ্ণকথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো শ্রোতা, তখন নাট্যগুণাশ্রিত ফলিত কবিতারই দিনকাল ছিল। তখন ছাপাখানা হয় নি, বড বড পত্রপত্রিকা গজায় নি, রোমান্টিক যুগের শিক্ষিত মন্ময়তা প্রকাশ পায় নি। ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িককালে মানুষের ব্যক্তিক সত্তাব প্রতি নজর পড়ে—এমন কথা বলে থাকেন সাহিত্যইতিহাসকারেরা। তার পরেই একক ভাবনার রোমান্টিক কবিতা লিখিত হতে থাকে, কবিরা স্বতন্ত্র জীব, জীবনধারার নিয়ামক ইত্যাদি কথারও প্রচলন হতে সুরু করে। আজও সেই ধারা অব্যাহত রাখার তাগিদই কি ফুটে উঠছে না আধুনিক কবিতার উচ্চ কণ্ঠে? রবীন্দ্রভিত্তিক মন্ময়তার কাল একদা কবিতাকে অন্তরের সম্পদ করেছিল। তিরিশের আধুনিক কবিরা সেই অন্তর্মুখিনতাকে অস্বীকার না করেও ভাষায় নবীনত্বের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, অনেক ভাবে অনেক দিকে সহজ হয়ে এসেছিলেন। জীবনানন্দের নবীন অন্তর্মুখী জগৎ তাঁর একারই ছিল—তাতে ছায়া ফেলেছিল আধুনিক জীবনের দাহ, বেদনা। বিষ্ণু দে সমাজজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হতে চেয়েছিলেন, যেমন চেয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রও। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁদের কবিতাকে প্রয়োগিক বা ফলিত কবিতা বলতে পারি না, যেমন পারি না চল্লিশের দশকের কবিতাকেও। এই দশকের কবিরা এক বিপর্যস্ত সমাজজীবনের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে প্রচুর জীবনমুখী কবিতা লিখেছেন, কিন্তু ফলিত কবিতার ব্যাপারে তাঁদের কেউ কেউ এগিয়ে এসেছেন পরে। 'আরো কবিতা পড়ুন' ইত্যাদি আন্দোলন করে, এক একজন কবিতাকেই জীবনের ধ্যান জ্ঞান করে বাস্তবিক পক্ষে ফলিত কবিতারই সাধনা করেছেন, করছেন। ফলিত কবিতা কিন্তু আরো পরে দেখা

গেছে—মূলত যার প্রকাশ ঘটেছে পঞ্চাশের কবিতার মাধ্যমে। এই কবিতাকে কিংবা কবিদের এই মেজাজকে চল্লিশের একজন কবি 'বোমা ফাটানো' বলে অভিহিত করেছেন। ফলিত কবিতা জীবনেরই একটা দিকের প্রকাশ, তাকে কেউ যদি আমেরিকানিজম বলেন ত দোষ দেওয়া যায় না। আমেরিকার বীট কবিতা, জাজ সঙ্গীত এই বহির্মুখী জীবনেরই সোচ্চার প্রকাশ। অর্থাৎ ফলিত কবিতায় আমরা কবিতার চেয়ে কবির জীবনাদর্শকেই বড় করে দেখতে চেষ্টা করছি। চঞ্চল এই জীবন কিন্তু বাংলা কবিতাকে হতাশ করে নি, বরং অপরূপ সম্পদেই ভরে তুলেছে। পুরনো ছন্দমিলের মিষ্টি কবিতা চমকে উঠেছে ফলিত কবিতার সামনে দাঁড়িয়ে। ফলিত কবিতায় 'বোমা ফাটানোর' ব্যাপারটা থাকাতেই হয়ত শারীরিক বর্ণনা তথা গোপন জীবনের উন্মোচনের কথা বারবার দেখা যায়। কিন্তু এর সবটাই কি ভাল হয়েছে ?

এখন ফলিত কবিতার কবিতাংশ কমে গিয়ে জীবনের হল্লার দিকটাই কি ফুটে উঠছে না ? এখন কবিকে সিনেমার হিরো বানাবার প্রয়াস দেখা যায়, কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের নামে অবান্তর পারিবারিক কাহিনী ছাপা হয়, কবি-সভা করে কবির নামে বিজ্ঞপ্তির তুবড়ি ফাটানো হয়। এসবই প্রাণ-ধর্মের প্রকাশ হয়ত, কিন্তু তার মূল্য গুণছে কবিতা—যে কেউ এখন 'শবদে শবদে বিয়া' দিয়ে কবিতা রচনা করতে পারেন (মাইকেলের মত কষ্ট করতে হয় না)। এখন কবিতাভাঙার কবিতাই ফলিত কবিতার দুঃখময় প্রকাশ।

আমাদের ফলিত কবিতার ঐতিহ্য কিন্তু ছিল অন্যরকম। বৌদ্ধ সাধনার জন্যে ছিল চর্যাপদের দোহা, কৃষ্ণকথার শ্রীকৃষ্ণবিজয়, রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী, রামপ্রসাদ—আর এখন ? আধুনিক কবিতার সর্বাধুনিক স্তরে আমাদের সাধনা ফলিত কবিতার সাধনা, যাতে জীবনের বর্জনীয় বিষয়ের ঢক্কা-নিনাদ করছি আমরা সূক্ষ্মতম দিকগুলি বর্জন করে। একেই ত ন্যাচারালিজম বলেছেন কেউ কেউ—রিয়ালিজম থেকে দূর, সুদূর ! ফলিত কবিতা যে-জীবনকে অন্যায় প্রশ্রয়ে লালন করতে চাইছে সেই জীবন সংযত হলে আমরা ফিরে পাব বিশিষ্ট জীবনের ফলশ্রুতির কবিতা, তখন আর সৎ পাঠককে সহজপাচ্য ভোজ্য খেতে খেতে কাঁকরের আঘাতে চমকে উঠতে হবে না।

কবিতার ভাষা ও দেশ

॥ প্রাক্‌কথন ॥

বাংলা দেশজ ভাষায় বিরচিত কবিতা শিক্ষিত বাঙালীকে আকর্ষণ করতে পারে নি। কবিতা যেহেতু আসর ছেড়ে, কবিগান ছেড়ে বইয়ের পাতায় বিধৃত, সেকারণে তা শুধু ক্রমান্বয়ে শিক্ষিতজনেরই একমাত্র উত্তরাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত মানেই পরিচ্ছন্ন, কৃত্রিম, সজ্জিত। সেইজন্যে সত্যেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক বাংলা ভাষা ব্যবহার করলে (যেমন, পালকি চলে / পালকি চলে / ডুলকি তালে), কি নজরুল বাংলা কাব্যভাষায় বিদেশী শব্দের প্রাচুর্য ঘটালে কিংবা উচ্চভাষণে কথা বললে, অথবা চল্লিশ দশকে বা তার কিছু আগে-পরে রাজনীতিপ্রধান নতুন শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ কিছু তীক্ষ্ণ কবিতা রচিত হয়ে থাকলে তা কবিতাপদবাচ্য করতে শিক্ষিত সমালোচক দ্বিধাবোধ করেন। অথচ কবিতা বলতে অযথা বিশেষণপদসমাকীর্ণ শব্দাবলী বা অভিধানআহরিত সংস্কৃত শব্দসম্ভারই বোঝাবে তাই বা কেমন কথা! বস্তুত বাংলা দেশজ শব্দভিত্তিক কবিতাবলীর এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বাংলাদেশের অনেক কালের ঐতিহ্য—আমাদের রামায়ণ-মহাভারত কিংবা মঙ্গলকাব্যগুলির কথা বাদ দিলেও—আধুনিক নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার যুগে সেই ঐতিহ্যের শেষতম প্রকাশ আমরা ঘটতে দেখেছি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায়।

পরবর্তীকালে এই দেশজ ভাষায় কাব্যচর্চা বিক্ষিপ্ত চর্চাই থেকে গেছে—তা কি রবীন্দ্রনাথে, কি অন্যান্য কবির মধ্যে। বাংলা সমাজজীবনে যেমন ইংরেজের তাড়নায় আমরা মাটির সংযোগ হারিয়েছি সেই অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই, ভিক্টোরীয় কতকগুলি অসত্যকে সত্য বলে জেনেছি, সাহিত্যেও তেমনি আমরা ঈশ্বর গুপ্তের দেশজ ভাষার কাব্যের ঐতিহ্য বিস্মৃত হতে বসেছি। একথা অবশ্যই স্বীকার্য, কবিতার ভাষা কবিতারই ভাষা, সুকবি তাঁর শব্দসম্পদ প্রয়োজনমত যেখান-থেকে-খুশি আহরণ করেন, এবং কোলরিজীয় বক্তব্যে সে-শব্দ অপরি-বর্তনীয়, তবু এই মুখের ভাষার কবিতার জন্যে আমরা দুঃখবোধ করি, অভাববোধ করি। হিন্দীতে যখন 'কহাবতে' আর 'মুহাবরে' সমাকীর্ণ সমাজসচেতন শব্দ-বিন্যাস দেখি, তখন আমাদের প্রবচনগুলি যে একমাত্র সুশীলকুমার দে-র গ্রন্থেই গ্রথিত হয়ে রইলো সে কথা ভাবতে খুবই খারাপ লাগে।

॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ॥

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ও কাব্যভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উক্তিগুলি স্মরণ করতে ভাল লাগে : "যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত…ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য-দেশের কবি।… যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরিজীনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না,—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে।…কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব প্রকাশ করেন।"

ঈশ্বর গুপ্ত যে কেবল সমাজসমালোচনার জন্যেই এই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা নয়, এইটাই ছিল তাঁর কাব্যভাষা। যেমন, তাঁর তপসে মাছ ছিল "গালভরা গোঁপদাড়ী তপস্বীর প্রায়"। কিংবা সেই তীক্ষ্ণ পংক্তি কটি : "আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব, ঘুঁসি খেলে বাঁচব না"; "কোনোরূপে পিত্তিরক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে/শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে"—এতে দেশজ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার ছন্দের দোলাও অনুভব করি আমরা। জীবনানন্দ যেখানে শালিখের ঠ্যাং উচ্চারণ করে একটি করুণ নরম চিত্রকল্পের অবতারণা করেছিলেন পরবর্তীকালে, ঈশ্বর গুপ্ত সেখানে কতকাল আগে তাঁর গ্রাম্যতার গুণেই স্পষ্ট সহজ সুরে পাঁঠার বর্ণনা করেছিলেন : "হাড়কাঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাং / সে সময় বাদ্য করে ছ্যাডাং ড্যাডাং"। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কিত আলোচনায় বিষ্ণু দে-র সেই উক্তিটি মনে পড়ে : "দেশের যে ঐতিহ্য ব্রিটিশপূর্ব শিল্পসাহিত্যের উৎস, সেই লোকমানসে বাচালতা থাকলেও অশ্রুজলের চর্চা নেই।" সেই ঐতিহ্যসৃষ্টিতে বাংলার দেশজ ভাষার কৃতিত্বের দাবি অস্বীকার করা যায় না।

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥

এই শতকের প্রথম বছরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ক্ষণিকা' প্রকাশ করেন—যার বেশির ভাগ কবিতার ছন্দ ছড়ার ছন্দ ও ভাষা দেশজ ভাষা বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, " 'ক্ষণিকা'য় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন

সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ে টাট্টুঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্যভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।"

"বলা বাহুল্য 'ক্ষণিকা'য় আমি কোন পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন, কোনোটার উপরেই আপন দাবী সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। কিন্তু কোন্ দিকে তার অভ্যাসের টান এবং কোন্ দিকে অনুরাগের, সে বিচার পরে হইবে।" এই 'ক্ষণিকা'র কথা শুনেই গ্রন্থটি প্রকাশের আগে প্রিয়নাথ সেন একটি সনেট লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, তাতে এই গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহই প্রকাশ পেয়েছিল। এই কাব্যপ্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি আজও স্মরণযোগ্য : " 'ক্ষণিকা' সামাজিক হিসাবে একটুকু উচ্ছৃঙ্খল এবং তজ্জন্যই বোধ হয় উহা বিশেষরূপে উপাদেয় হইয়াছে। · আপনার দৈব কবিত্ব পৃথিবীর প্রতি সৌন্দর্যটুকুর আস্বাদ অঙ্গীকার করিয়া এই তত্ত্বকণ্টকসংকুল সংসারকে ক্ষণেকের জন্য আবাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। ...কবি কলঙ্ক ও নিন্দাপঙ্কে তিলক টানিয়া হাসিতে হাসিতে প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, গীতিগুলির সর্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা ও সৌন্দর্য।"

লোকসংস্কৃতিগবেষক 'ক্ষণিকা'র কথাবস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন, আঙ্গিক নিয়ে করলে অবশ্যই এর দেশজ ভাষা ও লৌকিক ছন্দের কথা উঠতো। 'ক্ষণিকা'র আঙ্গিক বিচার করলে আমরা কটি বিষয় স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রথমত, এর ছড়ার ছন্দের প্রতি দৃষ্টি যায় আমাদের, যে-ছন্দের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন রামপ্রসাদ। এই ছন্দই বাংলার প্রাকৃত ছন্দ, না পয়ার নামধেয় 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক' ছন্দই বাংলা ছন্দের আর্কিটাইপ, সে-বিষয় বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমার মনে হয় বাংলা ছন্দের মৌল রূপ যা বাঙালীর মুখের কথারই প্রতিভাস তা পয়ার বা বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দেই পাওয়া যায় তার স্থিতিস্থাপকতার গুণে, এই ছন্দের রূপ থেকে গদ্যকবিতার ছন্দের রূপ একটি ধাপের ব্যবধান মাত্র। গদ্য-পদ্যের সীমানা অবলুপ্তির মন্ত্র এই ছন্দের মধ্যেই নিহিত। যাক সে কথা। যদিও কৃত্তিবাস-কাশীরাম অনেক আগেই তথাকথিত পয়ারে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছিলেন, তবু রবীন্দ্রনাথ রামপ্রসাদের ছড়ার ছন্দকে দেশজ ছন্দ বলে 'ক্ষণিকা'য় নতুনতর দিগ্‌দর্শনের দাবি করেছিলেন। অবশ্যই সে-যুগের

পরিপ্রেক্ষিতে একটা বইয়ের কবিতা এমন হাল্কা ছন্দে রচনা করা বিশেষ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক—যদিও কথাবস্তুতে কোন কবিতারই ভাবগাম্ভীর্য হ্রাস পায় নি। এখানে র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী'র মত যেমন আছে:

হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের 'পরে লাগাস ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও ভাই, তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া। (মাতাল)

তেমনি আছে,

মনেরে আজ কহ যে,
ভালোমন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে। (বোঝাপড়া)

এইরকম তাৎক্ষণিকের উপভোগে অস্তিত্ববাদীই মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে, যেন চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের অবদমিত মনের আর একদিকের প্রকাশ ঘটে গেছে তিরিশ বছর আগে এই কবিতাগুলিতে, এবং তাও আর্যেতর দেশজ ধ্যানধারণার মাধ্যমে, দেশজ বাগ্‌ভঙ্গিমার সাহায্যে।

দ্বিতীয়ত, এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বহুল পরিমাণে চলিত ভাষা—ক্রিয়াপদেই যার প্রধান প্রকাশ—ব্যবহার করেছেন। গদ্যে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' যে স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীলতা প্রকাশ পেয়েছিল শেষ কৈশোরে, সেই স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ আবার দেখা গেল যৌবনে রচিত এই কবিতাগুলিতে। চলিত ভাষায় যে পরিচ্ছন্ন নিটোল কবিতা সম্ভব তার আদি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথই স্থাপন করলেন এই কাব্যে।

তৃতীয়ত, দেশজ শব্দের কথা আসে। সুনীতিকুমার একদা লিখেছিলেন: 'কলিকাতা অঞ্চলের হিন্দু ভদ্রগৃহের মৌখিক চলিত ভাষায় কিন্তু তৎসম শব্দের সংখ্যা অনেক কম, শতকরা ১৭, বিদেশী শব্দ শতকরা ৩, এবং বাকী শতকরা ৮০টা তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম এবং অজ্ঞাত-মূল শব্দ লইয়া'। অজ্ঞাতমূল কিংবা প্রাকৃত শব্দ বা সাধারণভাবে দেশী শব্দের সফল কাব্য প্রথম রবীন্দ্রনাথই রচনা করেছিলেন।

কিন্তু, 'ক্ষণিকা'য় তেমন শব্দ যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে, সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের চেয়েও বেশি, এমন আমার মনে হয় না। 'মাতামাতি', 'রাতারাতি', 'পাতাল-পানে', 'ঢাকাঢাকি', 'মন-জাগানে' ইত্যাদি কিছু শব্দ,

এবং অমুকার শব্দও ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এই সব বাংলা দেশী শব্দের সংখ্যা অনেক বেশি তাঁর পরবর্তীকালের গদ্যকাব্যে, বিশেষত 'পুনশ্চে'। সে কথা বাদ দিলেও, রবীন্দ্রনাথ এই সব শব্দের মধ্যে যে কাব্যিক আস্বাদ আনতে পেরেছেন সেইখানেই তাঁর সাফল্য।

যেমন,

চলেছিলে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে,
একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা-ফাঁকে ?

বা,

নিবিড়-ছায়া বটের শাখে
কপোত-দুটি কেবল ডাকে,
একলা আমি বাতায়নে—
শূন্য শয়ন-ঘর।
তুমি যখন গেলে তখন
বেলা দুই-পহর।

ছড়ার ছন্দ এবং সহজ ভাষার আবেদন মিলে এই কবিতা নতুনত্বের সৃষ্টি করেছে ঠিকই, কিন্তু একেবারে মাটির কাছাকাছি যেতে পারে নি। এই দুটি গুণ থাকা সত্ত্বেও রাবীন্দ্রিক সুদূরতা যেন থেকেই গেছে, যা খানিকটা দূর হয়েছিল 'পুনশ্চের' গদ্যকবিতায়, হয়ত তা গদ্যকবিতা বলেই। তবু প্রকাশ-কালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রকাশনের পরিপ্রেক্ষিতে এই কাব্যকে সহজ ঝিরঝিরে একটি নদীর সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজেরই উত্তরাধিকারকে কাজে লাগিয়েছেন 'পুনশ্চের' অনেক কবিতায়। এর ভূমিকায় তিনি যে লিখেছিলেন : "এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তরে' 'সনে' 'মোর' প্রভৃতি যে সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই-সকল কবিতায় স্থান দিই নি"—সেটাই সব কথা নয়, তিনি এই কবিতাগুলিতে প্রায়-দেশজ কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছিলেন গদ্যকবিতার তাগিদে (যদিও তাঁর অনেক সার্থক গদ্যকবিতাও আছে যার মধ্যে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ প্রচুর)। এই কবিতাগুলিতে 'দেড়শো বছরের আগেকার

নীলকুঠির ভাঙা ভিত' ইত্যাদির কথা যেমন আছে, তেমনি আছে 'গুঁড়ি-মোটা কাঁঠাল গাছ', 'ফাটল-ধরা খেত', 'চষা-খেত', 'মরচে-ধরা কালো মাটি', 'এক-বই-ভরা কবিতা', 'হাইড্রলিক জাঁতায়-পেষা', 'পটলডাঙার অগ্নিবাস', 'দোকানে পাঁচ সিকে দিয়ে খালাস', 'বাঁখারি-বাঁধা মেহেদির বেড়া' ইত্যাদি শব্দপুঞ্জ।

॥ জীবনানন্দ ॥

জীবনানন্দই আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে সহজ বাংলা ভাষার মাধ্যমে কাব্যে এক বিস্ময়কর নতুনত্বের আমেজ এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে 'চিত্ররূপময়' বলেছিলেন। সেই চিত্ররূপময়তা গ্রামবাংলাকে শিক্ষিত বাঙালীর মনে উদ্ভাসিত করেছে নতুনভাবে। কাব্যের শিক্ষা, পাঠের অভিজ্ঞতা, তুলনামূলক বিচারের ক্ষমতা না থাকলে এই কবিতার রস আস্বাদন করা যায় না, কারণ এর লেখক মেঠো বাউল, কীর্তনিয়া বা গ্রাম্য কবি নন। জীবনানন্দের নির্জনতা একান্তভাবেই শিক্ষিত মনের নির্জনতা, গ্রামের সাধারণ দৃশ্য বা চরিত্রের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তিনি কাব্যের দ্যোতনা জাগিয়েছেন। বাংলা কাব্যে এসব জিনিস একান্তই তাঁর নিজস্ব ও নতুন। এই কাব্যিক দ্যোতনার জন্যে, গ্রাম-চিত্রকে এক নবীন উদ্ভাস দেওয়ার জন্যে, বাস্তবের রূপকে স্পষ্ট মাধুর্যের মধ্যে ধারণ করার জন্যে তিনি বহু দেশজ বাংলা ও বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে শিক্ষিত ব্যক্তির মনের উপযোগী করেছেন প্রয়োজনমত। 'ব্লিজার্ডের তাড়া', 'রবারের বলের মতন ছোট বুক', 'ফেল্টের সবুজ ঘাস', 'আমার নকটার্ন', 'স্কাইলাইট মাথার উপর', 'সারারাত গ্যাসলাইট', 'ইট্‌ বাড়ি সাইনবোর্ড' ইত্যাদি শব্দগুলি আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত পাঠকের মুখের কথায় প্রায় বাংলা শব্দই হয়ে গেছে, কিন্তু কাব্যে এদের এত সুন্দর সুমিত প্রয়োগ ছিল না, পড়লেই যে কোন শিক্ষিত পাঠকের মনে তাঁর পঠিত কবিতার আকাশ উন্মোচিত হয়ে যায়, তুলনামূলক বিচারে এই কবিতার নতুনত্ব অস্বীকার করা যায় না। তেমনি ভাল লাগে 'মেয়েলি হাতের স্পর্শ', 'কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড়', 'হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে', 'রূপশালী-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ', 'আইবুড়ো পাড়া-গাঁর মেয়ে', 'খড়-নাড়া-মাঠের ফাটল' ইত্যাদি শব্দপুঞ্জের মাধ্যমে সুস্থ দেহভিত্তিক একটি মনন—যেন তা বাংলার বলিষ্ঠ দেশজ ঐতিহ্যের মধ্যে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে। এই সব দেশজ শব্দগুলিকে তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে তাঁর কাব্যচারিত্র্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে পেরেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন : "মৌখিক ভাষায় প্রচলিত

তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে কাব্যের স্পন্দন তিনি এনেছিলেন ; 'তোমার শরীর—তা-ই নিয়ে এসেছিলে একদিন', এই পংক্তিটি পড়ে আমি 'শরীর' কথাটাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরে'র অস্তিত্ব আমরা শুনিনি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'।" বস্তুত, সহজ দেশজ কথার সুন্দর প্রয়োগে বিস্মিত হন শিক্ষিত ব্যক্তিরাই, যাঁরা আমাদের দেশের মানুষ হয়েও দেশ থেকে বিচ্যুত ছিলেন, 'ফোক-লোর' আবিষ্কারের মতই বিস্ময়কর লাগে দেশজ শব্দের ব্যবহার। সে বিস্ময় আমাদেরই লাগে। জীবনানন্দ কিন্তু দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে যে যুক্ত ছিলেন তা প্রমাণিত হয় তাঁর কবিতার চিত্রে, শব্দব্যবহারে। পরবর্তীকালে অনেক রাজনৈতিক বা সমাজসচেতন কবিতায় অনেক নতুন শব্দের ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত, দুঃখের কথা, আমরা তা স্বীকরণ করতে পারিনি। চল্লিশের কয়েকজন কবি সেই ধারা বিস্মৃত হননি বলেই মনে হয়। কিন্তু এই শব্দের ব্যবহারে যে সাবধানতা, যে অভিনিবেশ এবং যে কৃতিত্ব থাকা দরকার তা বড়ই আয়াসসাধ্য। সে যাই হোক, বাংলা কবিতার এই বিশিষ্ট ধারার কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

কবিতা : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ১

মানুষের মত কবিতার চরিত্রও দুরকম—অন্তর্মুখী আর বহির্মুখী। কথাটা বিদ্যালয়পাঠ্য পুনরুক্তি বলে মনে হলেও প্রকৃষ্ট বিবেচনায় কবিতার এই দ্বৈত অস্বীকার করা যায় না। বহির্মুখী গাথা, আখ্যায়িকা কাব্য একদিকে, অন্তর্মুখী গীতিকবিতা আর একদিকে—এই কাব্যরীতিগুলি পরস্পরনিরপেক্ষ এমন কথা বলছি না, তবে কবিতা অনুধাবন করার জন্যে এই বিভাগ দুটি চোখের সামনে থাকলে পরবর্তী অনেক সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করার সুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল বা তাঁর গীতিকবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের চরিত্রের এই দ্বৈতের কথা বলেছিলেন, যা আমরা এখন কবিতার চরিত্রেও আরোপ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে' (বিহারীলাল, আধুনিক সাহিত্য)।

বর্তমানে উপরিউক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করা হল আধুনিক কবিতা তথা আধুনিক বাংলা কবিতার একটি তথাকথিত সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে। ব্যাপারটি কবিতার দুর্বোধ্যতা, বিশেষত আধুনিক বাংলা কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে। একথা সত্য যে যুগে যুগেই নতুন কবিতা পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন কারো কারো কাছে দুর্বোধ্য লেগেছিলেন, জীবনানন্দ অস্পষ্ট ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ অপ্রচলিত শব্দের বা দুরূহের দারুণ আকর্ষণে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিলেন। এখন তাঁদের দুর্বোধ্য মনে হয় না, যেমন মনে হয় না এখনকার অনেক কবিতাকে যার এক পংক্তির সঙ্গে অন্য পংক্তির অর্থসঙ্গতির দায়িত্ব বোধ করেন না লেখক, যেখানে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত টুকরো অভিজ্ঞতার খানিক চিত্র মাঝে মাঝে চিত্রিত হয়, শব্দ শুধু শব্দের জন্যেই পর্বত সৃষ্টি করে (শম্ভু রক্ষিতের কবিতা)।

কেন এমন হয়? এ-সমস্যা শুধু আমাদের কবিতারই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই এই সমস্যা। সম্ভবত অত্যধিক লিরিক চর্চাই আমাদের মাঝে মাঝে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য করে ফেলে। মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে অংশত এবং বিহারীলালে প্রভূত পরিমাণে যে লিরিকের আধুনিককালীন সূত্রপাত, তার

ধারা বাংলা হাল আমলের কবিতাতেও বহমান। আত্মকথনের যে দাবি নিয়ে একদা বাংলা লিরিকের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তাই এখন কবিতাকে নিজের মনের মত ঘর গুছোনো, টেবিল সাজানো, 'আপন মনে থাকতে দে রে' গাইতে গাইতে একান্ত ব্যক্তিকতাব দিকে নিয়ে গেছে। অনেকে বলেন যুগযন্ত্রণায়, চাওয়াপাওয়ার অসামঞ্জস্যে কবি অস্পষ্ট হয়ে গেছেন, কিন্তু কবিতা ত শব্দ দিয়ে, তাতে প্রতিরোধ, প্রতিবাদের ভাষা যখন ফোটে, তখন যে কোন বক্তব্যই স্পষ্ট ভাষাতেই বলা যেতে পারে। আর যদি মানসিক অসামঞ্জস্যকে কবিতাব অস্পষ্টতার কারণ বলে নির্দেশ করতে হয়, তাহলে পাগলেরাও কবিতা রচনার ছাড়পত্র পেতে পারেন। আসলে যুগযন্ত্রণা বা *Zeitgeist* নয়, লিরিক চর্চার অত্যধিক কর্ষিত ক্ষেত্রে কবিতার অস্পষ্টতা অনিবার্য। আমেরিকান কবি ডেলমোর স্কোয়ারৎস সমাজ থেকে কবিব বিচ্ছিন্নতা যেমন লক্ষ করেছিলেন, তেমনি লক্ষ করেছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীব শেষার্ধেব আগে পর্যন্ত কবিতা ছিল আখ্যানধর্মী বা নাটকীয় এবং তখন কবিতা অর্থে অস্পষ্ট ছিল না ; তাঁর মতে আধুনিক কবিতাব গীতিধর্ম ও অস্পষ্টতা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পৃক্ত।[১] কবি স্ট্যানলি কুনিৎসও সেই কথাই বলেছেন। তাঁর মতে এখন আর আখ্যায়িকা কাব্য বলে কিছু নেই ; উনবিংশ শতাব্দীব শেষদিকে ঔপন্যাসিকেরা আখ্যানশিল্প আত্মসাৎ করেছেন, এবং কবিরাও গল্প বলার পরিশ্রম থেকে বেঁচেছেন।[২]

কবিতাব এই অস্পষ্টতা থেকে বেরিয়ে আসার কয়েকটি কাব্যবহির্ভূত প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই। সেই প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা কবিতাব ব্যবহারিক দিকের প্রকাশ দেখি। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই, এদেশেও, কবিদের অসামাজিক আচরণ, উচ্চকণ্ঠরোল, কবিতা সম্পর্কে নানারকম স্বেচ্ছাচারিতা কবিতার বহির্মুখী দিকটির প্রতি নির্দেশ করে, কবিতা মনের গহনের অস্পষ্টতা থেকে বাইরের সূর্যালোকে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। ফলিত কবিতার এই আচরণ থেকেই বোঝা যায় অস্পষ্টতা, লিরিকের প্যানপ্যানানি থেকে বেরিয়ে আসতে চায় কবিরা, মাঝে মাঝেই তারা যাত্রার দলের মত জনসমুদ্রে মিশে যেতে চায়, ফিরে যেতে চায় সেই পুরনো আখ্যায়িকা কাব্য বা নাট্যকাব্যের যুগে কিংবা তারও আগে যখন কবিতা গীত হত, উচ্চারিত হত, জীবনের সঙ্গে অনন্য সম্পর্কে যুক্ত ছিল। লিরিকের ঘরোয়া আসর আর নয়, এখন ইয়েভতুশেঙ্কোর জনারণ্যে কবিতাপাঠ, গিনসবার্গ-এর উচ্চনাদ শোনবার এবং শোনাবার

কাল। আমাদের এখানেও মাঠে ময়দানে, পথ চলতে চলতে কবিতাপাঠের প্রচেষ্টা তথা আন্দোলন অনেক কালই চলছে।

এ ত গেল ফলিত কবিতার দিক। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে আমরা কী দেখি? একদা কারো কারো নাটকীয় স্বর ছিল, যেমন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর .

কার স্বর
অন্ধকারে থলথলে স্বর। (স্বর)

এবং চল্লিশের দশকের অনেকেরই বক্তব্যপ্রধান উচ্চকণ্ঠ কবিতা ছিল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতিসচেতন, কিংবা নীরেন্দ্রনাথের সাংবাদিকতীক্ষ্ণ কবিতাগুলি মনে পড়ে।

পঞ্চাশে এলো লিরিকের জোয়ার। জীবনানন্দের শেষদিকের সমাজসচেতন আখ্যানধর্মী কবিতার চেয়ে পূর্ববর্তী লিরিক ধূসরতা আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল। অনেক অনেক লিরিক কবিতা লিখেছেন সকলেই। কিন্তু লিরিকের চিত্রণে, স্বরে, ছন্দে নিজস্ব এক মাদকতা আছে যা গুঞ্জনের মত লাগে, ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার প্রকাশে যা অস্পষ্টতর হতে থাকে। সেই অস্পষ্টতা, অলোকরঞ্জনের দার্শনিকতা ইত্যাদির জন্যেই হয়ত আবির্ভূত হয়েছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিখিলেশ কিংবা যৌনশব্দপ্রকীর্ণ কবিতার চমক :

কবিতা যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে, ঘুমিয়ে না পড়ে তার জন্য চমকের প্রয়োজন আছে। সেকারণেই তারাপদ ধোপাদের গাধা নিয়ে কবিতা লেখেন, শক্তি 'অবনী, বাড়ি আছো' বলে নাটকীয়তা করেন, এমন কি এতদিন প্রভূত লিরিক লিখে কিরণশঙ্কর হঠাৎ 'গোপাল মুখার্জি' নামক একটি স্মৃতিচারী নাটকীয়তা সৃষ্টি করে চমক আনেন।

কবিতা মাঝে মাঝেই অস্পষ্টতার প্রবণতা দেখায় বলেই কবি মাঝে মাঝে তাকে আখ্যানধর্মী, মাঝে মাঝে তাকে নাটকীয় করেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতিক কবিতাগুলির স্পষ্টতা অনেকেরই প্রিয়। লিরিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকেই হয়ত জন্ম নিয়েছে গদ্যপদ্যের বিভেদ অস্বীকার। গদ্য আধুনিক যুগে অনেক জায়গাতেই গল্প বলার দায়িত্ব অস্বীকার করেছে, কবিতা যেমন অর্থ পরিবহনের—সে কারণে দুই রাগধারার কাছাকাছি আসা সহজও হয়েছে।

এই অস্পষ্টতা দূর করার জন্যেই দেবী রায় লেখেন .

দেখেছি মানুষ, ভীড়ভাড়াক্কায়, উন্মত্ত মানুষ
মানুষের আড়ালে মানুষ

মানুষের ভাবনা মানুষ
মানুষকে নিয়েই ভেবে যাচ্ছে, আরেক মানুষ
আরেক দল মানুষ
মানুষ! মানুষ! (মানুষ, মানুষ)

এই উচ্চকণ্ঠ মাঝে মাঝে কৃত্রিম বানানো-বানানো বলে মনে হলেও আসলে এটা লিরিক আর্দ্রতার, রহস্যপ্রিয়তার প্রতিবাদ, অলোকরঞ্জনের অতীন্দ্রিয়তার উল্টোদিক। আমাদের আখ্যানধর্মিতা, নাটকীয়ভাব যে অন্যতর প্রকাশ ছিল তারই খানিক ছায়া এই সব কবিতায় দেখা যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক কবিতা এক বিষয়ে পূর্ববর্তী সব কবিতার চেয়ে ধনী। এর মধ্যে যুগপৎ লিরিক ও আখ্যানধর্মী বা নাটকীয় কবিতা অবস্থান করছে। লিরিকের শব্দ ও চিত্রসম্ভার, আত্মগুঞ্জন, অর্থের প্রতি অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শন যখন সোচ্চার হয়ে ওঠে, তখনই স্পষ্ট করে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দেয়—ফলিত কবিতাচর্চায় নাটকীয় আচরণ দেখা দেয়, কবিতারচনায় তত্ত্ব ও আখ্যানধর্মিতা বা নাটকীয়তা তাৎপর্য লাভ করে। কবিতার এই বিশেষ চরিত্রের জন্যেই অদূরপূর্ববর্তী কবিতার চেয়ে সুদূরপূর্ববর্তী কবিতার প্রতি নজর দেন এক যুগের কবিরা, সেই সুদূর পিতামহের কাছে যান প্রেরণার জন্যে, কারণ পিতার যুগের কবিতায় তাদের মন ভরে না। স্পষ্টাস্পষ্টের এই দ্বৈত সব সময়েই রয়েছে—পঞ্চাশের কবি ভালবাসতেন তিরিশের কবিকে, ষাটের কবি চল্লিশকে। ব্যাপারটা সাধারণীকরণ বলে মনে হলেও, সচেতন পাঠকের কাছে কিন্তু স্পষ্টাস্পষ্ট কাব্যপরম্পরাই আকর্ষণীয় হবে, তাঁর পক্ষে পিতামহের প্রেরণার প্রয়োজন নেই, বরং এক দশকের ক্লান্তিকর অনুবৃত্তির পরে তিনি ভিন্ন স্বাদের কবিতা চাইবেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কবিতার স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা বলে যা আমাদের মনে হয় তা মূলত বহির্মুখী কবিতারই রূপাদর্শ। অন্তর্মুখিনতা বা লিরিকচর্চার আতিশয্যের ফলেই কবিতা কখনো কখনো অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখনই উচ্চকণ্ঠ বহির্মুখী কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশ করে নিজেকে। আমাদের ব্যর্থ কাব্যনাট্যগুলি এ-ব্যাপারে সহায়ক হয় নি।

সৎ কবি যেহেতু নিজেকে ভাঙেন, নিজের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যান, তাই কখনো তিনি লিরিকধর্মী, কখনো নাটকীয় (তুলনীয়, জীবনানন্দের প্রথম ও শেষ দিকের কবিতা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাণুর জন্যে' ও হাল আমলের গ্রন্থাদির

কবিতা)। স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা কখনো এক কবির মধ্যেই দৃশ্যমান, কখনো এক যুগ ও পরের যুগের কবিতায় উদ্ভাসিত।

কবিতা : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ২

প্রুস্ত তাঁর কোন উপন্যাসের এক জায়গায় বলেছিলেন, বিটোফেনের শেষ কোয়ার্টেট একবার শুনিয়ে এবং সমালোচকদের কাছ থেকে উন্মাদ আখ্যা পেয়ে তা যদি পঁচাত্তর বছর না বাজিয়ে তারপর বাজানো হয়, তাহলে তখনো সমালোচকেরা ঐ শিল্পকর্মকে পাগলামি বলবে—কারণ এতদিন ধরে শিল্প ধীরে ধীরে তার স্টাইলের সঙ্গে পরিচিত করে নি শ্রোতাকে।[১] তার নিজস্ব ভাষাতেই শিল্প আস্বাদ্য। সে-ভাষার পরিচয় অভ্যাসের মাধ্যমেই মেলে।

সব শিল্পকর্ম সম্পর্কেই কমবেশি একথা সত্য। প্রথমে যা কঠিন, অস্পষ্ট এবং ধূসর মনে হয়, পরে তাই পরিচিত হতে হতে খুবই সহজ এবং স্পষ্ট বলে প্রতিভাত হয়। কবিতার এই অস্পষ্টতা, কঠিনতা কতদিনের? এ কি ইচ্ছাকৃত, নাকি কাব্যের সঙ্গে খানিকটা অস্পষ্টতা অচ্ছেদ্য? নেমেরভ বলেছেন, কিছু পাঠক আছেন যাঁরা কাব্যে লিখিত সব কিছুই কঠিন বলে মনে করেন এবং তাঁদের প্রসঙ্গ 'এহো বাহ্য'।[২] তাঁর মতে অনেক কবিও আছেন যাঁরা বাগ্‌-বাহুল্যের দ্বারা কবিতাকে জটিল করেন। যদিও বৈয়াকরণিক সংক্ষেপ অনেকের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যও এনে দিয়েছে—যেমন, মিলটন, হপকিন্স, ইয়েটস, কামিংস।

কবিতা যেদিন থেকে তার সাঙ্গীতিক ভূমিকা থেকে সরে এসেছে, হয়ত সেদিন থেকেই সে দুর্বোধ্য বলে আখ্যাত। প্রাচীন মন্ত্র, গাথা, কবিতা যখন উদ্গীত হত, এবং বর্তমানেও যখন লোককবিতা বা লোকসঙ্গীত ও পুরাণকথা উদ্গীত হয় তখন কবি ও শ্রোতার মধ্যে বিভেদ বা দূরত্ব থাকে না।[৩]

জনৈক আধুনিক কবি বলেছেন যে, যেহেতু বেশির ভাগ লোকই আধুনিক কবিকে অস্পষ্ট, কঠিন বা উপেক্ষিত বলে মনে করে, সেকারণে কবি অপঠিত থাকেন। কখনো কখনো একথা সত্য হলেও, উল্টোটাও সত্য—অর্থাৎ কবিকে কঠিন মনে হয় কারণ তিনি অপঠিত থাকেন, অথবা পাঠক তাঁর বা অন্য কাব্যে কবিতা পাঠ করতে অভ্যস্ত হন না। আসলে কোন কারণই শেষ কারণ বলে গণ্য হতে পারে না—কবি ও পাঠকের এই বিচ্ছেদ দীর্ঘস্থায়ী পৃথিবী-উল্টোনো সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবেরই ফলশ্রুতি।[৪]

একদা কবি ছিলেন একাধারে সমাজের অভিভাবক বা নীতিনির্দেশক এবং

সৌন্দর্যবাদী। সৌন্দর্যবাদ যে নীতিনিষ্ঠাব্যতিরেকেই দাঁড়াতে পারে একথা তখন কেউ ভাবতো না। কার্যত, আধুনিক কবিকেই দেখা গেল যে তিনি শুধু কাব্যশিল্প ও সৌন্দর্যবাদকেই মুখ্য বলে অবলম্বন করেছেন—নীতির প্রতি আনুগত্য থেকে তিনি অনেক দূরে সরে গেছেন। এইখান থেকেই বিশুদ্ধ কবিতা ও অস্পষ্ট কবিতার বিভেদ সুরু।

বিশুদ্ধ কবিতা বলতে অনেকে বুঝেছেন তা এক অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী কবিতা যা নাকি ফরাসী প্রতীকীদের আবিষ্ট কবিতা থেকে পৃথক। শেষোক্তদের মধ্যে অবশ্যই মালার্মে বা পরবর্তীকালের ভালেরি পড়েন যাঁরা শিল্পকর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। বোধির সামানায় তাঁর আদর্শ জগত খুঁজতে গিয়েই মালার্মে যে অন্তর্মুখী এ খবরটা জানা থাকলে তাঁর কবিতার অস্পষ্টতার আবরণ উন্মোচিত হয়।

মানবচেতনামুখী রেনেশাঁসের স্পষ্টতা, মানবের জয়গানের কাল যেদিন শেষ হয়ে গেল সেদিন থেকেই কবি ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে পড়লেন। আমাদের দেশে উনবিংশ শতকের রবীন্দ্রনাথে সুরু হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধেরও কিছুটা পর পর্যন্ত এই মানবিকতা ও স্পষ্টভাষিতার প্রচলন ছিল রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই। বিদেশেও যেমন, এদেশেও তেমনি। সেই উত্তুঙ্গ সামাজিক মানব নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক কারণে ক্রমশই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার ভাষা হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আগে আমরা কী দেখেছি? ঈশ্বর গুপ্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—অগ্রজ কবির প্রতি তাঁর ছিল শ্রদ্ধানিবেদন। ঈশ্বর গুপ্তের কালে অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতার কোন প্রশ্নই ওঠা সম্ভব ছিল না। মধুসূদনের বেলাতেও তাই। কবিতার বহিরঙ্গে তিনি যে নতুনত্ব এনেছিলেন, তাতে আধুনিক অর্থে অস্পষ্টতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কালেই বিরূপ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি নানা কটাক্ষের সূত্রপাত হয়েছিল—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাক্‌পদ্ধতি যে আমূল পরিবর্তন এনে দিল তা উত্তরসূরীদেরই মঙ্গলস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ভাবধারার জন্য অনেক কবিতায় অস্পষ্টতা খুঁজে (সোনার তরী) নানারকম অর্থ সন্ধান করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার রহস্যসন্ধান কি এখন বিরক্তি জাগায় না!

রিলকের অন্তত শেষ দিকের কবিতায় দর্শন খুঁজতে গিয়েই তাঁকে অস্পষ্ট ভেবেছেন সমালোচক, তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে খুঁজলে হয়ত অতটা অস্পষ্ট মনে

হত না।[৫]

রবীন্দ্রী সুর থেকে পৃথক যে বিষণ্ণ মানুষের বাক্‌ভঙ্গিমায় আধুনিক কবিতার সুরু, সেই কবিতার কলাকার কোন কোন কবির রচনায় দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা ইত্যাদি গুণগুলি আরোপিত হতে আরম্ভ করেছিল (বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' এবং সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা)। জীবনানন্দের বহু কবিতাও এইভাবে অস্পষ্ট মনে হয়েছিল। অর্থসন্ধানের প্রবল প্রচেষ্টায় 'বনলতা সেন'-এ ইতিহাস-চেতনা ইত্যাদি নানারকম বৈচিত্র্যের সন্ধান করা হয়েছিল—আসলে সেটি যে একটি কবিতা, এবং কবিতাতে বক্রোক্তি থাকবে, আলোছায়ার কম্পন থাকবে, সর্বোপরি সর্বাতিশায়ী একটা ভাললাগা থাকবে একথা ভুলে গিয়েছিলেন তখনকার পাঠক। আজ ঐসব কবিতা পঠিত হতে হতে আর অস্পষ্ট মনে হয় না। কারণ ঐ প্রিয়তম বাক্‌ভঙ্গির সঙ্গে এখন অনেকেই পরিচিত হয়ে গেছেন। জীবনানন্দ নিজেও তখন বলেছিলেন যে তাঁকে কেউ বলেছে নির্জনতম, এবং তাঁর কোন কবিতা ইতিহাস-ও সমাজ-চেতনায় বা নিশ্চেতনায় প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিস্ট—এগুলি আংশিক সত্য। তাঁর মতে, কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুইই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার। কিন্তু[৬] জীবনানন্দের এই কবিতার অর্থ কি দ্রুত বোধগম্য ?—

পটভূমি বার-বার পটভূমিচ্ছেদ
ক'রে ফেলে আঁধারকে আলোর বিলয়
আলোককে আঁধারের ক্ষয়
শেখায় শুক্ল সূর্যে, গ্লানি রক্তসাগরের জয়
দেখায় কৃষ্ণ সূর্যে, ক্রমেই গভীর কৃষ্ণ হয়।

(স্থান থেকে)

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলেছেন যে তা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ—অভিধানের সাহায্যে দুরূহতার গ্রন্থি উন্মোচিত হয়।[৭] তিনি যে ঐতিহ্য, অন্বিষ্ট, কলাকৈবল্য, ধ্রুপদী প্রভৃতি শব্দ সর্বপ্রথম ব্যবহার করে বাংলায় তাদের প্রচলন করে গেছেন সেকথা ঠিকই বলে গেছেন বুদ্ধদেব।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যচালের কবিতায় স্বভাবতই অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়, নেইও—তাঁর দুরূহ শব্দাবলী অভিধানের সাহায্যেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বরং সেই সময়ের সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অনেক কবিতাই আমাদের অস্পষ্ট মনে হয়। তা সম্ভব হয়ত কবির নানারকম ছন্দ অনুসরণ, কিংবা নানারকম পৌরাণিক

চিত্রের খণ্ড প্রয়োগের জন্যে। সে হিসেবে অমিয় চক্রবর্তীর আমেরিকা জীবনচিত্র উদ্ঘাটনের যে-সব কবিতা তা কি অস্পষ্ট নয়? বা বিষ্ণু দে-র সাম্প্রতকালের বহু কবিতাও?

তাহলে, ব্যাপারটা হয়ত এইরকম দাঁড়াচ্ছে :

১. কবিতা মানেই বক্রোক্তি, সে কারণে কবিতা গদ্যের মত স্পষ্ট নাও হতে পাবে। তার অস্পষ্টতা তার একটা গুণই বলতে হবে—অস্পষ্ট কবিতার বহুবিধ ব্যাখ্যা করা যেতে পাবে।

২. তথাকথিত দুরূহতা অস্পষ্টতা নয়। রোমান্টিক আত্মমুখী কবিদের মধ্যেই অস্পষ্টতা লক্ষণীয়।

৩. কবিতা এখন যেহেতু পাঠ্য, শ্রব্য নয়, সেকারণে তার অস্পষ্ট হতে বাধা নেই।

৪. আধুনিক কবিতায় উত্তরোত্তর ব্যক্তিক চিত্র চিত্রণের ফলে তার সাধারণ মূল্য হারিয়ে যায়, ফলে কোথাও কোথাও তা অস্পষ্ট হয়।

৫. কবিতায় একটিই মাত্র অর্থ খোঁজা বিড়ম্বনামাত্র। একই কবিতার বহু দ্যোতনা থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র পেছনে ঘুরে ঘুরে আমরা কবিতার কথাই ভুলে যাই।

৬. সব বিদ্যাই সাম্প্রতিককালে তাদের গঠনমূলক (structural) দিকের ওপর জোর দিচ্ছে। তাদের বর্ণনামূলক চরিত্রের ওপর সকলের নজর। কবিতার বেলাতেও সে-ঘটনা ঘটছে। কবিতা তার ভাষায়, চিত্রে কবিতাই হতে চাইছে।

৭. সকলেই নৈরাজ্যের কবি বলেই ব্যক্তিক চিন্তা, রূপকল্প ইত্যাদি প্রয়োগে কবিতাকে অস্পষ্ট করতে দ্বিধা করছেন না। কবিতা সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী অর্থের মাধ্যমে নয়, ইংগিতের সাহায্যে।[৮]

উপরিলিখিত কয়েকটি কথা বলা সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে নান্দনিক অর্থে পুরোপুরি বিশুদ্ধ কবিতা না হলেও আপিস ক্লাবে, পাড়ায় পাড়ায়, সাধারণ পাঠকের কাছে নজরুল, সুকান্তর সমাদর একটুও কমে নি। এই সমাদর একদা বিমলচন্দ্র ঘোষের ছিল, এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আছে। কেন এমন হয়? এঁদের ভিন্ন সুর বলে? এঁদের সুর বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, প্রতিরোধের বলে? তাহলে কি এঁদের কবিতা আবার সেই পুরনো দিনের মত পাঠকের, শ্রোতার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে? কবিতার অস্পষ্টতা কি তাহলে নেহাৎই বানানো? যাঁরা (অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিবাদী উচ্চকণ্ঠ কবিরা) জীবনের অন্ধকার দিকটা

বিবৃত করলেও তাঁদের ভাষায় কোন অস্পষ্টতা নেই—অথচ অস্পষ্টতা নাকি জীবনের নানারকম বিচ্ছেদভাবনারই ফলশ্রুতি !

আমার কিন্তু অস্পষ্টতা সম্পর্কে এইরকম মনে হয় :

১. আধুনিক কালে উদার মানবিক কবি রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ভাবধারা, জীবনদেবতা ইত্যাদি খুঁজতে গিয়ে তাঁর প্রতি অস্পষ্টতা আরোপিত হয়েছে।

২. জীবনানন্দের চিত্রলতার কোথাও কোথাও অর্থ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে হলেই বা !)—সেইজন্যে তাঁকেও অস্পষ্ট মনে হয়।

৩. আমাদের ত কোন ফরাসী একাডেমি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এসব কাজ করে না) নেই, কাজেই শাসন করার কেউ নেই।

৪. একদিকে সংবাদপত্রশাসিত পত্রিকার রচনা, অন্যদিকে অজস্র লিট্‌ল ম্যাগাজিন—কেউ কারো পরোয়া করে না, যার যা খুশি লেখে। প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে সাহিত্যের তৃতীয় জগত গড়ে উঠছে।

৫. তাৎক্ষণিক বাহবার যুগ বলে এখন শিল্পকর্মের প্রতি নজর নেই। যুগটাই অবক্ষয়ের, নৈরাজ্যের—অস্পষ্টতার কারণ সম্ভবত অহেতুক বাগবাহুল্য, বানানো ভাঙা চিত্রকল্প ব্যবহার, বানানো দুর্বোধ্যতা। বাগ্‌বাহুল্য সম্পর্কে জনৈক বিদেশীর সেই কথা মনে পড়ে : 'circumlocution, or periphrasis gives the words a spurious importance ; spurious because the words exist over a kind of void, something in the manner of florid ornamentations or a facade on a building with weak foundations'.[৯]

৬. এখন কবিতায় কেবলমাত্র একটিই অর্থ—বা আদৌ কোন অর্থ—খোঁজা হয় না বলে কবি তাঁর শব্দ ও চিত্রবাহুল্যের জন্যে অস্পষ্ট হতে পারেন। কবিতার বহু অর্থ তার ambiguity (কবিতার অস্পষ্টতা) এনে দেয়। Plurisization বা বহু অর্থ কবিতার পক্ষে ভাল এবং মন্দ দুইই।

৭. পাঠক কবিতায় কিছু বক্তব্য আশা করতে গিয়ে ব্যাপারটা গোলমেলে করে ফেলে তার মধ্যে অস্পষ্টতা খুঁজে ফেরেন। এলিয়টের ভাষায়, Instead of beginning, in a state of sensitivity he obfuscates his senses by the desire to be clever and to look very hard for something—he dosen't know what—or else by the desire to be taken in.[১০]

৮. সবচেয়ে বড় কথা হল আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন ধ্রুপদী কেতাবী নির্দেশ মেনে চলে না, ডিমাণ্ড-সাপ্লাই থিওরিকে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যেমন কোন অসাধু ধনী ব্যবসায়ী উক্ত অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আমাদের ছোট্ট পশ্চিমবঙ্গেও তেমনি সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে গুটিকয়েক অর্থশালী ব্যবসায়ী। সে অবস্থায় অস্পষ্টতা ইত্যাদি সমালোচনার শব্দগুলি শুধুই কেতাবী মনে হয়।

শেষ কথা বলতে গেলে (যদিও কোন কথারই শেষ নেই) বলতে হয়, কবিতার দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা আধুনিক যুগমানসের অবদান। বিদেশে শিল্প বিপ্লব থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সময়কে জনৈক লেখক কবিতার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কাল বলে ধরেছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগকেই এই কাল হিসেবে ধরা যায়। এই অস্পষ্টতা—যদি কেউ অস্পষ্টতা বলে ধরেন—থাকবেই যতদিন না রুচি বদলায়। স্পষ্ট কবিতাও বহু লিখিত হচ্ছে—তাতে কি পাঠক তৃপ্তি পাচ্ছেন ?

আসলে বাংলাদেশ অত্যন্ত ছোট জায়গা, তার সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যম সীমিত, নিয়ন্ত্রিত (নিয়ন্ত্রিত হলেও লোকে কাগজপত্র পয়সা দিয়ে কেনে, সে-কারণে নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না)। নতুন কবিকে নানা বাধা, লোকের ভিড় এড়িয়ে নিজের মুখ তুলে ধরতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়—সকলের পক্ষেই নিজেদের ক্ষুদে পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং, এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা বিদেশী কবিদের সম্পর্কে যেমন মানায়, আমাদের দেশে তেমন মানায় না।

among the peasantry, the poet is not divided from his audience by the barrier of literacy...Civilised poetry is the work of a more highly individualised society'.

৪ Randall Jarrell, The obscurity of the poet. In *Poetry and the Age*, নিউ ইয়র্ক, পৃ: ৪।

৫ J. E. Leishman (ed.) *Selected Poems*.

৬ জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভূমিকা, নাভানা সং।

৭ সুধীন্দ্রনাথ কাব্যসংগ্রহের ভূমিকা।

৮ 'Now, the difference between naming and suggesting is the difference between communicating to the reader and offering him something to unriddle' (S. Burnshaw, *The Poem Itself*.

৯ H. Coombes, *Literature and Criticism*, ১৯৬০, পৃ: ১১৯।

১০ *Selected Prose*, ১৯৫৩, পৃ: ৯০।

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল : গদ্যকবিতা

এক

'পুনশ্চে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লিপিকা'র (১৯২২) জন্মের কারণ নির্দেশ করেছিলেন। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ কাব্যপদবাচ্য হওয়ায় 'পদ্যছন্দের ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা' এ-কথা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল, অর্থাৎ এক কথায় গদ্যকবিতা বা প্রোজ-পোয়েম কিংবা ফ্রি ভর্স সার্থক হতে পারে কিনা সেকথা তিনি ভাবছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথকে এই প্রকরণ-পরীক্ষার ব্যর্থ অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি, এবং অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কথা রাখলেও সে-রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের মতে পরিমিতিবোধে মার্জিত ছিল না। শেষে নিজেই 'লিপিকা' লিখেছিলেন। 'লিপিকা'কে 'গল্পিকা' ইত্যাদি অনেক কিছু বলা হলেও, এর অনেকগুলিরই কাব্যগুণ সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কোনো কারণ নেই। বাংলা ভাষায় 'লিপিকা'র কবিতাগুলিই প্রথম গদ্যকবিতা বা 'প্রোজ-পোয়েম'। সে-সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি বলে 'পুনশ্চে'র কালে সেটাকে তিনি দোষ মনে করেছেন, নিজের ভীরুতাকে তার জন্যে দায়ী করেছেন, অথচ তার প্রয়োজন ছিল না। এখন স্পষ্টই আমরা দেখতে পাই গদ্যকবিতা দুরকমের—এক গদ্যের মতোই, গদ্যের ধরনে সাজানো, ফরাসী সাহিত্যে আলয়সিউ বেরত্রাঁ থেকে আরম্ভ করে আদি ও পরবর্তী প্রতীকী কবিদের মধ্যে দিয়ে আজো যে-ধারা সাঁ্যা জন্ পার্স-র মধ্যে বহমান—আর একটি ধারা যাকে মিশ্রকবিতা বলতে পারি যার আদিতে আছেন হুইটম্যান আর লাফর্গ ও যার গতি এখনো সচল (বাইবেল ও আর্নল্ডের কিছু কবিতাও এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য)।

'লিপিকা'র সাফল্যের কারণ হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের উপমা-প্রয়োগের কথা বলেছেন। তাঁর কথায় "গদ্যে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) উপমাপ্রয়োগ করেন সাধারণত অর্থের খাতিরে, সেখানে উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর। পক্ষান্তরে তাঁর কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতির প্রয়োজনে অথবা ধ্বনিমাধুর্যের তাগিদে। এ জাতীয় উপমা অর্থাগমের সহায় নয়, এমন কি অনেক সময় প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী। তৎসত্ত্বেও এতে কাব্যের অনিষ্ট ঘটে না; কারণ

কবিতাপাঠে যুক্তি হয়তো অনাবশ্যক, অপরিহার্য শুধু নিষ্ঠা। কাব্যে উপমার একমাত্র কর্তব্য পাঠকের নিষ্ঠাকে ডাক দেওয়া; এবং নিষ্ঠা যুক্তির আদেশে আসে না, আসে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আকর্ষণে।...

"'লিপিকা'র উপমা এই জাতীয় স্বপ্নময় উপমা। তার সার্থকতা অর্থগত নয়, চিত্রগত, এবং সাধারণ কবিতায় ছন্দ যেমন ধ্বনিসাম্য বজায় রেখে পাঠকের কাণ্ডজ্ঞানকে মোহজালে ঘিরে ফেলে, 'লিপিকা'য় তেমনই উপমা আলেখ্যের মায়াকাজল পরিয়ে তার তর্কপ্রবৃত্তিকে ঘুম পাড়ায়।"

'লিপিকা'র চিত্রগুলি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ তো বটেই, তা ছাড়া 'লিপিকা'র সাফল্যের অনেকখানিই মনে হয় আধুনিক বাংলা গদ্যের ক্রিয়াপদের অন্ত্য-প্রয়োগের চেয়ে মধ্য কিংবা প্রারম্ভপ্রয়োগ ও স্বল্পপ্রয়োগের সৌকর্যের মধ্যে নিহিত। তার সঙ্গে আছে সেই ক্যাডেন্সের প্রভাব, ঘুরে ঘুরে ধ্বনি, কিংবা শব্দচিত্রের পর শব্দচিত্রের বিন্যাসে একটা আবর্ত সৃষ্টি, এক প্রচ্ছন্ন অর্কেস্ট্রার নিবিড়তা—

যেমন :

"কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর, দিগন্তের মুখ বিবর্ণ, গাছের পাতাগুলো শুকনো, হলদে হতাশ্বাস।" (বাণী, ৩)

"রোজই থাকে সমস্ত দিন কাজ, আর চারদিকে লোকজন। রোজই মনে হয়, সেদিনকার কাজে, সেদিনকার আলাপে সেদিনকার সব কথা দিনের শেষে বুঝি একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়।" (মেঘলা দিনে)

"এই তো পায়ে চলার পথ। এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায়।

"নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়াল বাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে—সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, 'এই যে!' এপথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।" (পায়ে চলার পথ)

"সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।" (সন্ধ্যা ও প্রভাত)

"যখন ঝিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার থর্‌থর্‌ করছে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তার অতি কাছের ঐ

সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে।" (মেঘদূত, ৫)

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দের অনুরণনও আমাদের শ্রুতি এড়ায় না। অসমপর্বের যতিপাতে, কিংবা একই ক্রিয়াবিশেষণের (কোন্, কোনখানে) পুনঃপুনঃ প্রয়োগে এক বিচিত্র নরম অর্কেস্ট্রার সুর। গদ্যকবিতায় ইংরেজি ধরনে একেই বলা যায় 'ক্যাডেন্স' এবং এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ 'ভাবছন্দ' কথাটিকে ব্যবহার করেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন 'ভাবছন্দ' কথাটির মধ্যে 'ছন্দ' শব্দটিকে নিয়ে প্রথমত বিব্রতবোধ করলেও গদ্যকবিতায় ধ্বনিসৌষম্য আছে এ-কথা বিভিন্ন সাক্ষ্যসহযোগে প্রমাণ করেছেন—এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যেকথা বলেছিলেন তাও স্মরণ করেছেন : "গদ্যকবিতা তো ভাবেরই কবিতা, পদ্যকবিতার মতো তো তার ধ্বনির অলংকার নেই। কাজেই ভাবকেই গুচ্ছে গুচ্ছে সাজিয়ে গদ্যকবিতা রচনা করতে হয়।" প্রবোধচন্দ্র সেনকে অনাবশ্যক আক্রমণ করেও বুদ্ধদেব বসু ধ্বনিসৌষম্য সম্পর্কে সেই একই কথা বলেছেন : "আবেগের আঘাত ধ্বনির যে-তরঙ্গ তোলে আমাদের মুখের কথায়, সেটাই তো ভাবছন্দ, আর গদ্যছন্দ তারই প্রতিরূপ।" মিটার না থাকলেও গদ্যছন্দের ঝংকার আছে, এবং তারও একটা নিজস্ব প্যাটার্ন আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'লিপিকা'র ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ 'রিদমিক প্রোজ' বলেছিলেন, এবং গদ্যকবিতায় মিটার না থাকলেও রিদম যে আছে সেকথা তিনি পরে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'শ্যামলী', 'পত্রপুট', 'আকাশপ্রদীপ' ইত্যাদি কাব্যে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতাগুলিকে পদ্যের আকারে খণ্ডিত পংক্তিতে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে গদ্যকবিতায় থাকবে 'অসংকুচিত গদ্যরীতি', তাতে 'অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন-প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।' 'শেষ সপ্তকে'র ২৬ নং কবিতায় তিনি একে 'আবাঁধা বেণীর বাণী' বলেছেন—এর স্বরূপের আভাস দিয়েছেন একটি ছবির মাধ্যমে :

যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে
ডালে পালায় সব মিলিয়ে।

পাতার ভিতর থেকে
তার রং দেখা যায় এখানে সেখানে,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপটায়।
চারদিকের খোলা বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।
মুঠোয় করে ধরবার জন্যে সে নয়,
তার অসাজানো আটপহুরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্যে
তার আপন স্থানে।

দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথ এই স্তবকটিতে গদ্যকবিতার স্বরূপ বর্ণনা করলেও, এবং গদ্যকবিতায় মিটার থাকবে না এ-কথা বললেও, এই স্তবকটির প্রথম দুটি পংক্তিতে ছড়ার ছন্দ, ও তার পরের দুটিতে পয়ারের পদক্ষেপ আছে। এরকম অনেক কবিতাতেই অংশত যথারীতি ছন্দের আভাস পাওয়া যাবে, এবং সেগুলিকেই আমরা ফ্রি-ভর্স বা মিশ্রকবিতা বলতে পারি। বিশুদ্ধ প্রোজ-পোয়েম 'লিপিকা'তে এবং পরবর্তী কটি গ্রন্থেও বহুল পরিমাণে রয়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রকবিতাও যে রয়েছে এবং পশ্চিমী আদর্শে সেটাও যে একটা কাব্যরূপ এ-কথা রবীন্দ্রনাথ হয়তো জ্ঞানত ভেবে দেখেননি। 'শিশুতীর্থ'-ই তাঁর সেই প্রথম কবিতা যার মধ্যে আমরা মাত্রাযুক্ত ছন্দ ও গদ্যছন্দের যুগপৎ অবস্থান দেখতে পাই। এখানেই পশ্চিমী আদর্শে ফ্রি-ভর্সের সিদ্ধি অর্জন করেছেন কবি। এই বিমিশ্রতার একটি উদাহরণ দেওয়া গেল .

ছড়ার ছন্দ : দিন চলে যায় দিনের কাজে
অল্পস্বল্প নিয়ে।
যেমন-তেমন থাকে
অন্যদেশের সহজ চালে। (ঘরছাড়া)

পয়ার : খেলাধুলা হাসিগল্প যা হয় যেখানে
তারি মধ্যে জায়গা সে নেয়
সহজ মানুষ। (ঐ)

গদ্য : এল সে জর্মনির থেকে
এই অচেনার মাঝখানে,

ঝড়ের মুখে নৌকো নোঙর-ছেঁড়া
ঠেকল এসে দেশান্তরে। (ঐ)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ প্রোজ পোয়েম এবং ফ্রি-ভর্স দুই রীতিতেই কবিতা লিখেছিলেন এবং সবটাকেই গদ্যকবিতা বলেছিলেন। গদ্যকবিতা যে একটা বিশিষ্ট কাব্যরূপ যার সদর্থক বা ইতিবাচক সংজ্ঞা আছে সে-সংজ্ঞা তিনি দিয়েছিলেন—যেমন,

পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।
... ...
এতে চিরকাল স্তব্ধতা আছে
আর চলতিকালের চাঞ্চল্য। (নাটক, পুনশ্চ)

তা ছাড়া 'পুনশ্চে'র কবিতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এর ভাষা :

"রূপরসাত্মক গদ্য, অর্থভারবহ গদ্য নয়। তৈজস গদ্য।"
(ধূর্জটিপ্রসাদকে চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২১শ খণ্ড)

গদ্যছন্দ সম্পর্কে বলেছেন :

"এখন বই-পড়াটা অনেক স্থলেই নিঃশব্দ পড়া, কানের একান্ত শাসন তাই উপেক্ষিত হতে পারে। এই সুযোগেই কাব্যশ্রেণীর রচনা অনেক স্থলে পদ্যছন্দের বিশেষ অধিকার এড়িয়ে ভাবছন্দের মুক্তি দাবী করেছে।"
(ছন্দ, র. র., ২১শ)

টি. এস. ইলিয়ট ফ্রি-ভর্সের কোনো ইতিবাচক সংজ্ঞা খুঁজে পাননি, তাঁর চোখে পড়েছে এর নেতিবাচক গুণাবলী : (এক) প্যাটার্নের অনুপস্থিতি, (দুই) মিলের অনুপস্থিতি, (তিন) ছন্দের অনুপস্থিতি। তাঁর মতে :

Any line can be divided into feet and accents. .. The ghost of some simple metre should lurk behind the arras in even the 'freest' verse ; to advance menacingly as we doze, and withdraw as we rouse. Or, freedom is only truly freedom

when it appears against the background of an artificial limitation. (Notes on 'Vers Libre', *Selected Prose*)।

এলিয়ট সাহেব অ্যাকসেন্টধর্মী ইংরেজি কবিতার কথাই বলেছেন, বাংলা কবিতায়, মাত্রাধর্মী বাংলা কবিতায় মিটার বা ছন্দ ছাড়াও যে পদ রচনা সম্ভব এ-কথা তাঁর বক্তব্যে খোঁজার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর এই নেতিবাচকতার উত্তরে আছে রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক সংজ্ঞা। গদ্যকবিতায় তিনি ভাবছন্দ লক্ষ করেছেন, এক একটি ভাবের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিমিশ্রিত হয়ে আছে ধ্বনির উচ্চারণ, যার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাগুলিকে পদ্যাকারে খণ্ডিত করেছেন, এবং সেই খণ্ডগুলিকে প্রবোধচন্দ্র সেন 'বাকপর্ব' বা 'ভাবপর্ব' নামে অভিহিত করেছেন—যার নির্ভর অনেক স্থলেই বিশেষ্যপদের এবং কখনো কখনো বিশেষণের সুচারু প্রয়োগে ও প্রায়শই বাক্যান্ত অবস্থানে, আর ক্রিয়াপদের স্বল্প কিংবা পরিমিত ব্যবহারে ও বিন্যাসে। এই ভাবছন্দকেই ইংরেজ কবিরা 'ক্যাডেন্স' বলেছেন, এবং একে স্বীকারও করেছেন :

It is true that a more delicate sensibility and a more careful training are necessary if we are to appreciate cadenced verse, and it is true that the existence of cadenced verse blurs the distinction between prose and poerty ; but the critical vocabulary must be revised to fit the facts : to deny the facts and close your ears to the rhythms is to behave like the Inquisitor who refused to look through Galileo's telescope.
(মাইকেল রবার্টস, ভূমিকা, 'ফেবার বুক অব মডার্ন ভার্স')

রবীন্দ্রনাথ যদি প্রোজ-পোয়েম এবং ফ্রি-ভর্সের পার্থক্য নির্দেশ করে নিজের কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত করে যেতেন, তাহলে বোধ করি 'ছন্দোগন্ধি' কবিতা, 'পদ্যগন্ধি' কবিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমাদের সমালোচকেরা বিব্রতবোধ করতেন না। গদ্যকবিতা, সে প্রোজ-পোয়েম বা ফ্রি-ভর্স যাই হোক না কেন, যে একটি কাব্যরূপ তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় উত্তরকালের কবিতায়।

দুই

এর পরে আমাদের আলোচ্য তিরিশের কবিরা। 'পুনশ্চে'র পরে গদ্য-কবিতার রবীন্দ্রনাথ তখনো তাঁদের সমসাময়িক। 'পরিচয়' এবং 'কবিতা'

পত্রিকায় গদ্যকবিতার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'নতুন পাতা' গ্রন্থভুক্ত কবিতাবলী এই সময় লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার পংক্তির মতো বড়ো বড়ো পংক্তি নেই, খুব সহজ চালে পরিচ্ছন্ন একটি প্রকরণ লক্ষ করা যাবে বুদ্ধদেবের এই সময়ের গদ্যকবিতায়। 'অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব' এ-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল এবং তাঁর রচিত গদ্যকবিতার বিষয়ব্যাপ্তি দেখলে অবাক হতে হয়, কিন্তু বুদ্ধদেবের গদ্যকবিতায় সেই ব্যাপ্তি আর পাওয়া যাচ্ছে না; পাওয়া যাচ্ছে না সেই নানা ধরনের কাহিনী, তার বদলে পাওয়া যাচ্ছে একজন প্রেমিক পুরুষের আত্মচিন্তা যার প্রকাশ ঘটেছে পরিমিত-পংক্তির গদ্যকবিতায়:

আমি যদি মরে যেতে পারতুম
এই শীতে,
গাছ যেমন মরে যায়,
সাপ যেমন মরে থাকে
সমস্ত দীর্ঘ শীত ভরে। (এই শীতে)

তুমি যখন চুল খুলে দাও
ভয়ে আমি কাঁপি।
... ...
তোমার মুখ ফেরানো:
তোমার কালো চুল বেয়ে পড়ে,
তোমার কালো চুল বেয়ে ওঠে
আমার হৃদয় জড়িয়ে—
ভয়ে আমি মরি। (তুমি যখন চুল খুলে দাও)

'তুমি যখন চুল খুলে দাও'-এর মতো ছন্দের ঝংকার দিয়ে আরম্ভ হয়েছে 'চিল্কার সকাল'।

এর পরে 'মধ্যতিরিশ' বা 'শুভদৃষ্টি' কবিতা দুটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকরণগত প্রভাব লক্ষ করা যায়।

জীবনানন্দের গদ্যকবিতায় উদাসীন একটা ব্যাপ্তির ভঙ্গিমা তাঁর এক আশ্চর্য অবদান। জীবনানন্দের পয়ারেরও সেই বিস্তারিত ভঙ্গিমা দেখলে মনে হয় তাঁর বিশিষ্ট রীতি হল গদ্যকবিতার রীতি। সুন্দর কয়েকটি গদ্যকবিতাও লিখে

গেছেন তিনি। তাঁর মধ্যে সেই মিশ্রকবিতার ছন্দের সৌন্দর্যও দেখা যায় :

আমাকে
তুমি দেখিয়েছিলে একদিন :
মস্ত বড়ো ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড় মাথা—মাইলের পর মাইল ,
... .
পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়! (আমাকে তুমি)

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার ;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে। (অন্ধকার)

ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। (ঘাস)

এইরকম মিশ্রকবিতা, প্রায়শই গদ্যে ও পয়ারে, অনেকগুলি রচনা করেছিলেন জীবনানন্দ। 'হাওয়ার রাত', 'বিড়াল', 'শিকার', 'নগ্ন নির্জন হাত' আর পরবর্তীকালের 'লোকেন বোসের জর্নাল', 'অনন্দা' প্রভৃতি মিশ্রকবিতায় আশ্চর্য সাফল্য দেখিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ যেখানে ক্রিয়াপদকে অন্য স্থানে বসিয়ে বাক্যান্তে বিশেষ্য বিশেষণযোগে একধরনের ঝংকার তুলতে সচেষ্ট, জীবনানন্দ সেখানে সহজ ভঙ্গিমায়, ক্রিয়াপদের স্বাভাবিক অবস্থান বজায় রেখে একটা নতুন সুর জাগিয়ে তুললেন। সহজ ভঙ্গিতে, গদ্যের অত্যন্ত সাধারণ ভঙ্গিতে আশ্চর্য স্মরণীয় ছবি ফুটিয়ে তুললেন জীবনানন্দ : 'অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা; জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ!' এই ছবি ছন্দে হয়তো এমনভাবে প্রকাশ করা যেত না। এর ব্যাপ্তির ধরনটা রবীন্দ্রনাথের ধরন, কিন্তু এর স্বাভাবিকতা, সহজতা রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে—এবং সেখানেই আমরা জীবনানন্দকে খুঁজে নিতে পারি।

বিষ্ণু দে-র 'টপ্পা-ঠুংরি' একটি নতুন ধরনের গদ্যকবিতা। এর কাটা-কাটা বিন্যাস ও তির্যক ভঙ্গিমা এবং রবীন্দ্রনাথের পংক্তি-প্রয়োগ কবিতাটিতে

নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে :

হে বিরাট নদী !
স্টিমারের বাঁশি
খালাসির গান
সব-পেয়েছির দেশে
ককেনের দেশে
যত-কিছু বই ছিলো সব পড়ার শেষে
ক্লান্ত রক্তের বিবর্ণ আবেশে
স্টিমারের বাঁশি
আর খালাসির গান !

কাটা-কাটা ছোট পংক্তির বিন্যাসে কবিতাটিতে এক আশ্চর্য গতি এসেছে। একই কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগে যে মিশ্রকবিতার সৃষ্টি তার দৃষ্টান্ত বিষ্ণু দেব 'ওফেলিয়া', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি। 'তবুও এ দুঃসাহস, তবু আজও করে যাবো গান' পয়ারের এই পংক্তিটির পরেই মাত্রাবৃত্তে 'তুমি যেন এক পরদায়-ঢাকা বাড়ি' ও তারপরে 'উদাসীন দেখ আকাশের গায়ে মেঘেরা ছড়ায় সোনা' (ওফেলিয়া) যুগপৎ অবস্থান করছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গদ্যকবিতায় 'নীলকণ্ঠ'র জন্যে স্মরণীয়। এর বিষয়ের ভৌগোলিক বিস্তার ও নৈসর্গিক উল্লাস যেন গদ্য ও ছন্দের বিমিশ্র প্রকাশে অনিবার্য এই রীতির সাফল্য প্রমাণ করছে। এর ভাঙা, ছড়ানো, ছিটোনো ভঙ্গিমায় হাওয়াই-দ্বীপের নৃত্যের আভাস পাঠকের মনে এসে লাগে :

দেখেছি তাদের ঘাসের ঘাগরায় নাচের ঢেউয়ের হিল্লোল,
নোনা হাওয়ার দমকে দমকে যেমন নারকেল-বনের দোলা।
মোহিনী পলিনেসিয়া !

.. ..

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই !
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !

অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া', 'একমুঠো' পর্যায়ের অনেক কবিতাই এই প্রসঙ্গে

স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর 'চেতন স্যাকরা' এক আশ্চর্য গদ্যভঙ্গিতে রচিত। অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত এই কবিতাটির টুকরো টুকরো ছবি গদ্যকবিতার নতুন একটি ধরন চালু করতে চেষ্টা করেছিল :

সোনা বানাই। সাঁকোর বাঁ পাশে গয়না।
কাঁচের বাক্সে, জানলায় দ্রষ্টব্য ; জানলার উপর ময়না।
রেগে ওঠে তোমাদের ভিড়ে—ছোলা খাও, বলো "বাধে
বাধে" "কেষ্ট কেষ্ট"—বলতে বাধে
গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,
সোনার সুন্দর, রুপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে
ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর।

তাঁর 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন' এই রীতিরই ক্লাসিক নিদর্শন হয়ে রয়েছে। তাঁর গদ্যকবিতায় সর্বদাই একটা ছড়ার চাল রয়েছে, জীবনানন্দের মধ্যে যেমন আছে পয়ারের—এবং সেইটিই অমিয় চক্রবর্তীর বৈশিষ্ট্য।

এই প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের গদ্যকবিতা 'ঝিল্লীস্বর' উল্লেখযোগ্য। নগরের ঝিল্লীস্বর ও স্মৃতিমুখর এক অরণ্যের ঝিল্লীস্বর পাশাপাশি রেখে এক নায়কের প্রেমের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে।

তিন

এর পরের পর্যায়ে চল্লিশের অনেক কবিই গদ্যরীতিতে অনেক সফল কবিতা লিখেছেন। এ-যুগের এই রীতির প্রধানতম লেখক হলেন সমর সেন। ইনি গদ্যকবিতা ছাড়া অন্য কোনো রীতির কবিতা লেখেননি। হয়তো মধ্যবিত্ত জীবনের সংগ্রামী যে-রূপটির ছবি তিনি এঁকেছেন, সেই রূপ গদ্যরীতির নিরাভরণ সহজতায় সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে। এই গদ্যরীতি একান্তভাবেই সমর সেনের নিজস্ব রীতি, এর মধ্যে এখন আর রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যাপ্তি খুঁজে পাই না, অথচ এর বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সমাজসচেতনতা যা নাকি চল্লিশের কবিদের স্বরূপ—সেই সমাজসচেতনতা সমর সেনের গদ্যরীতির কবিতায় বহুল পরিমাণে দেখা যায়। সমর সেনের এই রীতি একটি প্রকৃষ্ট ও যোগ্য রীতি, যদিও পরবর্তীকালে সমাজসচেতনতা ও সহজভাব নামে এই রীতির অনেক অপব্যবহার ঘটেছে। 'আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল, নামুক মহুয়ার গন্ধ' (মহুয়ার দেশ), কিংবা 'ভুলে-যাওয়া গন্ধের মতো কখনো তোমাকে মনে পড়ে' (বিস্মৃত) প্রভৃতি লিরিকধর্মী গদ্যপংক্তির পাশে পাশেই আছে সেই

বিস্ময়কর তির্যক রীতি :

হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো—
তখন পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল :
... ...
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ। (মুক্তি)

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো! (উর্বশী)

•

হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কী আনন্দ পাও সন্তানধারণে? (মেঘদূত)

কোনো কোনো পংক্তি বিশুদ্ধ পয়ারের মতোই—তার সঙ্গেই অন্য পংক্তিতে আছে গদ্য—সব মিলিয়ে এক একটি আশ্চর্য গদ্যকবিতা।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যকবিতা-প্রকরণে অমিয় চক্রবর্তীর ধরনটা দেখতে পাওয়া যায়। যুগোপযোগী সেই তির্যক রীতি, মধ্যবিত্ত জীবনের সেই ফাঁপা অবস্থা দেখা যাবে তাঁর গদ্যরীতির কবিতায় :

বিকেলের রোমাণ্টিক আড্ডার পিঠে বুদ্ধিজীবী সহিস
চিঁড়ে-ভাজা চা সহযোগে পিকাসো-মাতিস
কিংবা ফিফ্‌থ্‌ সিম্ফনি
মৃদু টিপ্পনি
বুঝেছো পলিটিক্যাল ফাঁকি
মিরাক্যল না হাতি, গান্ধী নেহাৎই লাকি। (একা)

রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতায় কাব্যের পরিধিবিস্তারের যে-কথা চিন্তা করেছিলেন, এবং নিজের কবিতার বৈচিত্র্যে তার যে-সাক্ষ্য রেখে গেছেন তার আর একবার সাফল্য দেখা গেল চল্লিশের অনেক কবির রচনায়। সমাজ, রাজনীতি, প্রেম প্রভৃতি বিষয় নানারকম গদ্যভঙ্গিতে কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

অরুণ মিত্রের প্রোজ-পোয়েম, এবং তিনি আজও এই ধরনের গদ্যকবিতা লিখে চলেছেন, চল্লিশের যুগের আর এক স্মরণীয় অবদান। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে 'লিপিকা'র রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। তাঁর কবিতায় চিত্র এবং প্রতীক

এক অপরূপ ভাব-সমন্বয়ে অবস্থিত—যেমন, "বাসনাগুলো একসময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিলো" (অমরতার কথা)।

এরকম প্রোজ-পোয়েম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—যেমন, 'চিরন্তনী উমা' (রাণুর জন্যে), 'স্বদেশ' (উলুখড়ের কবিতা), 'পুনর্জন্ম' (ঐ) ইত্যাদি। বিমলচন্দ্র ঘোষও আশ্চর্য সুন্দর অনেকগুলি গদ্যকবিতা, বিশেষত মিশ্রকবিতা, রচনা করেছেন।

যেমন, ছোট্ট গীতিকাব্য একটি কাঁপছে থরোথরো
উর্ণনাভের আটটি বাহুর কোমল আলিঙ্গন। (দুপুরবেলার চম্পূ)
... ...

তারপরেই,
দেখতে-দেখতে ভুলে গেলুম আমার জীবন,
আমাব মরণ, আমার লক্ষ মায়া।
উর্ণনাভের সামাজিক নামটা উচ্চারণ কবতে
মনে আঘাত পেলুম। (ঐ)

এই সঙ্গে এ-যুগেব স্মরণীয় আর একজন কবি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। রাজ-নীতির উচ্চ সুর যেন এই গদ্যরীতিতেই ভালো ফুটে ওঠে। তাঁর রীতি কিন্তু রবীন্দ্রী রীতি। রবীন্দ্রনাথেব মতোই ছোট-বড়ো পংক্তিব বিন্যাসে, গল্প-বলার ভঙ্গিমায় তাঁর গদ্যরীতি এগিয়ে চলেছে। যেমন,

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেলো
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু-তিনটি মুরগির সঙ্গে।
(একটি মোরগের কাহিনী)

তারপর, তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,
একেবারে সোজা চলে এলো
ধপধপে শাদা দামি কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়
খাবার হিসেবে। (ঐ)

এখানে রবীন্দ্রনাথের কথামতো গদ্যরীতিতে বিচিত্রবিষয়সম্ভারের পরিচয় পাওয়া গেল। এরকম একটা কাহিনী—অত্যন্ত সহজ ও সরল যা হয়তো ডি. এইচ. লরেন্স 'সাপ' লেখার পরে লিখতে পারতেন—বাংলা কবিতায় বিষয়-গভীর (concrete) কবিতা বলে চিরদিন সম্মানিত হবে।

চার

এর পরে পঞ্চাশের কালে আমরা চল্লিশের অনেক কবিকে গদ্যকবিতা লিখে যেতে দেখেছি। পঞ্চাশের যুগে ছন্দের প্রতি আকর্ষণ, বিশেষত পয়ারের আকর্ষণ, বড়ো বেশি দেখা দিয়েছিল—এবং তার ধারা ষাটের মধ্যেও প্রবাহিত ছিল। পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে রাম বসুকে অনেক গদ্যকবিতা লিখতে দেখা গেছে। তাঁর চিত্রবহুল কবিতায় রক্তাক্ত এই যুগটার বিশিষ্ট আভাস—যার কিছু কিছু হয়তো tour de force বলে মনে হয়—দেখা যায়। শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' বাক্‌বহুল এক মিশ্রকবিতা যা এখনো অনেকের স্মরণ থেকে মুছে যায়নি তার শব্দনৈপুণ্য ও শব্দঝংকারের জন্যে।

গদ্যকবিতা যে কাব্যের একটি বিশিষ্ট রীতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একটি অনিবার্য রীতি এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসকে পূর্ণতর দৃঢ়তর করেছেন পরবর্তীকালের কবিরা। সে-কালের পয়ার-প্রীতি অচিরেই গদ্যকবিতার দিকে পথনির্দেশ করেছে।

আধুনিক কবিতা : ছন্দ, ছন্দহীনতা

একদা বাংলাদেশে ছন্দের চর্চা অনেকেরই সহৃদয় মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এখনো তার বেশ মিলোয় নি, কিন্তু আধুনিক কবিদের কাছে আগেকার অর্থে ছন্দ নিয়ে কোন ভাবনাচিন্তা নেই যদি ছন্দ বলতে আমরা পয়ার, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটি ধবনকে বুঝি। আধুনিক কবি উক্ত অর্থে ছন্দকে নেহাতই কেতাবি বিষয় বলে মনে করেন, সে কারণে ছন্দের আলোচনা তাদের কাছে প্রতিষ্ঠানিক কণ্ডূয়ন মাত্র। কবিতা রচনায় উক্ত তিন অর্থে ছন্দের কেউ ধার ধারেন না। ভাষা বিষয়ের আলোচনায় আমরা যেমন ব্যাকরণ ছেড়ে লোকের মুখের উচ্চারণের দিকে মনোনিবেশ করবো, তেমনি ছন্দের ব্যবহার-সম্পর্কিত আলোচনায়ও কবিতার দিকেই তাকাবে। সেখানে সনাতন অর্থে কোন ছন্দ নেই, আর নেই বলেই সেই অর্থে ছন্দের আলোচনা বর্তমানে শুধুই তত্ত্বগত আলোচনা, তার সঙ্গে ব্যবহারিক কবিতাচর্চার কোন সম্পর্ক নেই।

ছন্দের আলোচনায় সেই তত্ত্বগত দিকের পানে তাকালে স্বভাবতই সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার রায়, প্রবোধচন্দ্র, অমূল্যধন, সুধীভূষণ এবং ইদানীংকালের অনেক গবেষক ও আলোচকদের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু সে-জগত আলাদা জগত। সেখানে যা হয় বা না হয় তার সঙ্গে আধুনিক কবিদের কোন যোগ নেই।

তা হলে কি আধুনিক কবিতায় কোন ছন্দ নেই? না কি এই কবিতাকে গদ্যকবিতা বলে আখ্যাত করলেই তার শেষ পরিচয় দেওয়া হয়? গদ্যকবিতা বলে আলোচনা সুরু করলেই সম্ভবত আমরা উপরিউক্ত লেখকদের আলোচনার সঙ্গে বর্তমান কবিতার পার্থক্য বুঝতে পারবো, যদিও এ গদ্যকবিতার ধরন অনেকটাই আলাদা।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা থেকে বর্তমান কালের কবিদের গদ্যকবিতা সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথের ধরনটা ছিল অনেকটাই কাব্যিক বা poetic—ক্রিয়াপদের স্থানান্তর করে তিনি বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলেন, তাতে খানিকটা গল্প বলার আমেজ ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ

সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে'।[১] তিনি নিজে সে চেষ্টা করেছেন, এবং গদ্যের ভঙ্গি আরোপ করার জন্যে তাঁর অনেক কবিতাই বাক্‌বহুল হয়েছে ('পুনশ্চের', 'শেষ সপ্তকের' কবিতাবলী)। এই ভঙ্গিতেই তিনি আবার কোথাও কোথাও বিরল মাহাত্ম্য সৃষ্টি করেছেন (যেমন, 'পত্রপুটের' ৩নং 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী' কবিতাটি)। এই ভঙ্গি free verse এর ভঙ্গি যার বিশিষ্ট প্রকাশ ছিল হুইটম্যানের কবিতায়। এরই আর এক রূপ prose poem যা তাঁর 'লিপিকা'য় ছিল, এবং সেই ধারা সম্ভবত পরবর্তীকালে ফরাসী-জানা দুজন কবির মধ্যে দেখা যায়—অরুণ মিত্র আর লোকনাথ ভট্টাচার্যের রচনায়। এই কবিতার ধরনকে কখনো কখনো কাব্যিক বা arty মনে হয়, গদ্যকবিতার স্বাভাবিকতা যেন তাতে থাকে না।

এই ব্যাপারটা বিষ্ণু দে লক্ষ করেছিলেন, 'সাধারণ জীবনে যদি সাহিত্যের ভিত্তি গাঁথতে হয়, তাহলে যে বাংলা কবিতার নিতান্তই কবিজনোচিত ও উন্মার্গ শৌখীন চাল পরিত্যাজ্য, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এবং যতদিন না গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা বাংলা কবিতায় হচ্ছে, ততদিন সামাজিক জীবনের অলিগলিতে বাংলা কবিতার যাতায়াত রুদ্ধ। আর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কবিতার পাঁচিল তিনিও ভাঙেন না, দরকার মতো শুধু গদ্যকে চমৎকার কাব্যমণ্ডিত করে পাংক্তেয় করেন'।[২]

গদ্যকবিতার ভাষায় স্বাভাবিকতা লক্ষ করা গেল জীবনানন্দের 'ঘাস', 'বিড়াল', 'শিকার', 'নগ্ন নির্জন হাত' প্রভৃতি কবিতায়। Free verse আর vers libre-এর মাঝামাঝি ছিল সেই কবিতা—ভাষার স্বাভাবিকতা ছিল এই কবিতার মেরুদণ্ড। সমর সেন আরো এগোলেন। বিষ্ণু দে-র ভাষায় 'থাকে-থাকে গদ্যপন্থী নির্বাহকাব্যে বাক্যবহুল তাই সমর সেনকে হতে হয় না, নাটকের পাত্রপাত্রীর মর্মোক্তির মতোই তাঁর কবিতা আমাদের সামনে একেবারে আবির্ভূত হয়'।[৩] তাঁর মধ্যেই আজকের পয়ার ও পয়ারহীনতার মিশ্র প্রয়োগ ছিল : 'বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে দেখি/দেখি আর শুনি/গন্ধস্নিগ্ধ হাওয়ায় কিসের হাহাকার…'।

চল্লিশের যুগে নানাধরনের কবিতা লেখা হয়েছিল। রাজনৈতিক কবিতার সরাসরি গদ্য উচ্চারণ সে সময়ে ছিল। বুদ্ধদেব আক্ষেপ করেছিলেন, 'যুদ্ধের সময়ে, মনে পড়ে, তথাকথিত গদ্যকবিতার পাঁকে বাংলা কবিতার নতুন উদ্যম

ডুবতে বসেছিল'।[৪] তিনি ১৯৫০-এ বাংলা কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আর—একটা সুলক্ষণ এই যে ছন্দের দিকে মন ফিরেছে।…গদ্য আর কবিতার প্রভেদ নিয়ে সব তর্ক শেষ হবার পরে এই কথাটা বাকি থাকে যে ও-প্রভেদ আর-কিছুতেই নেই শুধু ছন্দেই আছে।…নতুন কবিরা যে নতুন ক'রে ছন্দের দিকে ফিরেছেন, এটা আশার কথা'।[৫] ১৯৫০-এ তিনি ঠিকই দেখেছিলেন। সে-সময় প্রকাশিত পঞ্চাশের কবিদের কাব্যগ্রন্থাবলীতে ছন্দের কবিতা বিশেষত পয়ার-নির্ভর কবিতা এখনো দেখা যেতে পারে—কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁরা গদ্যকবিতার সহজতায় আশ্রয় নিলেন। চল্লিশের দুএকজন কবি—যেমন কিরণশঙ্কর—যাঁরা চতুর্দশপদীর নিগড়ে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁরাও এই সংক্রাম এড়িয়ে যেতে পারলেন না। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো এখন আর 'রাণুর জন্যে'-র মত শুধুই পয়ারনির্ভর কবিতা লেখেন না।

এই ছন্দহীনতার ছন্দ আমাদের কবিতায় দেখা দিয়েছে পঞ্চাশের শেষ দিক থেকেই। যাঁরা এককালে ছন্দ ছাড়া লিখতেন না, তাঁরাও এখন ছন্দহীন ছন্দের কবিতা লিখছেন। পুরনো আমলের অনেকে ছন্দের নিগড় ভেঙে এই ছন্দহীন ছন্দে—যা একরকমের গদ্যকবিতাই—লিখতে সুরু করেছেন। আমার প্রথম দিকের—এবং অনেকদিন পর্যন্ত—কবিতার বইগুলি ছন্দনির্ভর কবিতায় ভর্তি ছিল ('অজ্ঞাতবাস,' 'নিমডালের ফুল,' 'ঘর খুলে বারান্দায়')—এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে ভালই লেগেছে ('সেই লোকটাকে খুঁজছি'তে)। আসলে পয়ার-নির্ভর এই ছন্দহীন ছন্দ পঞ্চাশের কবিদের অবদান বললে ভুল হবে। দীপঙ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখ 'শতভিষা'র আদি সম্পাদকেরা ছন্দের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন—তিনি নিজেও এই বিদ্রোহী ছন্দে কিছু লিখেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। 'কৃত্তিবাসের' প্রথম দিকে কাবরা ছন্দ ছাড়া লিখতেই পারতেন না।

তাহলে এর জনয়িতা কে? রবীন্দ্রনাথে এর আংশিক সূত্রপাত ছিল (তাঁর 'লেখন'-এ বিমিশ্র ছন্দ-অর্কেস্ট্রার পরিচয় রয়েছে), জীবনানন্দে ছিল, সমর সেন-এ ত ছিলই। পরে চল্লিশের রাজনৈতিক কবিতাবলীতেও ছিল বোধ করি। পঞ্চাশের যুগে বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা'র শাসনে, 'কৃত্তিবাসের' তৎকালীন ঔদার্যে এবং 'শতভিষা'র দুই অভিভাবকের (দীপঙ্কর ও আলোক) জন্যে ছন্দ না মেনে উপায় ছিল না। তাহলে এই ছন্দভাঙার বিজয়কেতন ওড়াল কে? শেষ পঞ্চাশের কোন কবি? ষাটের কবিরা?

না। এই ছন্দ ভাঙার বিজয়কেতন উড়িয়েছে একালের মানসিকতা। হয়ত বিষ্ণু দে-র ('জন্মাষ্টমী', 'প্রতীক্ষা') কিংবা শঙ্খ ঘোষের ('দিনগুলি রাতগুলি') নানা ছন্দমিশ্র কবিতায় আজকের ছন্দহীন ছন্দের কবিতার পূর্বাভাস ছিল। পঞ্চাশের কবিদের উদ্যমের পর কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে—আমার মনে হয় ছন্দহীন ছন্দের কবিতা তার জন্যেই রচিত হতে আরম্ভ করেছে, তাতে নতুন পুরনো সব কবিই ভেসে গেছে। এই ঘটনাগুলিকে সূত্রাকারে লিখলে এইরকম দাঁড়ায় :

১. বহু লিট্‌ল ম্যাগাজিন এই সময় বেরোতে আরম্ভ করেছে যারা কোন রকম এস্ট্যাবলিসমেণ্টের ধার ধারে নি।

২. কোন কোন কবি গদ্য ও কবিতার সীমারেখা সোচ্চারভাবেই মুছে দিতে চেয়েছেন।

৩. এস্ট্যাবলিসমেণ্টের কাগজে এই নতুন ধরনের কবিদের অনুপ্রবেশ ঘটে যাওয়ায় পুরনো সব মূল্যমানকেই ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

৪. কবিযশঃপ্রার্থী এত বেড়ে গেছে যে—এবং ছাপাখানার প্রাচুর্যে—যে কেউ কবি হতে পেরেছে, ছন্দ জানুক বা না জানুক।

৫. বিদেশী কবিতা ও তার বাংলা অনুবাদ মৌলিক রচনার ধরনকে প্রভাবিত করেছে (রবীন্দ্রনাথ যেমন 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি গদ্যানুবাদ মনে রেখে গদ্য কবিতা লিখতে এগিয়েছিলেন)।

সবচেয়ে বড় কারণ, কবিতা ও কবিতার শরীর সম্পর্কে চিন্তার একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এই সময়ে—অভিভাবকহীন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের স্বাধীনতা এ বিষয়টা ত্বরান্বিত করেছে। সেই কারণটি হল :

৬. কবিতা বলতে যে শুধু অর্থনির্ভরতা বোঝায় না সেই সত্য উপলব্ধি শুধু বিদেশ নয়, আমাদের দেশেও দেখা দিয়েছে। ছন্দবদ্ধ একটি কবিতা প্রায়শই তার ছান্দসিক বন্ধনের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে—যেমন চতুর্দশপদী তার ছন্দবন্ধনের মধ্যে একটি বক্তব্যই উন্মোচিত করতে চায়। এখনকার স্বাধীন কবি হাজারটা অর্থ বোঝায় একটি কবিতার এক একটি পংক্তিতে। কে বলেছে কবিতায় একটিই অর্থ বোঝাতে হবে, বা আদৌ অর্থ বোঝাতে হবে? কিছু চিত্র, কিছু ভাললাগা, কিছু স্বপ্ন, কিছু বোঝা, কিছু না বোঝা সব নিয়েই ত কবিতা—এদিক থেকে আমাদের আধুনিক কবিরা ছন্দহীনতার ছন্দে শাপে বর খুঁজে পেয়েছেন। কাজেই, কবিতাকে এক নতুন পরিবেশে

দাঁড় করিয়েছেন তাঁরা, এবং এই আগ্রাসী যৌবনের উদ্দামতায় আচ্ছন্ন করেছেন ছন্দনির্ভর পঞ্চাশোর্ধ্বের কবিদেরও (যেমন, কিরণশঙ্করের 'বৃষ্টি এলে'-র কবিতাগুলি)।

একজন আধুনিক সমালোচক অর্থপ্রধান কবিতা সম্পর্কে 'heresy of paraphrase' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর কথায় 'if we allow ourselves to be misled by the heresy of paraphrase, we run the risk of doing even more violence to the internal order of the poem itself. By taking the paraphrase as our point of stance, we misconceive the function of metaphor and metre. We demand logical coherences where they are sometimes irrelevant, and we fail frequently to see imaginative coherences on levels where they are highly relevant'.[৬] এই সমালোচক কবিতাকে স্থাপত্য বা চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, 'the structure of a poem resembles that of a ballet or musical composition. It is a pattern of resolutions and balances and harmonizations, developed through a temporal scheme'।[৭]

এখনকার অনেক কবিতায় আমরা এক পংক্তির সঙ্গে আর এক পংক্তির অর্থের প্রবহমানতা দেখতে পাই না, কিন্তু এক একটি পংক্তির ঔজ্জ্বল্য আমাদের মুগ্ধ করে (যেমন, শম্ভু রক্ষিত)। এখন অর্থপ্রধান কবিতাগুলিকেই এলিয়ে পড়েছে মনে হয়, মনে হয় নেহাতই গোবেচারা। ছন্দহীন কবিতা সব দিক থেকেই কবিতাকে ছুটি দেয়। ছন্দ ও অর্থ সৎ কবিতায় একাত্ম বলে একের মুক্তি অন্যতেও সঞ্চারিত হয়। এক একটি পংক্তির প্রতি স্বর্ণকারের দৃষ্টি থাকায় তাকেই তীক্ষ্ণ করার দিকে নজর থাকে। ছন্দহীনতার মুক্তি কবিকে অনেক স্বাধীনতা এনে দেয়। একালের কবিকে কেতাবি ছন্দ তাই বাঁধতে পারছে না।

এখন প্রশ্ন, সত্যিই কি এখনকার কবি ছন্দহীন নৈরাজ্যের কবি—অর্থাৎ ছন্দকে অস্বীকার করে থাকেন? ছন্দ বজায় রেখেও সুন্দর পংক্তিতে আপাত-বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনা সম্ভব (যেমন, শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা বিনয় মজুমদার)। কিন্তু এদিকে খুব বেশি কবির নজর নেই। ছন্দহীন ছন্দে খুব অনায়াস গতি আসে, তাবৎ বিশ্বের, ইংরেজি কবিতার পাশাপাশি বসানো যায় বাংলা কবিতাকে।

সত্যিই কি ছন্দহীন কবিতা? একটা ছন্দ নিশ্চয়ই আছে—না হলে ত খবরের কাগজের এক টুকরো, বা মুখের ভাষার খানিকটা অংশ হয়ে যায় কবিতা। এইখানেই আমরা এলিয়টের কথা স্মরণ করি। ইংরেজের যেমন iambic pentameter, আমাদের তেমনি পয়ার—কাশীরাম থেকে সুরু করে আজো তার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলছে নানা বাঁকে, নানা রূপে।

সব কবিতাই যে অর্থনির্ভর নয় এমন বলছি না। অনেক অর্থনির্ভর কবিতাও এখন এই বিমিশ্র ছন্দে লিখিত হচ্ছে। কেউ আর প্রতিষ্ঠানিক ছন্দে ফিরতে চাইছেন না। এক কবি যেমন লিখেছেন, 'গদ্যের ছন্দ বাক্‌প্রবাহের স্বাভাবিক ছেদনির্ভর, যতিনির্ভর নয় বলে গদ্য-ছন্দ 'প্রস্ফুট নয়, 'অস্ফুট' :—ছেদনির্ভর বাক্যাংশগুলির নিরূপিত বিন্যাসই গদ্য-ছন্দের উৎস।[৮] অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, একদা মধুসূদন পয়ারকে যতিনির্ভর করে প্রবহমানতা এনেছিলেন কাব্যে, পরে রবীন্দ্রনাথের নানাধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার পর অনেক কবির অনুশীলনের মাধ্যমে হাল আমলে কবিতা প্রায়-গদ্যে রচিত হওয়ার জন্যে মুখের স্বাভাবিক কথার মত ছেদনির্ভর হয়েছে, গদ্যপদ্যের সীমারেখা ভুলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

আসলে আমরা কিন্তু ছন্দকে একেবারে বর্জন করিনি। এলিয়টের গদ্য-কবিতার আলোচনার কয়েকটি কথা আমাদের পয়ার সম্পর্কেও প্রযোজ্য, the ghost of some simple metre should lurk behind the arras in even the 'freest' verse ; to advance menacingly as we doze, and withdraw as we rouse. Or freedom is only truly freedom when it appears against the background of an artificial limitation.[৯]

আমাদের আধুনিক কবিতাতেও দেখা যাবে পয়ারের উপস্থিতি, পরিবর্তন যেটুকু সেটুকু শুধুমাত্র কবিতাকে স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত, কবিতাকে 'কাব্যিক' না করার দিকেই এখন কবির ঝোঁক।

সাবেক ছন্দকে পুরোপুরি ছুটি দিলে কবিতা হয় free verse, না হয় prose poem হয়ে পড়ে। পয়ারের ইসারা কিন্তু গদ্যকবিতার মুখটা কবিতার দিকে ফিরিয়ে রাখে ; সেই vers libre বা গদ্যকবিতাই এখন কবিদের প্রিয়। নীচের কয়েকটি উদ্ধৃতিতে পয়ার ও পয়ারহীনতার যুগপৎ উপস্থিতি এই কাব্যরূপের পরিচয় দেবে। মোটা-অক্ষর পংক্তিগুলিতে গদ্যছন্দের সঙ্গে

পয়ারের সহাবস্থান দেখা যাবে যা আলোচ্যকালের বাংলা কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১. কোথায় পাবো আমি
কঠিন সত্য চেঁচিয়ে বলার সাহস ?
জন্ম থেকেই আমি মিথ্যের মুখোশ
দেখেছি, তার অসীম স্পর্ধা !
জ্ঞান না হতেই ভূত-তাড়ানোর ওঝা
আমার অবাধ্যতাকে কান ধ'রে
দুই গালে চড় মেরেছে ![১০] (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

২. এক পা বাড়ালেই ধুলো আবেক পা বাড়ালে রক্ত,
পায়ের নীচে ধুলো আর রক্ত একাকার।
যখন জন্মেছিলাম কেবলই বিধ্বস্ত হতে হবে,
এরকম তো কথা ছিল না।[১১] (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত)

৩. আমার চাবিটা কোথায় হারিয়ে গেছে।
ঘরের দরজা বন্ধ, ভেতরে যেতে পারছি না।
এমন কি তোরঙ্গ আসবাবপত্র
পোশাক আশাক সব কিছুই
ঘরের ভেতর।
নীচের কুঠুরি ঘরে সিন্দুক রয়েছে
বাপদাদার আমলের ;[১২]...(অরুণ ভট্টাচার্য)

৪. শরীর আছে বলেই রক্ত, রক্ত আছে বলেই রক্তসঞ্চালন
রক্তসঞ্চালন শিরায়-শিরায় স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বিনী
তিরতির করে স্বাদ-অবসাদ বোঝাতে-বোঝাতে
বয়স বাড়িয়ে দেয় ;[১৩] (সুনাথ মজুমদার)

৫. আমার দশ আঙুলেব ভিতর থেকে দশটা হাত
তোমাকে জড়িয়ে আছে।
উড়ে যাওয়া চোখের মণি
তোমার ঠোঁট চুষে নেয়।[১৪] (সুব্রত রুদ্র)

৬. **অশান্ত, অনল আমি, নক্ষত্রপথের আতিথ্যে থরথর করে**
কেঁপে উঠছি

অয়োমুখ অরূপেরা শত অপ্রস্তুত গন্ধের সার্থকতা নিয়ে
চলে বিক্রমের প্রেরণার বশে…[১৫] (শম্ভু রক্ষিত)

৭. হয়তো অনূঢ়া কোনো
আঁচলে দেয়ালে নখে
নিজস্ব রেখাচিত্র এঁকে যায় দেখি…[১৬] (সন্তোষ চক্রবর্তী)

যে যাই বলুক, কবিতা সাবেকি ছন্দবন্ধ থেকে মুক্তি পেয়ে এখন তার পরিসর বিস্তৃত করতে পেরেছে। এখন কবিতা ঝরঝর করে পড়া যায়—কিছু না কিছু ভাল ত লাগেই। অর্থের বন্ধন শেষ কথা নয় বলে, এখন প্রতি পংক্তিই একটি কবিতা, এক কবিতায় একশো কবিতার সমাবেশ। ব্যক্তিগতভাবে

১. এখন আর আমাকে দীপঙ্কর দাশগুপ্তের কথামত 'দীর্ঘায়ু'র বদলে 'দীর্ঘ-আয়ু' করে মাত্রা ঠিক করতে হয় না কবিতায়।
২. কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে সনেটের আট / দশ পর্ববিভাগের ব্যাপারে তর্ক করতে হয় না।
৩. তারাপদ রায়কে আট / দশ মাত্রাভাগ বা পয়ার কিছুই বোঝাতে হয় না।
৪. মানে হল কি না হল তার জন্যে ভাবতে হয় না।
৫. বুদ্ধদেবের শব্দবদল, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ছন্দের শাসন মানতে হয় না।

যখন অর্থ নিয়েই চিন্তা নেই, তখন ছন্দ নিয়ে ভাববার কি আছে? গায়ক যেখানে নানা সুরের আবহ সৃষ্টি করছেন, সেখানে তবলচিরও মুক্তি নানা তালসৃজনে। হৃদয়ে যাঁর কবিতা এবং যিনি শিল্পী তাঁর রচনা কবিতাই হবে, গদ্যে কবিতা যে কেউ লিখলেই তা যে কবিতা হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এলিয়টের কথা স্মরণ করতে ইচ্ছে করে এই প্রসঙ্গে : as for *vers libre*, we conclude that it is not defined by absence of pattern or absence of rhyme, for other verse is without these ; that it is not defined by non-existence of metre, since even the worst verse can be scanned ; and we conclude that the division between conservative verse and *vers libre* does not exist, for there is only good verse, bad verse, and chaos.[১৭]

১ 'পুনশ্চের' ভূমিকা

২ 'বাংলা গদ্যকবিতা', **সাহিত্যের ভবিষ্যৎ**

৩ তদেব

৪ 'বাংলা কবিতা', **স্বদেশ ও সংস্কৃতি**

৫ তদেব

৬ Cleanth Brooks, *The Well-wrought Urn*, পৃ: ১৬৪

৭ তদেব

৮ দীপংকর দাশগুপ্ত, 'বাঙলা ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর, **শতভিষা**
৪২ সং, ১৩৮২

৯ T. S. Eliot, Reflections on *vers libre*. *In Selected Prose*.

১০ 'আমি কোথায় পাবো তাবে ?', **শীতবসন্তের গল্প**

১১ 'কথা ছিল না', **বৃষ্টি এলে**

১২ 'ভেতরে যেতে হলে', **সময় অসময়ের কবিতা**

১৩ 'ব্যক্তির অন্তর্বিশ্ব', **কর্মস্তব্ধ নীরবতা**

১৪ 'দশ আঙুলের ভিতর থেকে', **সুব্রত রুদ্র / শম্ভু রক্ষিত**

১৫ 'কান্নাগরা', **তদেব**

১৬ 'নিজস্ব রেখাচিত্র', **সমস্ত বিবর্ণ পাখীর নাম নীলকণ্ঠ**

১৭ T. S. Eliot, তদেব ।

আধুনিক বাংলা কবিতা : গতি ও প্রকৃতি

আশ্চর্য দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার যৌগপদ্য আমাদের মনে পড়ে। রবীন্দ্র-শতাব্দী আধুনিক বাংলা কবিতারও এক উজ্জ্বল শতাব্দী। কৌতূহলিক আমরা এ-দুটি ঘটনার তাৎপর্য অস্বীকার করতে পারি না।

আধুনিক বাংলা কবিতার সূত্রপাত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক বছর আগে, তার বৈশিষ্ট্য পূর্ণ-উদ্ভাসিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এবং আজও সেই ধারার আবর্তন-বিবর্তন আমাদের দৃষ্টির গোচর। আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য যে-মন্ময়তা ও যে-সচেতন কারুকর্মের প্রতি আগ্রহ তা সর্বপ্রথম মধুসূদনের মধ্যেই দেখা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে ঠিক এই গুণগুলি দেখা যায়নি বলেই—তাঁর অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও, তাঁর যুক্তিবাদী পরিহাসপ্রিয় বিষয়গম্ভীরতা দেখা গেলেও—তাঁকে আমরা আধুনিক বলতে কুণ্ঠিত হই। বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনকে বলেছিলেন, ‘শিক্ষিত বাঙালার কবি।’ এ-কথাগুলির যাথার্থ্য সন্দেহের অতীত।

মধুসূদনের মধ্যে সেই মন্ময় আধুনিকতা দেখা গেল তাঁর চতুর্দশপদী কবিতায়। এখানে তিনি নিজের কথা বলেছেন (‘আত্মবিলাপ’)। ‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটিতেও তাঁর সেই আত্মবিশ্লেষণ আমাদের চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথও মধুসূদনের কাব্যের এই দিকটির কথা ভোলেননি “· মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে ···”।

এর পরেই বিশিষ্ট যে-কবির কথা আমাদের মনে পড়ে তিনি বিহারীলাল—রবীন্দ্রনাথ যাঁর কাব্যের সম্যক আলোচনা করেছেন, এবং যাঁকে নিজের কবি-কৃতির প্রাথমিক পর্যায়ের পথপ্রদর্শক বলে গণ্য করেছেন। ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মধুসূদনের পরেই কিন্তু বিহারীলালকে আনা যায় না। এই দুজনের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুকরণ-উদ্ভাবন করেছিলেন বলদেব পালিত, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কবিরা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মেঘদূতের’ অনুবাদ সে-যুগের কালিদাস-অনুবাদ তথা সংস্কৃত গ্রন্থাবলী অনুবাদের মতো বিশিষ্ট কবিকর্মেরই স্মারক। এরই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বা যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কোন কোন ভাল কবিতাও মনে পড়ে, যেমন মনে পড়ে দীনেশচরণ বসু-র একটি কবিতা ‘ভালোবাসা’ বা রাজকৃষ্ণ রায়ের কোন গদ্যকবিতা।

রবীন্দ্রানুসারী সেই সব কবিরা—দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল—আমাদের পুরনো একটি গীতিকবিতার আবর্তকে মনে পড়িয়ে দেন। তা ছাড়া মহিলা-কবিদের মধ্যে কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, স্বর্ণকুমারী দেবী এঁরাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এর পরের পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি যে-প্রবাহ তার ধারকবাহক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মোহিতলাল মজুমদারের দেহবাদী কাব্যবস্তুর কথাও মনে পড়ে: "ওগো, সে কামনা মোর জ্বলে নিবে গেল শিমুলের শাখে-শাখে…কাঁদে কাম-বধূ বিদায়-বিধুর, নূপুর খুলিয়া রাখে।"

তিরিশ সাল থেকে বাংলা কবিতার সর্বাধুনিক যে-ধারা—নাগরিক মধ্যবিত্তের সমস্যাজর্জর যে-রূপ—তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে জীবনানন্দের 'এই সব দিনরাত্রি', বিষ্ণু দের 'পাঁচপ্রহর' কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নান্দীমুখ'। এই পর্যায়ের অন্যান্য কবি—অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র। আধুনিক যুগটাকে এই কটি ছত্রেই যে কোনো উদাসীন পাঠকও চিনে নিতে পারবেন:

পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ-অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই,*

(এই সব দিনরাত্রি : জীবনানন্দ)

তিরিশের যুগেরই বিবর্তন দেখা গেছে চল্লিশের যুগে। সেই যুগে কবিদের সংখ্যাও যত বেশি, দিনের সমস্যাও তত বেশি, এবং কাব্যপ্রকরণও সেই অনুপাতে বহু-বিচিত্র। সমর সেনের 'নববর্ষের প্রস্তাব' যেন এই যুগটারই ভূমিকা। এখন থেকে কবিতা যেন চারদিকের বস্তুতে, লেখকের চলাফেরায়, বসে থাকায় প্রতিনিয়ত অত্যন্ত কাছের জিনিস হয়ে উঠেছে। এখন যেন কবি ও মধ্যবিত্ত একটি লোক, একই সত্তা—কবিতা ও জীবন এক ঘরেরই বাসিন্দা। সে-কারণেই এমন আশ্চর্য সব পংক্তি দেখা যায়:

আধুনিক কবিতা সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্যও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়. 'এককেন্দ্রিক সাহিত্য-কৃতির দিন চলে গিয়ে এখন এসেছে বহুকেন্দ্রিক সাহিত্যসিদ্ধির কাল। বহুর সংযোগে কাব্যের যে ট্যাপেস্ট্রি নির্মিত হয়, সেখানে প্রতিটি বর্ণের, প্রতিটি ছাঁদের স্বতন্ত্র কুশলতায় একই ভাবার, একই সংস্কৃতির, একই যুগের সার্বিক রূপ প্রতিফলিত হয়' (অমলেন্দু বসু, চল্লিশের দশকের কবিতা, উত্তরসূরি, ১৮ বর্ষ, ৩ সংখ্যা)

হাতে নিয়ে মনে হল একটা রক্তগোলাপ
যাবার সময় ওর খোঁপা থেকে পড়ে গিয়েছিল।
কাছে নিয়ে দেখি—
না না না
এ যে আমার বুকের রক্ত-মোছা রুমালটা!

(রক্তগোলাপ : বিমলচন্দ্র ঘোষ)

রাত্রির এ-অন্ধকারে মানুষের খাদ্য হতে
দলে-দলে গোরু-ভেড়া চলে,
পালকের ডিনার টেবিলে
তন্দ্রার মন্থর সেই অস্পষ্ট খুরের শব্দ
কখনো কি আর মনে পড়ে ?

(ধানকাটা মাঠ : কামাক্ষীপ্রসাদ)

তবু সে যুগের সাধনা এক ধরনেরই নয়, সে-যুগের কবিই জানেন : 'অপমৃত্যু ডেকে আনে একচক্ষু যত হরিণেই' (একচক্ষু : কিরণশঙ্কর)। তাই আমরা 'একচক্ষু'র মতো ঝরঝরে পরিষ্কার রোমান্টিক কবিতা যেমন পাই, তেমনি পাই মহাভারতের রূপকল্পে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রভাস'।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতে "চল্লিশের যুগে সব চাইতে সুস্পষ্ট বিরোধী সুর শুনিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ যখন রবীন্দ্রনাথও বামপন্থার স্নেহে দোলায়িতচিত্ত হয়েছেন" ('কবিতা : চল্লিশের যুগ', পূর্ব্বাশা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬১)। এই বিরোধী সুর, এই যন্ত্রণার সুর প্রেম-প্রকৃতি-প্রীতির প্রতিক্রিয়ায় জীবনানন্দের মধ্যেও ছিল, বিশেষত তাঁর শেষ দিকের রচনাবলীতে।

আমাদের আলোচ্য সেই কালের নবাগত কবিদের নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর শেষ দিকের কবিতায়, তাঁর চিত্রে নিজেকে ভেঙেছেন সেইরকম তিরিশের কোন কোন কবি নতুনতর কবিতার বৈতালিক হয়েছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কথামত "যুদ্ধকাল আমাদের কাব্যকে বিচিত্র বর্ণে ও অভিজ্ঞতায় চিহ্নিত করে গেছে।...যুদ্ধময় পৃথিবীতে যখন চল্লিশের দশক দ্বার-উন্মোচন করল তখন দেখা গেল যে যুদ্ধের জন্যেও কবিতা হয়।...মন্বন্তরে প্রচুর কবিতা লেখা হল। দায়িত্ব-শীল কবি ছাড়াও অনেক নবীন-প্রবীণ কাব্য-প্রবণ ব্যক্তি এ-সময়ে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট কবিতা দান করেছেন। যুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, মন্বন্তর প্রভৃতি দুর্যোগ বাঙালী জীবনের জাড্য-দোষ ঘুচিয়ে সাহিত্যে যেন একটি ঐলিজবেথীয়

যুগ এনে দিতে চাইছিল। এযুগে আবেগ ও যুক্তি বাঙালী চিত্তে পাশাপাশি বসবাস করতে সুরু করেছে।... চল্লিশের দশকে প্রেম ছাড়াও অন্যান্য ভাব কবিচিত্তে চৈত্য-ধ্বজছত্র হবার উপক্রম দেখিয়েছে।"

চল্লিশের এই কবিদের জন্মকাল প্রথম মহাযুদ্ধের সমসময় থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী দশ বছর পর্যন্ত, এবং তাঁদের কাব্যের উন্মেষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরু থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী দশ বছর কাল পর্যন্ত। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাঁর তিরিশের যুগের কবিদের জীবনযন্ত্রণায় জর্জর কবিতাগুলি লক্ষ করেছিলেন, যদিও তৎকালীন এই নবীন কবিদের প্রসঙ্গও তিনি উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁদের সমাজমনস্কতা ও বাংলা তন্ময় কবিতার বহমান ঐতিহ্য যে তাঁদের মধ্যে বিধৃত তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

পরবর্তীকালে (১৯৭০ দশকে) 'উত্তরসূরি' পত্রিকায় চল্লিশ দশকের কবিদের নিয়ে এক সংকলনের আলোচনাসূত্রে অমলেন্দু বসু ঐ যুগের ওপর আলোক-সম্পাত করেছেন : "চল্লিশের দশকে যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁদের পক্ষে সমকালীন যুগধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তীক্ষ্ণভাবেই সচেতন হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।...ঐ দশকেই সারা বিশ্বেই প্রচণ্ড ক্রান্তিকারী সংঘাত চলেছিল, তাছাড়া সেই জাগতিক সংঘাতের অতিরিক্ত সংঘাত চলেছিল সারা ভারতবর্ষে এবং বিশেষত বাংলা দেশের নিজস্ব বহ্নিময় অভিজ্ঞতায় মথিত হয়েছিল যাবতীয় সৎ বাঙালীর ধ্যানধারণা" (চল্লিশের দশকের কবিতা, উত্তরসূরি, ১৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)। তাঁর মতে, "চল্লিশের দশকের কবিদের যন্ত্রণাবোধ আধ্যাত্মিক-দার্শনিক শ্রেণীর মনোবিকলন নয়, বরং জড়জাগতিক প্রত্যক্ষ সামাজিক ঘটনাবলী থেকে উদ্ভূত।...আত্মরতি নয়, বহুর সাহচর্য এই দশকের কাব্যের যুগধর্ম।... এঁদের কবিসত্তায় রাজনীতি নিছক নীতি নয়, আসলে জীবনবোধের বিশিষ্ট ভঙ্গী। সেই ভঙ্গীর ঐকান্তিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কবিকর্ম।...রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালের শেষ দিকে যে ঘনকৃষ্ণ কালান্তর, যে সর্বনাশা সংকট আকুল করেছিল শিল্পীচিত্ত, সে-সংকট যেন অনতিক্রম্য হয়ে উঠল চল্লিশের দশকে। মানুষে বিশ্বাস হারাবার পাপে কেউ শখ করে লিপ্ত হয় না কিন্তু ঐ দশকে বিশ্বাস হারাবার কারণ ছিল অসংখ্য এবং শাণিত, সমসাময়িক ঘটনাবলীতে কবিদের জীবনপ্রত্যয় আহত হয়েছে কতবার!" শ্রী বসুর মতে এঁদের "বাক্‌ভাণ্ডারের মহার্ঘতম সম্পদ এক অনায়াস সারল্য, সাবলীল স্বচ্ছতা।...যেহেতু এই কবিদের অম্বিষ্ট কাব্যের ও জীবনের অঙ্গাঙ্গী সংযোগ সেজন্য কখনো কখনো কবিতার

আশু বিষয় হয়েছে একটি সীমিত কাহিনী বা ঘটনা সংস্থান, তার বর্ণনায় কবির মাধ্যম সহজ আলাপনের আটপৌরে ভাষা।...ভাব ও ভাষার এই সহজসারল্য চল্লিশের দশকের কাব্যের মস্ত যুগলক্ষণ।"

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের, পরের ও সমসাময়িক এই যুগটির পশ্চাৎপট আমাদের অজানা নয়। বিপর্যস্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে চল্লিশের কবিদের স্ফুরণ ঘটেছিল। তাঁদের যুগ তাঁদের বহির্মুখী করেছিল, অন্তরের গোপন গুহায় অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে তাঁদের বিচরণের মানসিকতা গড়ে ওঠে নি, স্পষ্টচিত্রব্যবহার তাঁদের স্বভাবজ, এমন কি তাঁদের দার্শনিকতাও (যেমন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীতে) স্পষ্ট, ঋজু। তাঁদের প্রেম কিংবা প্রকৃতির কবিতাতেও পরবর্তীকালের কবিদের মত মনোবিলাস কিংবা দেহবিলাসের পরিচয় নেই বললেই চলে—এতেই বোঝা যায় তাঁরা সময়শাসিত ও নিষ্ঠাবান। তাঁদের রচনারীতির তন্ময়ভাব তাঁদের এখনকার কবিতাতেও মেলে, চল্লিশের যুগে ত মিলতোই—এই তন্ময়ভাব বাংলাদেশের ঐতিহ্যাগত প্রাচীন সম্পদ, গত শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এরই নবপথিকৃৎ ছিলেন। নীচে উল্লিখিত কবি ও কবিতার উৎস প্রধানত 'উত্তরসূরি'র উপরিউক্ত সংখ্যাটি।

কিরণশংকর সেনগুপ্তের প্রেমের কবিতা 'স্বপ্ন-কামনা'র স্পষ্টবাচন 'তারা-ভরা আকাশের নীচে। স্বর্ণপাত্র হতে হে সুন্দরী ঢালো সুধা মরুপাত্রে মোর। বাহুডোরে বিদ্যুৎ-অশ্লেষা। কৃষ্ণমৃত্যু ছায়া ঘনঘোর' চিরকালের কবিতাকে মনে আনে। তাঁর 'তুমি যখন কাছে এলে উঠলো নদী জেগে। পথের যতো সোনা হলো যাদুস্পর্শ লেগে' (রূপান্তর) তাঁর তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। তাঁর 'গোপাল মুখার্জি' কবিতায় উত্তরবসন্ত এক ব্যক্তির বর্তমান জীবনের প্রেক্ষাপটে এক তীব্র হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে—এই 'গোপাল মুখার্জি' কি এই যুগ, না প্রাচীন যুগ, বক্তা গোপাল মুখার্জিকে খুঁজছে, না গোপাল মুখার্জি বক্তাকে খুঁজছে এইরকম এক তীব্রতা এতে দেখা যাচ্ছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাব্যগুণেই চিরকাল জনপ্রিয়। তাঁর রাজনৈতিক কবিতার পিছনে যে সামাজিক বোধ কাজ করে তা তাঁর যে কোন কবিতাতেই স্পষ্ট। তাঁর কথা চল্লিশের কবিদেরই কথা : আমি চাই কথাগুলোকে। পায়ের উপর দাঁড় করাতে। আমি চাই। যেন চোখ ফোটে। প্রত্যেকটি ছায়ার। স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে (আমার কাজ)।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের শব্দের তরঙ্গহিল্লোল আর ছন্দের দোলা তাঁর

কবিতায় এক নতুন আমেজ আনে। তাঁর 'এখন ভাঙন' ভাঙনেরই ভাষ্য। সমাজ তথা জীবনসচেতনতা তাঁর কবিতায় ব্যাপ্তি এনেছে।

স্মৃতিভারাতুর জীবনসচেতন আর এক কবি হলেন চিত্ত ঘোষ। তাঁর লোক-সংস্কৃতির রসে পুষ্ট কবিতার ভাষা অবশ্যই তাঁর কবিতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। খুব সহজেই তিনি বলেছেন: সাদা গাঢ় বিন্দু বিন্দু মিষ্টি উষ্ণ দুধ। কান্নার অতীত প্রান্তে। শীতের জ্যোৎস্নার দিকে হেঁটে চলে গেছে। মাঠে শুয়ে স্বপ্নের জাবর কাটে (জন্মভূমির দিকে)।

চল্লিশের অন্যতম প্রধান কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ক্ষুদ্রকায় কবিতাগুলি ছাড়াও তাঁর 'বাণুর জন্যে' কাব্যগ্রন্থে যেসব দীর্ঘ প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন নতুন করে তার আবার আস্বাদন দরকার। একদা প্রেমের কবিতাই তার স্বক্ষেত্র ছিল। তবে ছোট কবিতায় এক একটি পংক্তিতে বা একটি চিত্রকল্পে যে সারা জগত তিনি আলোকিত করতে পারেন তা অস্বীকার করা যায় না—যেমন, 'একটি যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল' 'রাত্রি আজ গভীর একাকী'। 'শিশুগুলি কেঁদে উঠলো', 'একটি নষ্ট পচা ফলের জন্য' বা 'ভিক্ষার মিছিল যায়' কবিতাগুলির নিষ্ঠুর উচ্চারণ আমাদের জীবনের অন্ধকার দিনগুলি অকপটে প্রকাশ করে দেয়। প্রেমের কবিতার রচয়িতাই ত জীবন-যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়ায় বড় সমাজসচেতন কবি হতে পারেন—যেমন জীবনানন্দ হয়েছিলেন।

অরুণকুমার সরকারের লঘু সুর ঠিক যেন চল্লিশের উচ্চকিত সুর নয়, খানিকটা আত্মমগ্ন, তাতে মনের গহনে যাওয়ার প্রকাশ রয়েছে। তাঁর সময়ের প্রভাবকে কিন্তু তিনি এড়াতে পারেন নি 'অন্য অন্ধকার' কবিতায় : এখানে মাটির দরে অন্ধকার ভাড়া পাওয়া যায়। সাবেক গলির পথে জয়ঢাক বাজছে শুনলুম। এখানে নিলাম দরে অন্ধকার ভাড়া পাওয়া যায়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় স্পষ্ট উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ব্যাপ্তির আভাস আছে, আর আছে গল্পের আমেজ। তাঁর সমাজসচেতনতা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সমাজসচেতনতা। মধ্যবিত্ত মানসের হাহাকার ফুটে উঠেছে 'অমলকান্তি' কবিতায়—'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি'। 'চতুর্থ সন্তান' কবিতার তীব্রতা অস্বীকার করা যায় না—এটি যুগের দর্পণ।

অরুণ ভট্টাচার্য নিজের একটি কবিতাতেই যেন নিজের পরিচয় রেখে গেছেন—কিছু কিছু শব্দ হাসতে জানে, হাসায় / কিছু কিছু শব্দ কাঁদতে / জানে,

কাঁদায়। কিছু কিছু শব্দ অলীক ভালোবাসায়। হঠাৎ জেগে ওঠে / শব্দগুলি ইচ্ছেমত / আকাশ থেকে আনতে পারি / হাওয়ায় এনে ভাসাতে পারি / ইচ্ছেমত। ধরণীতলে সাজাতে পারি। চল্লিশের কবিদের মধ্যে তিনিই সম্ভবত পুরোপুরি গীতিকবি হয়ে রইলেন—গীতিকবিতাই তাঁর স্বক্ষেত্র। তাঁর কবিতায় নীলকমল, স্বচ্ছজল ইত্যাদি চিত্রকল্পের ব্যবহারের মতই তাঁর শব্দব্যবহার শুচি সুন্দর। জল, মাটি, আলো, বাতাস এবং গোপন প্রেমের জগতে যেন তাঁর নিজের জগত। তাঁর 'স্থির নক্ষত্রের নীচে', 'বসন্তবাতাস' বা 'প্রেমই আলো, আলোই প্রেম'-এর মত গীতিকবিতা বাংলা কবিতার বিশিষ্ট সম্পদ।

রাম বসু তাঁর কবিতায় চল্লিশের জীবনসচেতনতাকে শব্দ ও চিত্রের তরঙ্গমালার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এদিক থেকে তিনি মঙ্গলাচরণ ও সিদ্ধেশ্বর সেনের সগোত্র—তবে তাঁর 'রক্তাক্ত বাঘিনী' কি 'যন্ত্রণা' প্রভৃতি কবিতার তীব্রতা, পুরুষালি তীব্রতা, তাঁর নিজেরই।

চল্লিশের দশকে স্বনামখ্যাত অন্যান্য কবি হলেন মণীন্দ্র রায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য, জগন্নাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ। এঁদের প্রত্যেককেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যে চেনা যায়। এঁরা ছাড়া—অশোকবিজয় রাহার তারাদের চাঁদ সম্পর্কিত কবিতার আবেদন ভোলা যায় না। গোবিন্দ চক্রবর্তীর কবিতা মুখস্থ বলতে পারতেন এমন লোক আমি দেখেছি। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছন্দ-নিরীক্ষণ তাঁর কবিতায় নতুন ডাইমেনসন সৃষ্টি করেছে। 'নাবা ফসলের' সুনীল চট্টোপাধ্যায় ও 'যখন প্রথম ধরেছে কলি'র কৃষ্ণ ধরকে হুজুগে বাংলাদেশই দূরে রাখতে পারে।

পঞ্চাশের প্রারম্ভে আমাদের প্রাবল্য ছিল 'দেশ'-এ কবিতা লেখা। (এখনকার ছেলেদেরও নিশ্চয় আছে)। তখন পয়ার ও মাত্রাবৃত্তনির্ভর ছান্দসিক কবিতা লেখারই সমধিক প্রচলন ছিল। চতুর্দশপদীর শিক্ষানবিশী করতেন অনেকে। আর ছিল নতুন সুরে প্রেমের গান। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্ব্বাশা' মাসিকে কবিতা বেরোলে গৌরবান্বিত বোধ করতেন কবি—ভট্টাচার্যমশাইয়ের শাসনে ছন্দের এদিক ওদিক হওয়ার জো ছিল না। পঞ্চাশের প্রারম্ভে 'দেশ'-এ প্রচুর কবিতা লিখেছেন বটকৃষ্ণ দে—কি মিষ্টি তার সুর, যেন বাংলার সুইনবার্ন। তা ছাড়া ছিলেন কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত তাঁর ছন্দবন্ধন ও শব্দসম্ভার নিয়ে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ঝকঝকে কবিতা ও নব্যআধ্যাত্মিকতা ত ছিলই। আলোক সরকারের শব্দচিত্র ছিল। আরো কত কবিই দেখা দিলেন ধীরে ধীরে। এ-প্রসঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বক্তব্য শোনা যেতে পারে : "পঞ্চাশের গোড়ার দিকে

(১৯৫০-৫৪) আমি কয়েকটি নূতন নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, যাঁদের কবিতা তখন 'পূর্ব্বাশা'য় ছাপা হয়েছে। তাঁরা শ্রীঅরবিন্দ গুহ, শ্রীআনন্দ বাগচী, শ্রীআলোক সরকার, শ্রীউৎপল বসু, শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত, শ্রীমানস রায়চৌধুরী, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীস্বদেশরঞ্জন দত্ত, শ্রীশোভন সোম, শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়, ছদ্মনামে শ্রীশরৎ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়,—যাঁরা এখনও কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কয়েক বছর পর 'কবিতা'-ত্রৈমাসিক ও 'কবিপত্র' থেকে এমনি আরো কয়েকটি নাম জানি। তাঁরা শ্রীপ্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ রায়। মনে পড়ে, তখন 'দেশ' পত্রিকায় এমনি শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা পড়েছি এবং একটি কবিতা-পুস্তিকা মারফৎ শ্রীসুকুমার রায়কে (কুমার রায়) জেনেছি" ('পঞ্চাশের কয়েকজন কবি', পূর্ব্বাশা, ২১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা)। আরো কত কবিই পঞ্চাশের সঙ্গে জড়িত—কবিতা সিংহ, শিবশম্ভু পাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুধেন্দু মল্লিক, দেবতোষ বসু, শিশিরকুমার দাশ, বঞ্জিত সিংহ। শঙ্খ ঘোষও ছিলেন। এই দশকে 'কৃত্তিবাস' ও 'শতভিষা' কবিতা পত্রিকার প্রকাশ নিঃসন্দেহে আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে ল্যাণ্ডমার্ক। 'কবিতা' নতুনদের স্থান দিচ্ছিল। তারাপদ রায়ের 'পূর্বমেঘ', আনন্দ বাগচীর 'সেতু' এবং আমার মাত্রই এক সংখ্যার 'উত্তরস্বাক্ষর' ছিল। সে যাই হোক, 'কৃত্তিবাস' ও 'শতভিষা'র মান বেশ খানিকটা উঁচু ছিল। এই সময়কার সমাজ-সচেতন কাগজগুলিরও কথা বলা উচিত—সেখানেও একটা সুস্থ কাব্যস্রোত বহমান ছিল, যেমন, 'কবিতাপত্র', 'অগ্রণী', 'সাহিত্যপত্র', ('পরিচয়' ত আগে থেকে ছিলই), পরে এসেছিল 'সীমান্ত'। এই সব পত্রপত্রিকাই তখনকার কবিতার প্রকাশক্ষেত্র ছিল। সেনেট কবিসম্মেলন এই সময় কবিতার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। 'উত্তরসূরি' তখন থেকেই তার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ছিল। 'কৃত্তিবাসে'র দেহবাদী স্রোত অনেককেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল, এবং তা আরও প্রবল হল ষাটের গোড়ায় আমেরিকার 'বীট' কবিদের আগমনে। ইতিমধ্যে সমাজবাদী কবি ও কবিতাও যেন চাপা পড়ে যাচ্ছিল—তরুণ সান্যাল, যুগান্তর চক্রবর্তী ছিলেন সেই সব কবিদের মধ্যে। সেই সব বিস্তারিত ইতিহাস এখানে বিবৃত না করলেও চলবে। সেই কবিতার চরিত্র সম্পর্কে সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের বক্তব্যই শোনা যাক : "বাংলা কবিতায় এই তরুণদল প্রেম ও নিসর্গ নিয়েই প্রবেশ করেছিলেন, যা খুবই স্বাভাবিক—কিন্তু যে-স্বাভাবিকতা চল্লিশের দশকে

ছিল না। এঁরা অনেকেই নাগরিক বলে আত্মকেন্দ্রিক—ফলত লিরিকের মেজাজও এঁদের রচনায় পাওয়া গেছে। যৌবনের যন্ত্রণা, অস্তিত্ববাদের নিঃসঙ্গতা, জীবনের প্রতি বিদ্রূপও যে অনুপস্থিত ছিল তা নয়। পঞ্চাশের কবিতায় অপ্রীতিকরতা আছে, যাকে যুগের অসুস্থতার বা ফ্যাশনের উদাহরণ হিসেবেই গণ্য করা যায়, ভুলেও মহৎ কবিতার অপ্রীতিকরতা মনে করা যায় না। প্রাঞ্জলতার প্রতি দৃষ্টি হয়তো কারো আছে কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক হবার গুণ কেউ অর্জন করেন নি। তাঁদের আত্মকেন্দ্রিকতা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ও ব্যক্তিত্ব-বিনাশের অধ্যায়গুলো পার হয়ে যদি একদিন নৈর্ব্যক্তিক হবার সুযোগ পায়!… ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা পঞ্চাশের দশকের অসুস্থতা। চল্লিশের দশকে অসুস্থ যূথবদ্ধতার প্রতিক্রিয়াতেই হয়তো এর জন্ম। সমাজবিজ্ঞানীরা ঠিক বলতে পারবেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে কি না। কেউ অনেকের হয়ে বলতে পারছেন না বলেই, কবির সংখ্যাও অসম্ভব বেড়ে গেছে, যাকে সুলক্ষণ বলে হয়তো মনে করা যায় না।"

এই ছিল সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মন্তব্য। তার পরেও পঞ্চাশের দুর্বার লিরিক স্রোত বহমান, এমন কি বর্তমান কালেও নবাগতদের মধ্যে পঞ্চাশের বড় প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে। এর পেছনে কয়েকটা জিনিস অবশ্যই কাজ করেছে—পঞ্চাশের কিছু কবি নানাধরণের প্রচারযন্ত্র দখল করার সুযোগ পেয়েছেন। কিছু কবি সর্বদাই যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে গেছেন। আবার কিছু ভাল কবি পিছিয়ে পড়েছেন। সে যাই হোক, পঞ্চাশের অনেকগুলি সংকলন যা ষাটের দশকে প্রকাশিত, এই দশকের নতুন কবিতাকে ধরে রেখেছে, যেমন, দিনেশ দাস সম্পাদিত 'পঁচিশজন সাম্প্রতিক কবি', শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা', শংকর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এই দশকের কবিতা', অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'কবিতার পুরুষ', দীপ্তি ত্রিপাঠী সম্পাদিত 'একালের প্রেমের কবিতা', এবং অন্যান্য কবিতার সঙ্গে অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বারো বছরের বাংলা কবিতা'। এই যুগটা নিয়ে অনন্য আলোচনা করেছেন সত্য গুহ তাঁর 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল' গ্রন্থে।

শান্তি লাহিড়ী 'সকল কবিতাই একজন কবির রচনা অথবা নামহীন পংক্তি যে কোন কবির রচনা' এই কথার প্রতিবাদ স্বরূপ পঞ্চাশের প্রতিনিধিত্বমূলক তাঁর কাব্যসংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন। তাতে সংকলিত হয়েছিল সেইসব কবিদের কবিতা যাঁদের জন্ম ১৯২৮ ও ১৯৪০ সালের মধ্যে। তাঁর বক্তব্য ছিল :

'প্রত্যেক কবির রচনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আজকের কবিতা আক্রমণে তীক্ষ্ণ, শ্লেষে-ভর্ৎসনায় তীব্র, বিদ্রোহে শক্তিমান, ভালোবাসায় উন্মাদ, আত্মবিলাপে পাগল, বন্ধুত্বে নিষ্ঠাবান। কোথাও সে কবিতা রোমান্টিক বেদনায় প্রগাঢ়, জীবন-জিজ্ঞাসায় প্রাজ্ঞ, সমাজ-চেতনায় এবং জীবনবোধে দার্শনিক, কোথাও সে রাজনৈতিক অশনিঝংকারে চমৎকৃত, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিচেতনায় উদ্দীপিত। এরই মধ্যে অসংখ্য বিরোধ, অবিশ্বাস, ব্যতিক্রম, হিংসা, ক্রোধ, বৈরাগ্য, আসক্তি, ব্যঙ্গ, উন্মাদনা, উচ্ছৃঙ্খলতা, উল্লাস, প্রশান্তি, ঔদার্য, দ্বিধা, চপলতা, ক্লান্তি, সংশয়, নৈরাশ্য, অসহিষ্ণুতা, নির্মমতা, দুঃখ—এই নিয়ে আজকের বাংলা কবিতা'।

এই ধরণের কথা শংকর চট্টোপাধ্যায়ও লিখেছিলেন তাঁর সংকলনটির ভূমিকায়: 'এমন পরস্পরবিরোধী কাব্যধর্মও বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি কখনও। এই তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ, সন্ত্রস্ত, ক্ষুধার্ত, শান্ত, ভয়ঙ্কর, মগ্ন, চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্ত, ধার্মিক ও অতৃপ্ত কবিদের সমারোহ আধুনিক কালের পৃথিবীর, তাবৎ কাব্যাদর্শকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে কেবলমাত্র কবিতার জন্য বেঁচে থাকা ও সকল সময় কবিতার মধ্যে অবস্থানের সঙ্কল্প বুঝি বা নূতন'। অহঙ্কারী শোনালেও ব্যাপারটা তাই-ই ছিল।

পঞ্চাশের ধারাই বয়ে চলেছে ষাট ও তৎপরবর্তী কবিতায়। এই পর্বেই বাংলা কবিতা গ্রন্থাগারস্বরূপ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন পঞ্চাশের স্বদেশরঞ্জন দত্ত। ষাটের অনেক কবিই রয়েছেন। আমরা কয়েকজন সম্পর্কে একটা ইম্প্রেশনই ব্যক্ত করতে পারি। পবিত্র মুখোপাধ্যায় সচেতন শিল্পী, তীব্র জীবনভাবনায় ভাবিত। কালীকৃষ্ণ গুহ-র কবিতায় আমার কেমন এক সুদূর বাঙালী ক্রিশ্চান পরিবেশের সংখ্যালঘু দুনিয়াকে মনে পড়ে। তাঁর হাত মমতার হাত! বাসুদেব দেব মাঝে মাঝে অর্ধ-দার্শনিক, এঘর থেকে ওঘর যেতেই জীবন ফুরিয়ে গেল এই মনোভাবের ইংগিত রেখেছেন। রত্নেশ্বর হাজরাকে তাঁর টেকনিকের জন্যে আমার ভাল লাগে—শব্দ বা শব্দবন্ধের পুনরুচ্চারণে, এবং ভাষার অনির্বচনীয় দিকের প্রতি ইংগিত রেখে তিনি গভীর কথা বলেছেন। সামসুল হক তাঁর তীক্ষ্ণ শব্দব্যবহারে, শ্লেষ-বিদ্রূপে জীবনের এক একদিক উন্মোচিত করেন। মণিভূষণ ভট্টাচার্য তীব্র সামাজিক-রাজনৈতিক চৈতন্যের কবিতা লিখে নিজস্ব ভূমি সৃষ্টি করেছেন। বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কিছু ভালো কবিতা পড়া গেছে। ভাষার ছটায় ও ইতিহাসচেতনায় উজ্জ্বল কবিতা লিখেছেন গীতা চট্টোপাধ্যায়

এবং ৺বৈজয়ন্তী ভট্টাচার্য।*

সাধারণভাবে আমার মনে হয় ছন্দভাঙার কাল সুরু হয় ষাটেই। যদিও পঞ্চাশে জ্যোতির্ময় দত্তই শুধুমাত্র ছন্দহীন কবিতা বা গদ্যকবিতা লিখতেন, তবু এই ষাটে এসেই পয়ার, পয়ারভাঙা এবং গদ্যচাল মিলিয়ে যে-কবিতার প্রাদুর্ভাব হল তাতে পঞ্চাশ ও তার পূর্ববর্তী কবিরা ত ভেসে গেলেন, তার প্রকাশ এই আশিতেও অব্যাহত। অনেকটাই হয়ত ইংরেজির অনুসরণ, অনেকটা নৈরাজ্য—যদিও পূর্বতন আদর্শ ত আগে থেকে সমর সেন, অরুণ মিত্রের মধ্যে ছিলই।

ষাটের দশক থেকে আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট ধারকবাহক হয়ে রয়েছেন বর্ষীয়ান কবিরা—অরুণ ভট্টাচার্যের 'উত্তরসূরি' ত আছেই, তার সঙ্গে আছে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর 'সাহিত্যচিন্তা', সুশীল রায়ের 'ধ্রুপদী', জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবি ও কবিতা', শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'একক'। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উচ্চারণ'ও প্রকাশিত হয়েছিল কয়েক সংখ্যা।

সত্তরের নতুন কবিদের অনেকের মধ্যে শম্ভু রক্ষিতের শব্দের বিপুল সম্ভার দেখবার মত—মনে হয় অর্থহীন শব্দপর্বত! সুন্দর কিন্তু ডেকাডেন্সের পরাকাষ্ঠা।

সেই সত্তরের পর আশির পদসঞ্চার দেখা গেল। এসময় তিরিশশেষের অরুণ মিত্র সক্রিয় আছেন, যেমন আছেন চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর দশকের কবিরা। সাপ্তাহিক 'দেশ' নতুন করে সৎ কবিতার ধারক হয়েছে। 'উত্তরসূরি'তে মফঃস্বল বাংলার পত্রিকা থেকে উৎকলিত কবিতাসমূহ সবিশেষ আকর্ষণীয়। 'কৃত্তিবাস', 'শতভিষা', ছাড়া অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন রয়েছে।

এখন আমাদের সামাজিক জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে কবিতার ক্ষেত্রেও। সমাজজীবনে যেমন নৈরাজ্য, হাহাকার, কবিতার প্রকরণ-পদ্ধতিতে তেমনি ছন্দহীনতার বাঁধভাঙা প্রচলন দেখা যায়, শব্দ যে সামাজিক সম্পদ একথা ভুলে গিয়ে অনেক তরুণ শব্দাপ্লুত ডেকাডেন্ট কবিতার চর্চা করেন। তবে কয়েক বছর আগে যে জিনিস সুরু হয়েছে তার গতি অব্যাহত—এখন মফঃস্বলে কলেজ ইত্যাদিতে বহু অধ্যাপক ছড়িয়ে পড়ায় এবং মধ্যবিত্তের শিক্ষার ক্রমোন্নতি হওয়ায় অনেক ভাল ভাল পত্রপত্রিকা মফঃস্বল বাংলা থেকে বেরোচ্ছে (যেমন, বালুরঘাটের 'মধুপর্ণী')।

* ষাটের কবিদের এক দীর্ঘ তালিকা ছাপা হয়েছে 'সৈনিকের ডায়েরী' ৯ বর্ষ, ৯৪ নং, মার্চ, ১৯৮৩ সংখ্যায়।

রাজনীতির ছায়াপাতও ঘটেছে হাল আমলের বাংলা কবিতায়। অনেকে রাজনীতিসচেতন কবিতাকে পোস্টারধর্মী বিবেচনা করলেও, সেই সব কবিতার অনেকটাই ফাঁকা ফাঁপা বিশুদ্ধ কবিতার চেয়ে উৎকর্ষতায় ম্লান নয়। অনেক বর্ষীয়ান লেখকও (তারাপদ লাহিড়ী) রাজনীতিসচেতন ছড়া লিখেছেন। সত্তর দশকের জেলবন্দী কবিদের কয়েকটি সংকলনও বেরিয়েছে। মোট কথা, গত দুই দশকে নতুনভাবে অনেক পত্রপত্রিকা বেরিয়েছে এবং তাতে নতুন সুরের—যথা প্রতিবাদের, প্রতিরোধের—কবিতার প্রকাশ দেখা গেছে।

বাংলা কবিতা তার বহমান ধারার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। নতুন যুগের চলচ্চিত্র ও নব্যনাট্য আন্দোলনের মত কবিতার আন্দোলন কখনো সোচ্চার কখনো নিরুচ্চার হয়ে নিয়ত সচল।

দুই দেশে দুই কবি : মধুসূদন, বদল্যার

ইংরেজের বদলে যদি ফরাসী অধিকার হত এদেশে এবং সেই সঙ্গে ফরাসী শিক্ষার প্রসার, তা হলে মাইকেল মধুসূদন বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের চেহারা বদলে দিতে পারতেন। তা হয় নি। তাঁর সম্মুখে ছিল স্বদেশে ভারতচন্দ্র, এবং বিদেশে অর্থাৎ ইংলণ্ডে মহান রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের কবিরা। তিনি সচেতন ছিলেন স্বদেশে 'early defective education'-এর, তবু তাঁর উদ্দাম প্রাণবেগ ব্যয় করেছিলেন অনাবশ্যক বহু বিদেশী ভাষা ও ক্লাসিকস পড়ে। মিলটন তাঁর আদর্শ হলেও, তিনি অন্যান্য ভাষার ক্লাসিকসের প্রতি হয়ত বড় বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর এই অনুরাগ সম্ভব হয়েছিল বোধ করি তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম কবি বলেই। বাংলা কবিতার রীতিমত ঐতিহ্য থাকলে কিংবা ভিক্টর হুগো যেমন বদল্যারের আগে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর আগে জন্মগ্রহণ করলে, তিনি যে প্রকৃতই বদল্যারের মত আধুনিক কবি হতেন এমন অনুমান করা চলে, যদিও এই অনুমান একটি তৃষিত ইচ্ছারই নামান্তর।

এসব কথাই মনে পড়ে যায় যখন দেখি এই দুজন কবিই—বদল্যার ও মধুসূদন—সমসাময়িক, তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও একই ধরণের ব্যথাবেদনায় পূর্ণ ; এবং বদল্যার নাকি কলকাতায় এসেছিলেন (অনেকে বলেন মরিশাসে কমাস কাটিয়েই ফিরে যান), মধুসূদন গিয়েছিলেন ফ্রান্সে, ছিলেন ভের্সাইয়ে। আমরা জানি দুজনেই প্রেমিক পুরুষ ছিলেন —এবং দুজনেই নিজের টাকা থাকা সত্ত্বেও কি দারুণ অর্থকষ্টে ভুগেছিলেন— বদল্যার আঁসেলের অভিভাবকত্বের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজের পৈত্রিক টাকা ভোগ করতে পারেন নি, মধুসূদনও তাঁর পত্তনিদার ইত্যাদির অসাধুতায় সুদূর ভের্সাইয়ে বসে দেশ থেকে টাকা না পেয়ে দারুণ অসুবিধায় পড়েছিলেন। অবাক লাগে—অর্থকষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান ইত্যাদি ভাষা শিখে যাচ্ছেন, এমন কি ভিক্টর হুগোর সঙ্গে আলাপ করে তাঁরই উদ্দেশে একটি চতুর্দশপদী লিখেছেন—তখন তিনি বদল্যার সম্বন্ধে নীরব। অথচ মনে হয় তিনি খুব ভাল ফরাসী জানতেন—লিখতে, পড়তে, বলতে

পারতেন, এমন কি এক মহিলাকে একটি ফরাসী কবিতাও লিখে পাঠান। বাংলাদেশে তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত মহাকাব্যকার হয়ে গেছেন—এবং ১৮৬৩-৬৫-র মধ্যবর্তী সময়ে ফ্রান্সে অবস্থান কালে চতুর্দশপদীগুলি রচনা করেছেন। তিনি সেখানে যাওয়ার আগে ১৮৫৭ সালে *Les Fleurs du Mal* ও *Madame Bovary* প্রকাশিত হয়েছে ; ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে মালার্মে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

এইসব বিস্ময়কর বইগুলি প্রকাশিত হলেও মাইকেলের কোন চিঠিতেই এদের কোন উল্লেখ নেই। মাইকেলের দোষ দেওয়া হয়ত অন্যায়ই হবে কারণ বদল্যারের আধুনিকতার উপর পুরোপুরি নজর পড়েছে বিশ শতকেই, যদিও সে যুগেই ফ্রান্সে তাঁর শিষ্য ছিল, এবং পরে ইয়েটস তাঁর সম্পর্কে খোঁজ রাখতেন। মাইকেলের পক্ষে এমন ঘটনা ঘটেছে বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ছিল না বলেই ! তাঁর চোখের সামনে ছিল সেই রোমান্টিক মহান কবিদের আদর্শ (—হ্যুগো, টেনিসনের উদ্দেশে তিনি চতুর্দশপদী লিখেছিলেন) ; এবং স্বদেশী সাহিত্যের ঐতিহ্যে আস্থা না থাকায় ঐতিহ্য সৃষ্টির জন্যেই তিনি হয়ত বিভিন্ন দেশের ভাষা শিখে সেই সেই দেশের ক্লাসিকসের প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। কিংবা হয়ত একবার মহাকাব্য লিখে সাফল্য অর্জন করে তিনি তাবৎ মহাকাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। মহাকাব্য লিখলেও তাঁর সৃষ্টিমূলে ছিল রোমান্টিকতা যা সেই যুগেরই দান, তার পরিচয় তাঁর অন্যান্য রচনায়, তাঁর জীবনে, তাঁর ব্যথায় বেদনায়। তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টির সঙ্গে ক্লাসিক সংযম মিশ্রিত ছিল, এবং তাঁর রোমান্টিকতা পরিশুদ্ধ নির্ভার হলে তিনি যে বদল্যারের মত আধুনিক হতে পারতেন না তা কে বলতে পারে ! বাধা হিসেবে হয়ত দাঁড়িয়েছিল ঐতিহ্যাভাব, শিক্ষার দোষ এবং আধুনিক সাহিত্যজগতে প্রথম প্রবেশের জন্যে সৃষ্টির বেদনায় মানসিক চঞ্চলতা।

ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী সংস্কৃতির সেই আদি যুগে তিনি যে আদি রোমান্টিকদের ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন তা নীচের উক্তিগুলি থেকে বোঝা যাবে :

১. ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভাবতী সতী প্রদানেন তারে।

(কবিবর ভিকতর হ্যুগো)

২. মনের উদ্যান-মাঝে কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন !—দয়া করি নরে,

কবি-মুখ-ব্রহ্ম—লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নব-নগরে। (কবিতা)

৩. সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ,
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ,
মরুভূমে তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে ! (কবি)

৪. লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয় সখি, এই ভিক্ষা করি ,
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর ভিতরি ! (কল্পনা)

৫. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration !

(রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাংশ)

৬. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew.

(ঐ)

৭. Of course I am still romantic, for that you know is my nature ; for I am a bit of a poet, and a superabundance of the imaginative faculty makes a fellow rather a poor 'man of the world.'

(গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্রাংশ)

তাঁর কাব্যধারণা আদি রোমান্টিকদের মতই। কবির কল্পনা থাকবে সেখানে, কবি ভবিষ্যদ্বক্তা, ইত্যাদি।

অপর দিকে বদল্যার তাঁর 'লে ফ্লর দ্যু মাল' (নষ্ট কুসুম) গ্রন্থ সম্পর্কে

বলেছেন, "In this dreadful book I have put all my heart, all my tenderness, all my religion (disguised),. all my hatred. It is true that I shall write the contrary, that I shall swear by the great gods that it is a work of pure art."

সৌন্দর্য সম্পর্কে বদল্যারের ধারণা : It is something passionate and sad, something a little vague, leaving room for conjecture.—Mystery and regret are also characteristics of the Beautiful.

কবি সম্পর্কে মধুসূদনের এই উদার চিন্তা ছিল না, এবং সৌন্দর্য যে বিষণ্ণ তাতেই মধুর এমন কথাও তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। কারণ বদল্যারের মত বিরাট কাব্যিক ঐতিহ্য তিনি পান নি। দুজনের মধ্যে প্রকরণগত ক্লাসিক-রোমান্টিকের সংশ্লেষ ও মুক্তি—ছন্দবদ্ধ চতুর্দশপদীতে কিংবা মহাকাব্যের গঠন-পারিপাট্যে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে—দুজনকেই অনেক নিকট করেছিল, কিন্তু কাব্যের ধারণাতেই ছিল মূল প্রভেদ। যুগের হাওয়ায় লালিত হয়ে মধুসূদন আদি রোমান্টিকদের কাব্যাদর্শ—অর্থাৎ কবিরা মহান ইত্যাদি ধারণা—বেছে নিয়েছিলেন, সমসাময়িক বদল্যারকে চিনতে পারেন নি, কিংবা তাঁর কাব্যাদর্শ সম্পর্কে সচেতনও ছিলেন না। ক্লাসিক দার্ঢ্যের শিক্ষায় মধুসূদনের কাব্যে বদল্যারের মতই ভাবপ্রবণতার রেশ ছিল না যার ফলে আধুনিক কাব্যাদর্শের প্রতি সচেতন থাকলে তিনি অনায়াসেই কাব্যের ইতিহাসে প্রবলতর বিপ্লব ঘটাতে পারতেন। ঐতিহ্যসৃষ্টির জন্যে ক্লাসিকস সম্পর্কে তাঁর চিন্তার ভার ত ছিলই, তার সঙ্গে হয়ত মিশেছিল এ পোড়া ও গৌড়াদেশের সমসাময়িক কালের আত্মবিশ্লেষণের তথা সত্যভাষণের ভয়।

দুই মহান কবি একই সময়ে এক দেশে (ফ্রান্সে) কিছু কালের জন্যে বাস করলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন। প্রসঙ্গত, মধুসূদন হয়ে রইলেন 'মেঘনাদবধকাব্যে'র ঐতিহ্যবিহীন (অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছাড়া) একক স্রষ্টা, আর বদল্যার তাঁর আত্মবিশ্লেষণের গভীরতায় আধুনিক কবিতার জনয়িতা। মধুসূদন যা হয়েছিলেন তা ছাড়া আর কিছু তাঁর পক্ষে বোধ হয় হওয়া সম্ভব ছিল না। কাব্যের ইতিহাসে সব কটি চেতনার ধাপই পেরোতে হয়, মধুসূদন তেমনই এক ধাপ—তাঁর পক্ষে পরিপ্রেক্ষিতহীন অবস্থায় অনেকগুলি ধাপ লাফিয়ে যাওয়া হয়ত সম্ভব ছিল না।

দুই কবির পত্রাবলী

পশ্চাদপট

বিলেত যাওয়াব আকর্ষণ স্বাধীনতার পরেও যখন কমে নি, তখন একশো বছর আগে যদি সে-আকর্ষণ প্রবল থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমাদের ভাবতে ভাল লাগে বাংলার দুই মহান-কবি—একজন যৌবনোত্তীর্ণকালে, অপরজন যৌবনারম্ভে—মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সেকালের এবং একালেরও ভ্রমণতীর্থ ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। মধুসূদনের সে ছিল শৈশব বাসনা, তার জন্যে পরবর্তী জীবনে তিনি ধর্ম পরিবর্তন পর্যন্ত করেছিলেন। সাহেব হওয়ার মোহে, ব্যারিস্টার হওয়ার তাড়নায় কি ভীষণ কষ্টই না করতে হয়েছিল তাঁকে! বিদেশ পৌছোনোর মুখে সেই তীব্রতার সঙ্গে তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছিলেন (১১. ৭. ১৮৬২) :...I assure you, I can scarcely believe that I am every minute nearing that land of which I have thought so much even from my boyhood. তিনি নিজেই গৌরদাসকে তাঁর ছেলেকে সৎ শিক্ষা ও প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় সাফল্যের জন্যে পাঠাতে লিখেছেন; তাঁর বক্তব্যই ছিল কম বয়সে না এলে আদবকায়দা ঠিকমত শেখা যায় না। বিদ্যাসাগরকেও তাই তিনি লিখেছেন :...we ought to send to Europe, not grown up young, but young lads of 12 or 14. A preliminary English education is absolutely necessary (১৮. ৮. ১৮৬৪)। রবীন্দ্রনাথকে ঠিক যেন মধুসূদনের কথামতই বিলেত যেতে হয়েছিল কম বয়সে। মধুসূদন ইংলণ্ড গিয়েছিলেন ১৮৬২ সালে, আর রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালে। যাত্রাকালে মধুসূদনের বয়স ছিল উনচল্লিশ, আর রবীন্দ্রনাথের সতেরো। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে (২৮. ৪. ১৮৬৫) লিখেছিলেন : I do not care if I lose everything I have and begin life like what I once was; a poor, penniless beggar, provided I can get myself called to the Bar. মধুসূদন দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যেও তাঁর উদ্দেশ্য সফল করে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ? তাঁর নিজের কথায়: 'বিলেতে গেলেম,

ব্যারিস্টার হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি। নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।' (ছেলেবেলা) 'ব্যারিস্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন শুরু করিয়াছিলাম, এমন সময় পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনাইলেন। আমার কৃতিত্বলাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সঙ্গে আরও একজন আত্মীয় ছিলেন। ব্যারিস্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করিয়া ছিলেন যে, বিলাত পর্যন্ত পৌঁছিতেও হইল না। বিশেষ কারণে মাদ্রাজের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল।—লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই তাড়া খাইয়া আসিয়াছি। আশা করি, বার-লাইব্রেরির ভূভাব বৃদ্ধি না করাতে আইনদেবতা আমাকে সদয় চক্ষে দেখিবেন। পিতা তখন মসুরি পাহাড়ে ছিলেন। বড়ো ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না; ববং মনে হইল, তিনি খুশি হইয়াছেন। নিশ্চয় তিনি মনে করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে এবং এই মঙ্গল ঈশ্বর-আশীর্বাদেই ঘটিয়াছে।' (জীবনস্মৃতি) দুই কবিব একই উদ্দেশ্যে বিলেত যাওয়া চমকপ্রদ যোগাযোগ বলে মনে হলেও আমাদেব কাছে অন্য কারণে তা তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সময়ে রচিত এঁদের পত্রাবলী বাংলার আধুনিক কালের প্রথম পত্রসাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে। মধুসূদনেব পত্রাবলী অবশ্য ইংরেজিতে, কিন্তু তাতে এক বিক্ষুব্ধ প্রতিভার পরিচয় পাই বলে তা আকর্ষণীয়।

মধুসূদন

মধুসূদন ১৮৬২ সালের জুলাইয়ের শেষ দিকে ইংলণ্ডে যান, আর সেখান থেকে ভাবত অভিমুখে ফেরৎ-যাত্রা করেন ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারি। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় বহু চিঠি লিখেছিলেন প্রধানত বিদ্যাসাগর ও গৌরদাস বসাককে। তাঁর চরিত্রের মত তাঁর পত্রাবলীও উচ্ছ্বাসে ভরা, তবে তার মধ্যেও তাঁর অনমনীয় মনোবল এবং সংকল্পের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি অনেকগুলি বিদেশী ভাষা শিখে সেই ভাষায় মূল কাব্যপাঠের আনন্দ উপলব্ধি করেছেন। ইউরোপীয় সমাজের

আকর্ষণীয় শিষ্টতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এই সময়েই তিনি চতুর্দশপদী কবিতাবলী লিখে দেশে পাঠিয়েছেন এবং তা প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে বিদেশী ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর সাহিত্যচিন্তা প্রকাশিত হয়েছে, মাতৃভাষাই যে সাহিত্যচর্চার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন সেকথাও তিনি বলেছেন।

গৌরদাসকে তিনি একদিকে ইউরোপের প্রকৃতিবর্ণনা শোনাচ্ছেন, অন্যদিকে নিজের সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিচ্ছেন। যেমন,

১. This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race.···I have not been doing much in the poetical line of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away and I do not know if it will ever come back again. You know I write by fits and starts. (২৬. ১০. ১৮৬৪)

২. Of course, I am still romantic, for that you know is my nature ; for I am a bit of a Poet and a superabundance of the imaginative faculty, makes a fellow rather a poor "Man of the world." (২৬. ১. ৬৫)

৩. I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good, in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe ; but when we speak to the world, let us speak in our own language.···I should scorn the pretensions of that man to be called 'educated' who is not master of his own language. (২৬. ১. ৬৫)

বিদ্যাসাগরকে মধুসূদন যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন তার মূল বিষয় যেন দুই

প্রতিভার সাক্ষাৎকার—এক দিকে মধুসূদন, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর। মধুসূদনের নিদারুণ অর্থকষ্ট, তাঁর বিশ্বাসভাজন লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর ভাষাচর্চা ইত্যাদির কথা যেমন ফুটে উঠেছে এই পত্রাবলীতে, তেমনি বিদ্যাসাগর নামক সেই হৃদয়বান ব্যক্তিত্বের এখানে নীরব উপস্থিতিও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। বিদ্যাসাগর যে কত কষ্ট করে অর্থ সংগ্রহ করে মধুসূদনকে পাঠাতেন তার কথা আমরা জানতে পারি এই পত্রাবলী পাঠ করে। বিদ্যাসাগরকে আমরা চিনতে পারি মধুসূদনের উক্তিতে :

১. ...the man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengalee mother! ···I think I may now safely say that my troubles are at an end for the future, since I am in your hands. (বিদ্যাসাগরকে চিঠি, ২. ৯. ১৮৬৪)

২. I scarcely know how to thank you for your kind help in undertaking to look after my affairs and to see that I am not again left to the mercy of winds and waves in this distant part of the globe. (ঐ, ১৮. ৯. ৬৪)

৩. I know how wise, thoughtful and kind and considerate you are ; and how precious your time is. (ঐ, ২. ১২. ৪)

৪. —How ready I am to place my fortune, my prospects in life, the interest of those most dear to me in this world, nay, my life itself in your hands. (ঐ, ১৮. ১২. ৬৪)

৫. I was romantic enough to believe that no Bengali could possibly have any doubts as to the fairness of transaction in which you happened to be concerned. (ঐ, ২৬. ৪. ৬৫)

৬. But for my confidence in your wisdom, strength of mind and noble and disinterested friendship, I fancy, I should go mad! I need scarcely assure you that my trust is in God and after God in you! (ঐ, ২৫. ১. ৬৬)

৭. I tell my wife that when I get back to Calcutta, you

will give me a little room in your house and a lot of rice to keep body and soul together! (ঐ, ১৮. ৬. ৬৬)

বিদ্যাসাগরের মহানুভবতা সম্পর্কে মধুসূদন যে কতখানি সচেতন ছিলেন তা এই পত্রাবলীতে সুস্পষ্ট।

কিছু কিছু চিঠিতে নিসর্গ-বর্ণনা আছে, ওদেশে নতুন কিছু দেখে স্বভাবতই মধুসূদনের মনে আনন্দ জেগেছিল, যেমন,

'A few days ago, it snowed the whole night and the sight was splendid in the morning. Streets, house tops, gardens were all covered over with snow.···Our "দুগ্ধসাগর" had overflowed its shores and inundated the country'. (বিদ্যাসাগরকে, ৯. ১. ৬৫)

কিন্তু এরকম বর্ণনাত্মক চিঠি খুবই কম। সব সময়ে তিনি অর্থকষ্টের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছেন, হয়ত সেই কষ্টের জন্যে এবং অনন্যচিত্তে বিদেশী ভাষা শিক্ষা, মাঝখানে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা ও ব্যারিস্টারি পরীক্ষার চিন্তা করায় তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক খুঁটিয়ে বিবৃত করতে পারেন নি। মাঝে মাঝে একটি দুটি চরিত্র, বিদেশীর আতিথেয়তা ইত্যাদির কথা লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ

মধুসূদনের পত্রাবলীর ভাষা ইংরেজি, সেকারণে বাংলাসাহিত্যে পত্র-সাহিত্যের মর্যাদা রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'গুলিরই প্রাপ্য। চলতি বাংলার এমন সাবলীল ব্যবহার এই প্রথম—সহজ, ঝরঝরে বাংলা; মধুসূদনের মত উচ্ছ্বাস নেই, শান্ত, সমাহিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত ভ্রমণ-কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই: "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখি এক-প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর-এক-প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়" (ভূমিকা, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র)। এই চিঠিগুলিতে লণ্ডনের বর্ণনা আছে, আর আছে নারী-স্বাধীনতাব কথা, ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রতি তীব্র শ্লেষ। যেমন,

"প্রাণীবৃত্তান্তের সূচিপত্রে ইঙ্গবঙ্গ-নামক এক অদ্ভুত নতুন জীবের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়—তাদের ক'টা ক্ষুর ক' পাটি দাঁত ও সিংহচর্ম তাদের গায়ে

ঢিলে হয় কি কথা হয় তার বিস্তারিত বিবরণ-সমেত একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখবার বাসনা আছে, সকলে অবধান করো। 'এই বেড়াল বনে গেলেই বন-বেড়াল হয়'।" (পঞ্চম পত্র)

কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতি সেই দ্বাদশ পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গির পরিচয় দেয় : 'মনের ভিতর হাজারটা কথা চলাফেরা করে বেড়ায়, কিন্তু কথাগুলো হাত ধরাধরি করে আসে না, পরস্পরের মধ্যে চেনাশুনো নেই, খাপছাড়া দলছাড়া কথাগুলো মনের বড়ো রাস্তা দিয়ে খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে, কিন্তু পথিকদের মতো কেউ কারও কোনো এলাকা রাখে না। এমন ভাঙাচোরা কথার জোড়াতাড়া চিঠি পড়তে কি তোমাদের ভালো লাগছে?'

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পরবর্তীকালে এই পত্রাবলী সম্পর্কে একদিকে যেমন বলেছেন : 'চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে।'—অন্যদিকে তেমনি বলেছেন : 'এ বইটাকে সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিতে আমি বসাতে চাই, ইতিহাসের পঙ্‌ক্তিতে নয়। পাঠ্য জিনিসেরই মূল্য সাহিত্যে, অপাঠ্য জিনিসেরও মূল্য ইতিহাসে।' কিংবা, '…লেখার জঞ্জলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল—এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিসটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করেনি।' (চারুচন্দ্র দত্তের উদ্দেশে লিখিত, ২৯.৮.১৯৩৬)।

মধুসূদনের মধ্যে আমরা প্রাথমিক যুগের উচ্ছ্বাস দেখেছি, তখন বিদেশী জ্ঞান অর্জনের তীব্রতা তাঁর মনে, বিদেশের মোহে আচ্ছন্ন তিনি ; রবীন্দ্রনাথ সেযুগ পেরিয়ে গেছেন, তিনি স্থিতধী তখন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের আভাস তাঁর মধ্যে সূচিত হয়েছে। দুই কবির পত্রাবলী বাঙালি মনের দুই যুগের প্রতিচ্ছবি বলে চিনে নেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ, র‍্যাঁবো, চ্যাটার্টন : কৈশোরক কবিতা

কৈশোরক কবিতার ধ্রুপদী যে দুটি দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে তা অন্যায়ভাবে জাল বলে পরিগণিত, যদিচ সেই কবিতার মধ্যে কিশোর কবির শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ মেলে, এবং কোন কোন কিশোর যে তাঁর তেরো-উনিশের মধ্যবর্তী সময়ে কাব্যে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করতে পারেন তা অন্তত একজন কবির কবিতায় দেখা যায় যার কবিতা জাল বলে গণ্য না হলেও যিনি উনিশ বছরেই কবিতার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেন। প্রথম দুজন রবীন্দ্রনাথ ও চ্যাটার্টন, শেষজন র‍্যাঁবো। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কৈশোরক কবিতাতেই তাঁর কবিকর্ম শেষ করেন নি, কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালের বক্তব্য পড়লে দেখা যাবে তিনি তাঁর সেই সব রচনাগুলি সম্পর্কে সুবিচার করেন নি। চ্যাটার্টন দুঃখে দারিদ্র্যে আত্মহত্যা করেন, আর র‍্যাঁবো চলে যান আফ্রিকায় ও দূরপ্রাচ্যে নানা ব্যবসার পসরা সাজাতে। এঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু সেই কিশোর বয়সেই কাব্যভাবনায় বিচলিত, কবি যে ঈশ্বরের মহান সৃষ্টি এমন চিন্তায় আচ্ছন্ন, জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী, কাব্যপ্রকরণে সম্ভাবনাময়—রবীন্দ্রনাথ ও চ্যাটার্টন ত পুরনো প্রকরণে কাব্যসৃষ্টি করে অন্যকে বিভ্রান্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই বয়সের ও অপর দুজনের সমগ্র সৃষ্টি আলাদাভাবে বিচার করলে বিস্ময়কর অনেক কিছুই দেখা যাবে।

এক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিশোরকালে যে কটি বই লিখেছেন—সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে কিছু কম নয়—তার মধ্যে দুটি বই 'কবিকাহিনী' ও 'ভানুসিংহের পদাবলী' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে বই বলতে কবিতার রচনাকালকেই বোঝাতে চাই—অন্তত 'ভানুসিংহের পদাবলী' সম্পর্কে। বইটির প্রকাশকাল রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে, কিন্তু এর অনেক কবিতারই রচনাকাল উনিশ বছরের মধ্যেই। 'কবিকাহিনী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন : 'যে-বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুট ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য

ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে—লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যে রূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ, কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য'—(জীবনস্মৃতি, ভারতী)।

টমসন এই কাব্য সম্পর্কে বলেছেন :...'It was his Endymion or Alastor...The shadowy world of a poet's inner adventures, of his loneliness, of his vast, vague, universal benevolence of love,—this spacious world held him in thrall—'

আজ যখন আমরা এই কাব্যটি পড়ি, তখন এক কিশোরের পক্ষে সেকালের পটভূমিকায় এটিকে এক আশ্চর্য সৃষ্টি বলেই মনে হয়। 'অপরিস্ফুটতার ছায়া-মূর্তি' কিংবা 'shadowy world' এই কথাগুলি গুণবাচক মনে হয়। 'কবিকাহিনী' পড়লে মনে হয় আমরা কোন আশ্চর্য সিম্বলিক কাব্য পড়ছি। এক কবির মানসপরিক্রমার কাহিনী বলা হয়েছে এতে যার মধ্যে আমরা কোন অগভীরতা কিংবা শিথিলপ্রযত্ন খুঁজে পাই না। এর বক্তব্যে সে-যুগের রোমান্টিক আদর্শই ফুটে উঠেছে :

১. স্বাধীন বিহঙ্গ-সম কবিদের তরে দেবি
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
২. একদিন বালিকারে কবি সে কহিল গিয়া
"নলিনি! চলিনু আমি ভ্রমিতে পৃথিবী।
আর একবার বালা কাশ্মীরের বনে বনে
যাই গো শুনিতে আমি পাখীর কবিতা!
রুসিয়ার হিমক্ষেত্রে আফ্রিকার মরুভূমে
আর একবার আমি করি গে ভ্রমণ!..."

৩. শুনিয়াছিলাম কোন্ উদাসী যোগীর কাছে
'মানুষের মন চায় মানুষেরি মন ;
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল,
তটিনীর কলধ্বনি, নির্ঝরের ঝর্ ঝর্,
আরণ্য বিহঙ্গদের স্বাধীন সঙ্গীত,
পারে না পূরিতে তারা বিশাল মনুষ্য-হৃদি—
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।'

৪. স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খলরাশি দিবে গো ভাঙ্গিয়া,
না, তার স্বাধীন হস্ত হোয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।

কত আশ্চর্য লাগে যখন এলিয়টের কবিতার মত এই আধুনিক পংক্তিগুলি পড়ি :

ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্ত্তমান,
বর্ত্তমান মিশিতেছে অতীতসমুদ্রে।

কবিতা যে ভাব-গভীর ভাষা তা তাঁর শব্দগত পৌনঃপুনিকতায় প্রকাশমান :

১. সে দিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সে দিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সে দিকে বসন্তলক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া।
কি হাসি হাসিতে জানে পূর্ণিমাশর্বরী—
সে হাসি দেখিয়া হাসে গম্ভীর পর্বত,
সে হাসি দেখিয়া হেসে উথাল জলধি,
সে হাসি দেখিয়া হাসে দরিদ্র কুটির।

২. এইরূপ মাঝে মাঝে অশ্রুজলে অশ্রুজলে
নীরবে গাইত তারা প্রণয়ের গীত।

৩. শুধু সে কবির গান কত যে লাগিত ভাল,
শুনে শুনে শুনা তার ফুরাত না আর।

শুধু সে কবির নেত্র কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি
বিকিরিত, তাই হেরি হইত বিহ্বল।
শুধু সে কবির কোলে ঘুমাতে বাসিত ভাল,
কবি তার চুল লয়ে করিত কি খেলা।
শুধু সে কবিরে বালা শুনাতে বাসিত ভাল
কত কি—কত কি কথা অর্থ নাই যার,...

ছন্দের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের ধারণা সেই কৈশোরেই কত স্পষ্ট ছিল তা পয়ারের প্রথম আট মাত্রাব বৈচিত্র্যময় বিন্যাসেই দেখা যাবে। তিন। তিন। দুই মাত্রার প্রচলিত বিন্যাসকে তিনি ইচ্ছেমত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছেন :

১. সহসা সমীরণের পাইয়া পরশ
২. অনন্ত-তারা-খচিত নিশীথগগনে
৩. বিচিত্র বেশভূষায় করেছ সজ্জিত
৪. সারারাত নিদ্রার করিনু আরাধনা

বিস্ময়করভাবে বারো মাত্রার পদবিন্যাসেও তিনি কত আধুনিক :

হা নিষ্ঠুর কাল, তোর এ কিরূপ খেলা
সত্যের মতন গড়িলি প্রতিমা,...

চিত্রকল্পের কথা বাদ দিলাম, চলিত শব্দ ব্যবহারেও (colloquialism) তাঁকে খুব আধুনিক মনে হয় :

১. নীরবতা ঝাঁ ঝাঁ কবি গাইছে কি গান
২. নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গেচুরে যায় মন,
৩. পৃথিবী আমার কষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক,

শেক্সপীয়রের টেম্পেস্টের বিপরীত মেরুতে কিংবা বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে একই মেরুতে অবস্থিত বলে মনে হয় এই কাব্যকে যখন এই পংক্তিগুলি মধুর 'irony'-র মত কানে বাজে :

ক্রমে কবি যৌবনের ছাড়াইয়া সীমা,
গম্ভীর বার্ধক্যে আসি হোলো উপনীত।
সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তাঁর
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে!
মনে হোত দেখিলে সে গম্ভীর

হিমাদ্রি হোতেও বুঝি সমুচ্চ মহান !
নেত্র তাঁর বিকিম্বিত কি স্বর্গীয় জ্যোতি,
যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।

'কবিকাহিনী'র মত কিংবা তার চেয়েও সার্থকতর রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র কবিতাগুচ্ছ। প্রমথনাথ বিশী বোধ করি ঠিকই বলেছেন : "নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি যদি কাব্যের লক্ষ্য হয় তবে 'ভানুসিংহের পদাবলী' উচ্চাঙ্গের কাব্য। ...কিশোর রবীন্দ্রনাথকে চণ্ডীদাসের পরিণত শিল্প আকর্ষণ না করিয়া যে বিদ্যাপতির অলংকারময়ী পদাবলী আকর্ষণ করিবে—ইহা খুবই স্বাভাবিক। ...শিল্পাঙ্গে ভানুসিংহের মধ্যে আদৌ মেকি নাই।"

রূপের জগতের জন্যেই ভানুসিংহ আকর্ষণীয়। এর শিল্পপ্রকরণের সাফল্য এর নকলনবিশীর অপবাদ খণ্ডন করে। চ্যাটার্টনের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব যেমন জালিয়াতি কিংবা নেহাৎ প্রতিলিপিকার ইত্যাদি আখ্যার তলায় চাপা পড়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'রও তেমনি নকল কবিতা, বিভ্রান্তিকর ইত্যাদি আখ্যার জন্যে ভালমত কদর হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এর খুব কদর করেন নি। এর সূচনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন : "ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরাজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না, বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না এবং জানিলে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। (রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়ত ভুল ছিল; ইংরেজি কবি ও সমালোচকেরা চ্যাটার্টনের কাব্যগুণ সম্পর্কে সাধুবাদ উচ্চারণ করে গেছেন—সেকথা পরে আলোচ্য-শ.)। কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলো বছর বয়সে (ষোলো নয়, সতেরো বছর ন মাস-শ.) এই হতভাগ্য বালক-কবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।...

"ভানুসিংহ যিনিই হউন, তাঁহার লেখা যদি বর্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।

উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে··· ।" (জীবনস্মৃতি, 'ভানুসিংহের কবিতা')

একথা ত ঠিকই যে লোকশিল্প যেমন নতুন করে সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি এক যুগের শিল্প নতুন করে অবিকলভাবে আর একযুগে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। পারিপার্শ্বিক পবিবর্তনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের ভাব রবীন্দ্রনাথের মতই, তাতে আমরা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের ভাব আশা কিংবা দাবি করি না। সমস্ত শিল্পই যেমন কৃত্রিম, কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট না হলে শিল্পই হতে পারে না, তেমনি এই কৃত্রিম শিল্পসৃষ্টির মধ্যে আমরা কিশোর রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সাফল্য দেখতে পাই—ভাষায়, চিত্রকল্পে, ছন্দে ও মিষ্টি এক সুরে। এই পদগুলির ভাষা ও সুর মাধুর্যমণ্ডিত :

১. গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।

২. শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ যামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,
থরহর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
বরখত নীরদপুঞ্জ।

৩. মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান।

ছন্দের মধ্যে মাত্রাবৃত্তে নয় মাত্রার ব্যবহার হয়ত রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই কবিতাগুলিতেই করেছেন :

১. বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
বিজুলী চমকন ঘোর,...

২. হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে
কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গেল রয়নী
নহি নহি আওল কালা।

৩. মরমকুঞ্জ'পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল।

রবীন্দ্রনাথ 'একে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য' করেছেন (সূচনা, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী')। অনধিকার কি অধিকাবসম্মত সে-বিচারের কি দরকার, আমার মনে হয় এই কবিতাগুচ্ছ নিজের দাবিতেই শিল্পপদবাচ্য। 'ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান নয়' (সূচনা, ঐ)—একথা রবীন্দ্রনাথ বলে গেলেও এর যে কোন কবিতাতেই আমরা শিল্পগত সাফল্য লক্ষ করি; এবং কৈশোবক সৃষ্টি হিসেবে এর বিস্ময়কর আবেদন আমাদের মন থেকে মুছে যায় না।

রবীন্দ্রনাথ এই বয়সের রচনা সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন : "বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে ওঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ, তার পরিমাণ ওজন কববাব কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল; তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত" (জীবনস্মৃতি, 'ভগ্নহৃদয়')। রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর ভূমিকায় স্মৃতি সম্বল করে এই সব কথাগুলি বলেছিলেন। তাঁর সৃষ্টি কিন্তু অন্য কথা বলে। তার মধ্যে যে কাব্যগুণ তা

কৈশোরক সৃষ্টি বলে অবজ্ঞার বস্তু নয়। র‍্যাবোর যুগান্তকারী সৃষ্টি কিংবা চ্যাটার্টনের প্রচ্ছন্ন শিল্প-সুষমার মতই রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক রচনায় আলোচ্য দুখানি গ্রন্থ কাব্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

দুই

পৃথিবীর কাব্যের ইতিহাসে র‍্যাবো একটি উজ্জ্বল নাম। অল্প বয়সেই যন্ত্রণাকাতর এক জীবনের ছবি দেখেছিলেন তিনি, কবিতাতেও হয়েছিল তাঁর গভীরতম আত্মবিশ্লেষণ। কবিতা যে শিক্ষামূলক কিংবা বর্ণনাধর্মীই শুধু নয় তা তিনি বলেছেন তাঁর 'নরকে এক ঋতু' নামক কবিতায় : "ওঃ, আমি ক্লান্ত :— কিন্তু, প্রিয় শয়তান, তোমার কাছ থেকে একটু কম অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি প্রার্থনা করি! কিছু ছোট অপবাদের বোঝার প্রতীক্ষায় থেকে—তোমার জন্যে—যে তুমি লেখকের শিক্ষা দেবার কিংবা বর্ণনা করার ক্ষমতার অভাবকেই ভালবাসো— আমার এই ভয়ঙ্কর পাতাগুলি আমার নোটবুক থেকে ছিঁড়ে নিতে দাও।"

জর্জ ইজামবার্ডকে একটি চিঠিতে (১৩. ৫. ১৮৭১) তিনি লেখেন : "আমি কবি হতে চাই, এবং আমি নিজেকে দ্রষ্টা করবার চেষ্টা করছি : আপনি বোধ হয় বুঝতে পারবেন না, আমিও জানি না কেমন করে আপনাকে বোঝাব। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে এলোমেলো করে দিয়ে অজানার কাছে পৌঁছোনো, সেইটেই আসল কথা। ভয়ানক দুর্ভোগ হবে, কিন্তু শক্ত হতেই হবে, কবি হয়ে জন্মাতে হবে : এটা আমার দোষ নয়।"

পল দেমেনিকে একটি চিঠিতে (১৫. ৫. ১৮৭১ ; উনি লিখেছেন : "সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি নিদারুণ অথচ যুক্তিগ্রাহ্যহিসেবে এলোমেলো করে দিয়ে কবি নিজেকে দ্রষ্টা করে। প্রেম, দুঃখ, পাগলামির সব কটি রূপ ; সে নিজেকে খুঁজে দেখে, নির্যাস বজায় রেখে সে নিজের মধ্যে সমস্ত বিষ ধারণ করে। অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার মধ্যে তার বিশ্বাস ও অমানুষিক শক্তি জাগ্রত থাকা প্রয়োজন, সেই মহান পাপী, মহান রোগগ্রস্ত লোক, পুরোপুরি বিনষ্ট, এবং মহত্তম জ্ঞানী! কারণ সে অজানায় পৌঁছোয়।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে তিনি কবিকে দ্রষ্টা হিসেবে গণ্য করেছেন, তার জন্যে কবির সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির এলোমেলো অবস্থার দরকার। তাঁর কবিতার প্রতীকে, ভাষার উচ্ছলতায় এলোমেলো এক তীব্রতার সন্ধান পাই আমরা। 'মাতাল তরণী' নামক প্রতীকী কবিতা থেকে সুরু করে 'নরকে এক ঋতু' কিংবা

'আলোর আলো' কাব্যে আমরা তাঁর অন্তর উন্মোচিত হতে দেখি নানা দৃষ্টি-কোণ থেকে। পরবর্তীকালের প্রতীকী কবিতার তিনিই প্রথম প্রবর্তক ; এবং আরো পরের স্যুররিয়ালিস্টরা তাঁরই প্রবর্তিত শিল্পপ্রকরণের ধারা বয়ে নিয়ে চলে। কিশোরের চাঞ্চল্য এবং উচ্ছলতা থাকলেও তাঁর কাব্য যে বিশিষ্ট ও যুগান্তকারী কাব্য একথা সকলেই স্বীকার করেছেন। তিনি উনিশ বছরে কবিতা লেখা বন্ধ করে জীবন ও জীবিকার পথে বেরিয়ে পড়েন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিশোর বয়সটা ছাড়া তাঁর আর কিছুরই মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মত বোধ হয় ফরাসী আদি রোমান্টিকদের সম্পর্কে তাঁর মতের সমান হত : "আদি রোমান্টিকেরা না বুঝেই দ্রষ্টা ছিলেন : তাঁদের আত্মার চর্যা আকস্মিকভাবে ঘটেছিল : পরিত্যক্ত রেলগাড়ি যেমন জ্বলতে জ্বলতে কিছুক্ষণ রেলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়" (দেমেনিকে লিখিত পত্রাংশ)।

তিন

চ্যাটার্টন সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে তাঁর রচনা ইংরেজ আদি রোমান্টিকদের ও পরবর্তী রোমান্টিকদের এবং প্রি-র‍্যাফেলাইটদেরও প্রভাবিত করেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, ব্লেক তাঁর গুণমুগ্ধ, কীটস তাঁর 'এণ্ডিমিয়ন' চ্যাটার্টনকেই উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁর স্মরণে একটি সনেট লিখেছেন। রসেটিও একটি সনেট লিখেছেন তাঁর উদ্দেশে। সমসাময়িক কালে এই গরীব কিশোর —ব্রিস্টলের সেণ্ট মেরি রেডক্লিফ গির্জার একপাশের বাসিন্দা—জাল কবি বলে আখ্যাত হয়েছিলেন। ক্যানিং ও রোলি নামক যথাক্রমে ধনী ব্যবসায়ী ও ধর্মযাজক এই দুজন বন্ধু ও প্রায় তিনশো বছর আগের ঐতিহাসিক চরিত্রদের নিয়ে, এবং রোলি কর্তৃক রচিত বলে পার্চমেণ্টে পুরনো স্যাক্সন ভাষায় বিরচিত কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করে এই বালকটি অপদস্থই হয়। এক ত তার জালিয়াতির অপবাদ ঘুচলো না, পরন্তু যদি কেউ ধরেও নেয় যে টমাস রোলি বলে একজন কবি ছিলেন (১৮৬৫-তেও একজনের এই বিশ্বাস দেখা গেছে) তাহলেও চ্যাটার্টনের নকলনবীশ ছাড়া আর কোন কৃতিত্বের কথা কেউ স্বীকার করেন নি। হোরেস ওয়ালপোল—যিনি এই বালকটির জন্যে অনেক কিছু করতে পারতেন—কিছুই করেন নি। গোল্ডস্মিথ কবিতাগুলিকে সত্যিকারের প্রাচীন কবিতা বলেই বিশ্বাস করেছিলেন। ডঃ জনসন চ্যাটার্টনের মৃত্যুর পর

বসওয়েলের সঙ্গে ব্রিস্টলে গিয়েছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন কবিতাগুলি প্রাচীন কবিতা নয়, কিন্তু তিনি বালকটির ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন :

"This the most extraordinary young man that has encountered my knowledge ; it is wonderful who the whelp has written such things."

ইংরেজ লেখকেরা স্বীকার করেছেন যে, রোমান্টিকতার বীজ চ্যাটার্টনের কবিতার বহুকাল পরে আবার দেখা গিয়েছিল যা পরে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের রচনায় প্রকাশ পায়। কবিতায় চিত্রের ব্যবহার, কিংবা নানারকমের ছন্দের পরীক্ষা চ্যাটার্টনই করে গেছেন। তাঁর 'এলা' (Aella), 'এক্সেলেণ্ট ব্যালাড অব চ্যারিটি' ইত্যাদি রচনাগুলি বহুপ্রশংসিত।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী পরিবেশে তাঁর মত এক কিশোরের পক্ষে রোমান্টিক কবিতা রচনা প্রকৃতই বিস্ময়কর—যেমন ধরুন এই কটি পংক্তি :

ঘুরে ঘুরে এই ছোট গান শোনাও আমায়
ফেলো আমার সঙ্গে লোনা অশ্রুকণা ;
ছুটির দিনে নৃত্য কিছুই আর না মানায়
হও যদি হও চলোচ্ছল এক স্রোতস্বনা ;
আমার প্রেমিক এখন মৃত
তিনি মৃত্যুশয্যানীত
উইলো গাছের নীচে যত এই ঘটনা।
শীতের রাতের মতন যে তাঁর কাজল চুল
গ্রীষ্মতুষারসমান সাদা গলাটি তাঁর
ভোরের আলোর মতন রাঙা মুখের মুকুল
নীচে শীতল কবরে আজ শয়ন তাঁর,
আমার প্রেমিক এখন মৃত
তিনি মৃত্যুশয্যানীত
উইলো গাছের নীচে যত এই ঘটনা।

('এলা'র চারণের গান)

তিনি নিজের সম্পর্কে শেষ কথা নিজের উইলে লিখে গেছেন যা তাঁর কবরে উৎকীর্ণ আছে : "টমাস চ্যাটার্টনের স্মৃতির উদ্দেশে। পাঠক বিচার কোরো

না। তুমি যদি খ্রীষ্টান হও, তবে বিশ্বাস কোরো যে এক মহান শক্তি তার বিচার করবে। সেই শক্তির কাছেই সে জবাবদিহি করবে।"

কৈশোরক কবিতার অতুলনীয় উদাহরণ হিসেবে এই তিনজন কবির আলোচনা কবা গেল। আরো অনেক কবিরই হয়ত সফল কৈশোরক কবিতা আছে, কিন্তু র‍্যাবোর (১৮৫৪-৯১) মত উনিশ বছরেরর মধ্যেই প্রতিভার এমন স্ফুরণ তথা কাব্যরচনায় ছেদ আর বেশি দেখা যায়নি। চ্যাটার্টন (১৭৫২-৭০) মুকুলেই ঝরে পড়েন, কিন্তু ঐ অল্প সময়েই তাঁর প্রতিভার দীপ্তি দেখা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে অস্বীকাব করলেও আলোচিত দুটি গ্রন্থে তাঁরও প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ও অনুবাদ

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অনুবাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অনেক বিশিষ্ট কবিই অনুবাদে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন; তাঁদেরও পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ। অনুবাদ সম্পর্কে যে কটি সাধারণ সত্য আমরা মেনে থাকি রবীন্দ্রনাথেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অনুবাদ্য কবি বাছাই করার ব্যাপারে স্বভাবতই অনুবাদকের ভাললাগা মন্দলাগার প্রশ্ন ওঠে, অর্থাৎ অনুবাদক কবির মন তখন সমালোচকেরই ভূমিকা গ্রহণ করে। যুগের হাওয়াও যে অনুবাদকের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে একথাও অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কেন বদল্যার অনুবাদ না করে ভিক্টর উগোর অনুবাদ করেছিলেন—এ-প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে যুক্ত মধুসূদনের উগোর প্রতি নিবেদিত মৌলিক চতুর্দশ-পদীটির সৃষ্টি। বদল্যার যে এলিয়টোত্তর নবাবিষ্কার একথা বাংলায় বদল্যার-অনুবাদ সময়ের প্রতি ইংগিত করছে যেমন, তেমনি পরিচয় দিচ্ছে অনুবাদকের মনোভঙ্গির। রবীন্দ্রমানস যে রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ ও ভাবতায় ঐশীধ্যানে পুষ্ট তার মধ্যে নেতিবাচক কোন কবির স্থান হত কি না সন্দেহ, সেরকম কোন কবির প্রতি অনুবাদকের দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকাতেন বলে মনে হয় না। এ হল তাঁর প্রথম জীবনের কথা। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য আধুনিক কাব্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে, কিংবা ছন্দবিচারকালে আধুনিক বিদেশী কবিদের অনুবাদ করেছিলেন। হয় ত তেমন অনুবাদ যুগতাড়নায় কিংবা নতুনত্বের আস্বাদ দেওয়ার জন্যেই তিনি করেছিলেন। অনুবাদ্য কবি ছাড়া অনুবাদ্য কবিতার সমস্যাও আছে। সহজ কবিতা অনুবাদের একটা আকর্ষণ অবশ্যই আছে, তা ছাড়াও হয়ত আছে অনুবাদক-কবির সমালোচকের দৃষ্টি। যে কবিতা বিশিষ্ট বলে তিনি মনে করেন, কিংবা যে কবিতা তাঁর ভাল লাগে হয়ত সেই কবিতাই তিনি অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন।

'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ একদা রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের যে-ভূমিকা রচনা করেছিল পাশ্চাত্যমণ্ডলে, কিংবা স্বদেশে তাঁর ও তাঁর পরবর্তীকালের কাব্যে গদ্যকবিতার যে উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল তার সঙ্গে তুলনীয় কোন ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারে নি তাঁর বাংলা অনুবাদ-কবিতাগুলি। অথচ তারা

পরিমাণে যেমন অপ্রতুল নয়, তেমনি বহু দেশের বহু কবির অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের মনের ব্যাপ্তির কথাই প্রকাশ করে তারা। রবীন্দ্রমানস তথা রবীন্দ্রকবিকর্মের নির্ভরযোগ্য দলিলও বটে সেই অনুবাদগুলি। এগুলিতে রবীন্দ্র-মানসের সৃষ্টিপ্রয়াসের বিভিন্ন পর্যায় ছাপ রেখে গেছে। ফলত, রবীন্দ্রনাথের বাগ্‌ধারা বিভিন্ন সময়ের অনুবাদে বিভিন্ন রকম। কোন কোন কবিতার (যেমন, এলিয়টের 'জার্নি অব দি মেজাই') অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী কোন বিশিষ্ট কবির (বিষ্ণু দে) পাশাপাশি তুলনামূলক বিচারের সুযোগ করে দেয়।

'প্রভাতসংগীত' রচনার কালে তিনি উগো, শেলি, শ্রীমতী ব্রাউনিং প্রমুখ কয়েকজন কবির কবিতানুবাদ করেছিলেন, এবং সেই অনুবাদিত কবিতার বাগ্‌ভঙ্গিমার দিকে তাকালে আমরা যেমন সেই যুগকে স্মরণ করতে পারি, তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রাক-যৌবন রোমান্টিক কবিতার প্রতি অনুরাগ বুঝতে পারি। অনুবাদের মাধ্যমে তিনি যে কোন মৌলিক রীতির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সে কথা মনে পড়া আশ্চর্যের নয়। ভিক্টর উগো থেকে 'সূর্য ও ফুল' নামক কবিতাটির অনুবাদের প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হয় এই কবিতাটিই কি তাঁকে পরবর্তীকালে 'কণিকা'র নীতিগর্ভ ছোট কবিতা রচনায় উৎসাহ জুগিয়েছিল ?

সেই, পরিপূর্ণ মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম
ভাঙা এক ভিত্তিপরে ফুল শুভ্রবাস
চারিদিকে শুভ্র দল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে।
ছোটো মাথা দুলাইয়া কহে ফুলগাছে,
'লাবণ্য কিরণছটা আমারো তো আছে।'

তাঁর প্রথম জীবনের কবিজীবন ও প্রেমজীবনের যে স্বাভাবিক ও বয়সনির্ভর আর্তি ছিল তা তাঁর নিজের মৌলিক কবিতায় যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় তাঁর অনুবাদ্য কবিতার নির্বাচনে। উগো থেকে 'কবি' অনুবাদটি যেমন,

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কভু বা অবাক্, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া,...

কিংবা, শেলির এই প্রেম-কবিতার অনুবাদ :

আমার হৃদয় চায় উধাও উড়িয়া
প্রেমের সুদূর রাজ্যে করিতে ভ্রমণ,
কিন্তু গুরুভার এই মরতের ভাষা
চরণে বেঁধেছে তার লোহার শৃঙ্খল।

'কড়ি ও কোমল' রচনাকালে শেলির বায়বীয় কিশোরপ্রাণ একটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন তিনি :

হায় মোর নাই আশা, নাইকো আবাম—
ভিতরে নাইকো শান্তি, বাহির বিরাম
নাই সে সন্তোষধন
জ্ঞানী ঋষি যোগিগণ
ধ্যান সাধনায় যাহা পায় করতলে—

নাকি এইসব অনুবাদ্য কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁব জীবনকথাই মাঝে মাঝে ব্যক্ত হয়েছে? প্রিয়জনবিয়োগব্যথায় তিনি প্রেমের আর্তি বিষয়ক কবিতাগুলি বেছে নিয়েছিলেন? 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাবলী রচনাকালে শ্রীমতী ব্রাউনিং কিংবা ক্রিশ্চিনা রসেটির প্রগাঢ় প্রেম-কবিতাব অনুবাদ তাঁব মৌলিক কবিতার পাশাপাশি রাখা যায়। এই কবিতাগুলিব নির্বাচনে তাঁর প্রথম যৌবনের আর্তিই প্রকাশমান :

শ্রীমতী ব্রাউনিঙের কবিতাটি, যেমন :

এখন চাহিয়া দেখি, হায়,
ফুলগুলি শুকায় শুকায়।
যত চাপিলাম মুঠি
পাপড়িগুলি গেল টুটি—
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়।

কিংবা, ক্রিশ্চিনা রসেটির কাব্যানুবাদ :

থাম্ থাম্ ওবে হৃদয় আমার,
থাম্ থাম্ একেবারে,
নিতান্তই যদি টুটিয়া পড়িবি
একেবারে ভেঙে যা রে—

কবিকর্মের দিক থেকেও 'প্রভাতসংগীত' এবং 'কড়ি ও কোমল' রচনাকালীন কাব্যানুবাদ মৌলিক কবিতার রীতি-প্রকরণের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তার বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভবও নয়। অনুবাদ ও মৌলিক কবিতার অবলম্বন যখন ভাষাই, তখন মৌলিক কবিতাতে পরবর্তীকালে যেমন যেমন ভাষার পরিবর্তন দেখা যায়, অনুবাদ-কবিতাতেও তেমনই দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ জার্মান শিখেছিলেন। মূল কবিতা থেকে হাইনের ছোট কবিতা দুটির অনুবাদ মূলানুগামিতা তথা ভাবানুসরণ এই দুই সমস্যার নিরসন করেছে বলেই মনে হয়:

সেই,

ডু বিস্ট ভি আইনে ব্লুমে
জো হোল্ড উণ্ড শ্যোন উণ্ড রাইন
ইখ্ শাউ ডিখ্ আন, উণ্ড ভেমুট
শ্লাইখ্‌ট্ মিয়র ইন্‌জ্ হার্ৎস্ হিনাইন।
মিয়র ইস্‌ট্, আল্‌জ্ অব ইখ্ ডি হেণ্ডে
আউফ্‌জ্ হাউপ্‌ট্ ডিয়র লেগেন জল্‌ট্
বিটেণ্ড, দাস গট্ ডিখ্ এরহাল্টে
জো রাইন উণ্ড শ্যোন উণ্ড হোল্ড।

এর অনুবাদ:

তুমি একটি ফুলের মত মণি
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর।
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর।
শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশিস মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর।

তেমনই সুন্দর 'ডেন ক্যোনিগ ভিশ্বামিত্রের' অনুবাদ 'বিশ্বামিত্র বিচিত্র এই লীলা'।

'কড়ি ও কোমল' যুগের একটি জাপানী কবিতার অনুবাদে বিচ্ছিন্নতার আস্বাদ আছে, কিন্তু পরিণত বয়সে 'জাপানযাত্রী'র পাতায় তিনি যে ছোট

ছোট জাপানী কবিতাগুলির অনুবাদ করেছিলেন তা আমাদের কাছে আরো আকর্ষণীয়। জাপানী চরিত্রের সংযম আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন : 'এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা, এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়! তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

পুরোনো পুকুর
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎকাল।

স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্ছে ফুল,
দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল—
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।'

জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন এই স্বল্পকায় কবিতাগুলির মাধ্যমে। কে জানে পরবর্তীকালে 'স্ফুলিঙ্গ' রচনার সময়ে (এতে ফরাসী কবি জাঁ পীয়ের ফ্লরিয়াঁর একটি কবিতার অনুবাদ করা সত্ত্বেও) জাপানী কবিতা তাঁকে কোন অনুপ্রেরণা দিয়েছিল কিনা।

আধুনিকতার বিচার করতে গিয়ে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে হাজার বছরের পুরোনো লি-পোর কয়েকটি 'আধুনিক' কবিতা তিনি অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভঙ্গি এই অনুবাদে একান্তই আধুনিক, যেমন,

নীলজল···নির্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল
তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

('সাহিত্যের পথে' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রনাথের দুটি গ্রন্থ 'ছন্দ', 'সাহিত্যের পথে' এক বছরের (১৯৩৬-৭) মধ্যেই

প্রকাশিত। ছন্দ, গদ্যকবিতা কিছু আগে থেকেই যেমন বাংলা কবিতায় একটা বিশিষ্ট রূপ নিচ্ছিল, তেমনি আধুনিক বাংলা কবিতার রূপও প্রকাশ পাচ্ছিল এসময়ে। এলিয়ট, পাউণ্ড প্রভৃতি কবিদের চর্চা এই সময়েই সুরু হয়ে গেছে। এই কালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের অনুবাদ একান্তই আধুনিক ও সেকারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

গদ্যকবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে গদ্যে কাব্য রচনা করেছেন ওআল্ট্ হুইটম্যান। সাধারণ গদ্যের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই, তবু ভাবের দিক থেকে তাকে কাব্য না বলে থাকবার জো নেই।...

লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠেছে;
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো থেকে শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।
কোনো দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই নিজেকে।

রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' আগে লিখে থাকলেও গদ্যকবিতার ভাবছন্দরূপের সমর্থন এই সব কবিতা থেকে পেয়েছিলেন কিনা কে জানে!

এমি লাওয়েলের 'তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি' বলে কবিতার অনুবাদ কিংবা এলিয়টের 'প্রিলিউডের' সেই অনুবাদ:

এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসের গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
... ...
বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,
চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রি প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।
... ...
মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে নাও।
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে, যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

—এতে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য পেশ করেছেন। আমরা তাঁর অনুবাদের সাবলীলতা দেখে মুগ্ধ।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের 'জার্নি অব দি মেজাই' কবিতাটির অনুবাদ পাশাপাশি রাখা চলে রবীন্দ্রনাথের, বিষ্ণু দের। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'তীর্থযাত্রী', বিষ্ণু দে 'রাজর্ষিদের যাত্রা'। প্রথম কটি পংক্তি তুলনামূলক বিচারের জন্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

A cold coming we had of it,
Just the worst time of the year
For a long journey, and such a long journey :
The ways deep and the weather sharp.
The very dead of winter. (এলিয়ট)

কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সবচেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।

(রবীন্দ্রনাথ)

আমাদের সে যাত্রা হিমে
বছরের সবচেয়ে খারাপ সময়ে
অভিযান, ওরকম দীর্ঘ অভিযান :
পথঘাট কাদায় গভীর, ধারালো হাওয়া
দুর্গম পথস্তৎ, শীতের চরম।

(বিষ্ণু দে)

রবীন্দ্রনাথ যে সেই বৃদ্ধ বয়সেও কত তরুণমনা ছিলেন এবং কত আধুনিক তা দুই কবির অনুবাদের তুলনামূলক বিচারে সহজেই বোঝা যায়।

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কবিতার অনুবাদ যা রবীন্দ্রনাথের 'রূপান্তর' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, এই প্রসঙ্গে আরো নির্দেশ করে যে, তিনি একদেশদর্শী ছিলেন না। আমাদের দেশের অন্য ভাষাভাষীর কবিতা-অনুবাদে আমরা যে এখনো পিছিয়ে আছি সে আমাদেরই মানসদৈন্য, রবীন্দ্রনাথ সেই অনুবাদেও আমাদের অনন্য পথিকৃৎ।

ঐতিহ্য ও 'বনলতা সেন'

আধুনিক বাংলা কবিতার বিশিষ্ট ও নিদারুণ সফল সৃষ্টি জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'। এই কবিতা একলাই এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, জীবনানন্দের কালে এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে এই কবিতার প্রভাব বহু কবির মধ্যেই দেখা যায়। সাধারণ পাঠক জীবনানন্দকে মনে না করতে পারলেও, বনলতা সেনকে খুব সহজেই মনে রেখেছেন। এমন কি, কোন আধুনিক কাব্যপত্রিকার নাম 'বনলতা' হল না কেন এমন প্রশ্নও কেউ কেউ করে থাকেন।

প্রথম পাঠে এই কবিতা সম্পর্কে নানারকম অনুভবের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ বলেছেন, 'কী অনুভবের যাতনায় এমন একটা বিষণ্ণ কবিতা লেখা হল।' (সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, 'জীবনানন্দ', জীবনানন্দস্মৃতি সংখ্যা, ময়ুখ, শীত-গ্রীষ্ম, ১৩৬১)। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য এই কবিতার ইতিহাস-সচেতনতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আদি বাঙ্গালীর পটভূমিকা উপস্থাপন করে আর এক ঐতিহাসিক কবিতারই সৃষ্টি করেছেন ('কবি জীবনানন্দ', উত্তরসূরী, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১)। সেই বিখ্যাত রচনাটি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করতে পারি: 'বাঙ্গালীর বিদিশার রাত্রি থেকে একটু অন্ধকার তুলে এনে (বোদলেয়ার-ও তেমন ভঙ্গী দেখিয়েছেন) কোশলের শিল্পশালার নর্তকীর মুখাবয়ব বসিয়ে, মালয় সুমাত্রা যাত্রী বঙ্গ-নাবিকের বি-দিশা ও ভ্রান্তি কল্পনা করে মসলার দেশ থেকে একটু ঘাস কুড়িয়ে তার ভাঙা হাল-সমেত প্রোথিত করে যে দৃশ্য-পট তৈরী, তেমন একটি গৃহান্ধ-কারের সাংসারিক ঘ্রাণে নাটোরের পক্ষাজাতীয় মেয়ে এক ক্লান্ত-প্রাণ নাবিককে কুশল-পরিচয় জিজ্ঞাসা করছেন। এই সেনায়া রমণী নাবিককে চোখের আহ্বানে পাখীর নীড়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, যেহেতু তাঁর জন্মগত সংস্কার তাই। কিন্তু পরভৃতিক কোকিল ত জানে এ-নীড় তার নয়—দুদণ্ডের খেলা শুধু। সন্তানের লালনের জন্যে এই ধাত্রী কাকিনী।' কিংবা, 'নাটোরের বনলতা সেনের যে চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ—এ-সমস্তই যে কোনো সর্বদেশকাল-ব্যাপী ভাবের চিত্রকল্প তা অনুভব করলেই আমরা কবিতাটির মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারব।' (বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ দাশ: বনলতা সেন', কালের পুতুল)। জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর 'বনলতা সেন' লেখা

হওয়ার আগেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রকাশ পেয়েছিল—'এমন একটি স্বাদ, এমন একটি সৌরভ আমরা পেয়েছিলাম যা তার আগে বাংলা সাহিত্যে আমাদের জানা ছিলো না। তা যেন অনেক দূরদেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশবিহারী কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে পদে অপ্রত্যাশিত' (ঐ, ঐ)। আমার মনে হয় 'বনলতা সেন' তার ঐতিহ্যানুসরণ ও ঐতিহ্যোত্তীর্ণতায় মহৎ সৃষ্টির দিকনির্দেশ করছে। এই কবিতার মধ্যেই তিনি পৃথিবীর, বিশেষত রোমান্টিক যুগের কবিতার সঙ্গে যুক্ত এবং যুগোত্তরও বটে। বস্তুত তাঁর কাব্যসৃষ্টিকে যদি নাটকীয় কোন পর্ববিভাগে ভাগ করা যায় তাহলে এই কবিতাটিকে ক্লাইম্যাক্সে রেখে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলিকে প্রারম্ভ ও ক্রমবর্ধমান ঘটনা এবং 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমিরে'র কবিতাগুলিকে শেষ পর্বের ঘটনা বলে মনে করা যেতে পারে।

বদল্যার কিংবা পো-র নাতিদীর্ঘ কবিতার সংজ্ঞার আবেগমধুর স্ফটিক দার্ঢ্য ফুটে উঠেছে আঠারো পংক্তির এই কবিতায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মুক্তকের সিঁড়িভাঙা দীর্ঘ সব কবিতায় এর আগেই জীবনানন্দ নিজের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন—কিন্তু 'বনলতা সেন'-এ তাঁর প্রযত্ন অনেক সংযত, মনে হয় ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির সংশ্লেষ ঘটেছে এই কবিতায়। চিত্রকল্পগুলি অবশ্যই জীবনানন্দের নিজের ('পাখির নীড়ের মত চোখ', 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' ইত্যাদি), কিন্তু কবিতাটির মূল পরিকল্পনায় এটি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত, যে-রোমান্টিক ঐতিহ্য একশো বছরের মধ্যেই পো, কিংবা রবীন্দ্রনাথ, এমন কি ডসনের মধ্যে দেখা যায়, সৌন্দর্যের প্রতি কবির সেই অনন্ত নিরাকরণীয় পিপাসা—যার প্রকাশ পূর্ববর্তী অনেকের কবিতাতেই দেখা গেছে।

এই সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যবোধ রোমান্টিক বিষণ্ণতার আরোপে শিল্পসমৃদ্ধ হয়। মারিও প্রাৎস এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দের কবিতাও আমরা সেই ঐতিহ্যবিধৃত রোমান্টিক কবিতাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করে বিচার করতে পারি। সেই রোমান্টিক কবিতার চরিত্র একদিকে পুরাণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, অন্যদিকে সমসাময়িক জীবন থেকে, যেমন করেছেন জীবনানন্দ (বনলতা সেন) কিংবা ডসন (সাইনারা)। পো দীর্ঘ কবিতার দাবি অস্বীকার করেছিলেন—তাঁর কথামতই সে কারণে তাঁর 'হেলেনের প্রতি' ও জীবনানন্দের আলোচ্য কবিতাটির কথা মনে পড়ে। আমরা বলি না জীবনানন্দ সচেতনভাবে সেই কবিতাটি থেকে কোন শব্দ বা ছবি গ্রহণ করেছেন—নারীসৌন্দর্য

দেখবার জন্যে দুই কবিকে সমান্তরালভাবে উপস্থাপনই আমাদের লক্ষ্য। একই রোমান্টিক পরিমণ্ডলে যে দুজনের এবং আরো অনেকজনের অধিষ্ঠান তাই আমাদের বিচার্য। পো-র কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করতে পারি:

Helen, thy beauty is to me
Like those Nicean barks of yore
That gently, o'er a perfumed sea,
The weary, way-worn wanderer bore
To his own native shore.
On desperate seas long wont to roam,
Thy hyacinth hair, thy classic face,
Thy Naiad airs have brought me home
To the glory that was Greece,
And the grandeur that was Rome.
Lo! in yon brilliant window-niche
How statue-like I see the stand,
The agate lamp within thy hand,
Ah, Psyche, from the regions which
Are Holy-Land!

জীবনানন্দের নায়কের সমুদ্র পরিভ্রমণকে, পো-র নায়কের সমুদ্র পরিভ্রমণের পাশাপাশি রাখা যায়। যেমন রাখা যায় জীবনানন্দের 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক' এবং পো-র 'the weary, way-worn wanderer', কিংবা জীবনানন্দের 'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর' ও পো-র 'perfumed sea'। 'অনেক ঘুরেছি আমি'র পাশাপাশি 'on desperate seas long wont to roam' কথাটিকেও রাখা যায়। কিন্তু এই মিল দেখে একটা কথাই আমাদেব মনে হয় তা হল বোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতির কবিতার যে ঐতিহ্য তাতে প্রত্যেকেই নিজের অবদান রেখে গেছেন। জীবনানন্দ ঐতিহ্যকে নিজের মধ্যে স্বীকার করে সেই ঐতিহ্যকে ছাড়িয়ে গেছেন নতুনতর আবেগে, চিত্রগ্রন্থনে, বাগভঙ্গিমায়। পো যেখানে সরাসরি পৌরাণিক চরিত্র বেছে নিয়েছেন, জীবনানন্দ সেখানে নতুন পুরাণ সৃষ্টি করেছেন। রোমান্টিক কবির ইতিহাসের সুদূরতার বোধ পো-তেও যেমন, জীবনানন্দেও তেমন। পো প্রথমত হেলেনকে বেছে নিয়েছেন, তা ছাড়া তিনি গ্রীস ও

রোমের মহিমা স্মরণ করেছেন। জীবনানন্দ নাটোরের বনলতা সেনকে আমাদের জগৎ থেকে বেছে নিলেও 'বিদিশার নিশা' কিংবা 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' অথবা 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতের' ক্লাসিক সুদূরতায় সৌন্দর্যবৃত্ত লক্ষ ও জাগ্রত করেছেন। হেলেনের ক্লাসিক সুদূরতার বিষাদ বনলতা সেনের মধ্যেও আমরা দেখি—সেই রোমান্টিক বিষাদ :

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ,
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

এই সৌন্দর্যচেতনা যার মধ্যে বিষাদের সুর স্পষ্ট বদল্যারের মধ্যে ছিল, যেমন ছিল রোমান্টিক সব কবিদের মধ্যেই। বদল্যারের 'সৌন্দর্য-প্রশস্তি' কিংবা 'দুই সুন্দরী ভগিনী' কবিতা দুটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যেমন স্মরণীয় 'রোমান্টিক আর্ট' নামে তাঁর গদ্যরচনা। ইংরেজি ডেকাডেন্ট কবিদের রচনাতেও সেই বিষাদ, মানুষের সৌন্দর্যের প্রতি অনন্ত পিপাসা যে কোনদিন মেটবার নয় সেই বোধজনিত বিষাদ লক্ষ করা যায়—এবং সেই কবিরাও মূলত রোমান্টিক। ডসনের সেই কটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে :

I cried for madder music and for stronger wine,
But when the feast is finished, and the lamps expire,
Then falls thy shadow, Cynara ! the night is thine ;
And I am desolate and sick of an old passion,
Yea, hungry for the lips of my desire :
I have been faithful to thee, Cynara ! in my fashion.

রোমান্টিকদের আদর্শবাদ হয়ত নেই এই কবিতায়, কিন্তু এর মধ্যে রোমান্টিক আবেগ কিছু কম নয়। 'সায়নারা' এবং 'বনলতা সেন'কে আমার একই সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে হয়, যদিও নিঃসংশয়ে 'বনলতা সেনের' ব্যাপ্তি ও গভীরতা অন্য কবিতাটির চেয়ে ঢের বেশি।

রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনার প্রতীক যে নারী তার ঐতিহ্য হেলেনের চরিত্রে যেমন পাশ্চাত্যে, আমাদের দেশেও তেমনি উর্বশীতে। হোমর থেকে আরম্ভ করে ইস্কিলাস, ইউরিপিডিস, শেক্সপীয়র, হাইনে, ভেরআর্ন, ভালেরি প্রমুখ বহু কবিই হেলেনের উল্লেখ করেছেন। উর্বশীর উল্লেখও তেমনি বেদে আছে, পুরাণে আছে। কালিদাস উর্বশীর আখ্যান নিয়ে নবতম রূপে 'বিক্রমোর্বশী' নাটক লিখেছিলেন। আমাদের মধুসূদনও 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' এই পত্রকাব্য রচনা

করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' সেই মহান ঐতিহ্যের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। টমসন এই কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন :

"The greatest poem of all, Urbasi, is perhaps the greatest lyric in all Bengali literature, and probably the most unalloyed and perfect worship of Beauty which the world's literature contains."

গ্রাম বাংলার পটভূমিতে অবস্থানকালে জলপথে শিলাইদহে যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর এই রোমান্টিক কবিতাটি লিখেছিলেন। সেই গ্রাম বাংলার কিছু কিছু ছবি আছে এই কবিতায় :

গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।

কিংবা, 'শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল' ইত্যাদি। এই ঐতিহ্যসূত্রেই মোহিতলাল 'উর্বশী'র মধ্যে সুইনবর্নের 'আফ্রোদিতি'র (এ্যাটালাণ্টা ইন ক্যালিডন) মিল কিংবা তার চেয়ে বেশি কিছু খুঁজে পেয়েছেন।

জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' যেমন রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'ও তেমনি দেশকাল উত্তীর্ণ হয়ে যায়। দুটি কবিতারই ব্যাপ্তি অপরিসীম, মনে হয় সারা পৃথিবীর সৌন্দর্যচেতনাই বুঝি এখানে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আছে সেই রোমান্টিক বিষাদ :

ফিরিবে না, ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে,
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে…।

রোমান্টিক কবিতার স্বভাবেই আছে এই ব্যাপ্তি, বিষাদ, সৌন্দর্যচেতনা, পাওয়া এবং পেয়ে হারানোর বেদনা। দুই কবির মধ্যেই আমরা সে সব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখেছি।

জীবনানন্দ অবশ্যই রোমান্টিক প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য নিজের মধ্যে অনুভব

করেছিলেন, যার প্রকাশ দেখি এই কবিতায়। এলিয়টের সেই বিখ্যাত উক্তিগুলি স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে :…the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence,…This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer·· most acutely conscious of his place in time, of his own contemporaneity (Tradition and the Individual Talent).

দেশী-বিদেশী সাহিত্যে সুপঠিত জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় রোমান্টিক প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য স্বীকার করে সেই ঐতিহ্যকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন নিজের বৈশিষ্ট্যের অবদানে। কী সেই অবদান ? কেন জীবনানন্দ এই কবিতাটি রচনার আগেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একাধিক কবিতায় বৈচিত্র্যে, অভিনবত্বে নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে থাকলেও এই কবিতাটির জন্যে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত ? আমি শুনেছি 'কবিতা' পত্রিকায় যখন এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, এবং পরে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজে, তখনকার চেয়ে এই কবিতাটি ঢের বেশি খ্যাতি অর্জন করেছে পঞ্চাশের দশকে—অবশ্যই 'বনলতা সেনের' নবতর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। কেন এমন হল সেটাও আমাদের প্রশ্ন।

'বনলতা সেনের' সংক্ষিপ্ত পরিসরের দার্ঢ্যের মধ্যে এর এক স্ফটিক-দ্যুতি আছে যার জন্যে এর আকর্ষণ তাৎক্ষণিক। ইতিহাসের উল্লেখ স্বভাবতই এই কবিতায় এক ব্যাপ্তি এনেছে, যেমন পৌরাণিক বর্ণনা এনেছে পো-র 'হেলেন' কিংবা রবীন্দ্রনাথের উর্বশীতে। কিন্তু ইতিহাস-সচেতনতা ত রোমান্টিক আকুতিরই একটি বৈশিষ্ট্য, সে কারণে এর আকর্ষণ রোমান্টিক কবিতার প্রতি আকর্ষণেরই মত। 'বনলতা সেন' সৌন্দর্যের প্রতীক, এবং 'উর্বশী'র মতই তার প্রতি পুরুষের পেয়ে হারানোর বেদনা। উর্বশী স্পষ্টতই 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী' কিন্তু 'বনলতা সেন' ঘরণী ও প্রেমিকার দোলাচলে দুলছে—একজনকে পেলে বুঝি আর একজনকে হারাতে হয়, সেই দূরবর্তিনীর প্রতি আর্তিই প্রকাশিত হয়েছে এখানে। জীবনানন্দ নারীর এই দ্বৈত রূপের কথা ত আগেই প্রকাশ করেছেন :

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝ'রে পড়ে তার—

শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে

... ...

বা, ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব (অবসরের গান)

এই দ্বৈতরূপের বোধ সৌন্দর্যের প্রতীকে দানা বেঁধেছে 'বনলতা সেন'এ। চিত্রকল্পের অভিনবত্ব অবশ্যই এই কবিতার একটি সবিশেষ গুণ—সেই 'পাখির নীড়ের মত চোখ', 'শিশিরের শব্দ' ইত্যাদি। দূরের ইতিহাস এবং সমসাময়িকতা দুইই একাধারে সংশ্লিষ্ট হয়েছে এখানে। 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' এই জিজ্ঞাসাই যেন ইতিহাসের চমক ভাঙিয়ে ইতিহাসকে সমসাময়িকের রক্তে প্রবাহিত করেছে। ফার্টিলিটি কাল্টের যে বোধ জীবনানন্দের কবিতার প্রথম যুগ থেকে শেষ যুগ পর্যন্ত বর্তমান, যার জন্যে পুনঃ পুনঃ তিনি জন্ম, মৃত্যু, নারী সম্পর্কিত উল্লেখ ও চিত্ররূপায়ণ করে গেছেন তারই মধ্যমণি এই কবিতা, এইখানেই তিনি সৌন্দর্যবোধ ও ফার্টিলিটিবোধের মুখোমুখি হয়েছেন, এবং সৌন্দর্যের মধ্যে না পাওয়ার যে-বেদনা আছে তাই প্রকাশ করেছেন।

এই সব নানা কারণের জন্যে এই কবিতাটির আবেদন সর্বজনীন। সৎ কবিতা—যাকে কোন ইজমের মধ্যেই ধরা যায় না, এমন কি সুররিয়ালিজমও নয়, আবার যার মধ্যে বহুরকম ইজমই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে—চিরকালের কবিতা। 'বনলতা সেন' সেইরকম একটি কবিতা।

জীবনানন্দের দেশবিদেশ

জীবনানন্দ আধুনিক বাংলা কবিতায় যে সুর এনেছিলেন তা নবীনত্বের সুর—তাঁর বাচনভঙ্গি নবীন, তাঁর চিত্রকল্প অভিনব এবং তাঁর কবিতায় ইতিহাসাশ্রিত যে ব্যাপ্তি ও তার যে নতুনত্ব তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বিশ্বরূপ দর্শনের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। তাঁর কবিতার দিকে 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ১২.৩.৩৭, 'ময়ূখ', জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা ১৩৬১)। তাঁর পদবিন্যাস তথা পংক্তিবিন্যাসের কথাই সম্ভবত বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—সেখানে তিনি কিছু অভিনবত্ব দেখতে পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। ১৯৪৩-এও এই কবি সম্পর্কে বলা হয়েছিল: 'আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেক আলোচনা আমার চোখে পড়েছে যাতে জীবনানন্দ দাশের উল্লেখমাত্র নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০-পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হতেই পারে না'। এর কারণ সম্পর্কে লেখক বলছেন: 'তিনি কবিতা লেখেন, এবং কবিতা ছাড়া আর-কিছু লেখেন না; তার উপর তিনি স্বভাবলাজুক ও মফস্বলবাসী, এই সব কারণে আমাদের সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি যেন খানিকটা দূরে সরে গিয়েছেন' (বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, পৃঃ ৩৫)। কিন্তু জীবনানন্দকে অস্বীকার করা যায় নি কারণ তিনি চিরকালের অথচ তাঁর আকর্ষণ নবীনের মত—আর সবটাই 'আমাদের অভ্যস্ত, পরিচিত, সাংসারিক জীবন' (ঐ, পৃঃ ৩৮)—এবং কবিতার চেহারাও সেই রকম। তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছিল: "প্রতিটি রচনার ভিতর দিয়ে এমন একটা স্বর বুকে এসে লাগলো যে-রকম আর কখনো শুনিনি। একেবারে নতুন সেই স্বর, আর এমন অদ্ভুত যে চমকে উঠতে হয় (ঐ, পৃঃ ২৮); এই কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়" (ঐ, পৃঃ ২৯)। এই চমকের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি 'চিত্ররূপময়তা'র মধ্য দিয়েই ব্যাপ্তি তথা শাশ্বতীর কাছে পৌঁছোতে চেয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা বা সমসাময়িক কারো কারো বুদ্ধিগ্রাহ্যতার মধ্য দিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছোতে হয় নি তাঁকে। তাঁর চিত্রগুলির ভেতরে যেন চিরকালের মানুষের বিষণ্ণ একটা মুখ

ছিল, তাঁর সুরের মধ্যে চিরকালের এক সুর। এই বৈশিষ্ট্যেই তিনি তাঁর কালে নবীন ছিলেন। সেই ১৯৩৬-এ জীবনানন্দের এবংবিধ প্রতিভা দেখে বুদ্ধদেব সখেদে বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে সাহিত্যসমালোচনার আদর্শ এখনও অত্যন্ত শিথিল; প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অ-সাহিত্যিক কারণে' (ঐ, পৃঃ ৩৩-৩৪)। জীবনানন্দকে চেপে রাখা যায় নি —তাঁর নবীনত্ব ভোলবার নয়: 'গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোন বাঙালী কবি করেন নি' (ঐ, পৃঃ ৪৬)। জীবনানন্দের প্রভাব সর্বত্রব্যাপ্ত—তা দেখেই তাঁর সাফল্যের প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছিল: 'উত্তরোত্তর তাঁর জনপ্রিয়তা ·· অনুজ কবিদের এবং সমসাময়িক কবিদেরও কারো কারো ভাষায় জীবনানন্দের ভাষাভঙ্গীর স্পর্শ।···আমাদের যুগ-মানসের ভাষা প্রথম উচ্চারিত হয়েছে জীবনানন্দের কবিতায়। এ-ভাষা যদি জটিল মনে হয় তাহলে মনে করতে হবে যুগ-মানসই জটিল' (সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'কবি জীবনানন্দ দাশ', পৃঃ ১৬)। জীবনানন্দের রচনার ওপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিদেশী প্রভাবের কথা এমনিভাবে বলা হয়েছে: 'ইয়েট্‌স্‌-এর হৃদয়-সাহচর্য যে বাঙালী কবি পেয়েছেন, মনে করতে হবে তিনি ইংরেজি কবিতার আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে পরিচিত। শুধু পরিচিতই নন, আসক্ত' (সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ঐ, পৃঃ ১৭)।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তথা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই প্রভাব কতটা দেখা যায় কিংবা আদৌ দেখা যায় কিনা সেটাই আমাদের বিচার্য। আজ যখন সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে—নৃবিজ্ঞানে—প্রভাবের উৎস খোঁজা বিড়ম্বনা বলে মনে করা হয়ে থাকে তখন শিল্পের ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখলেই বিদেশী প্রভাব বলে তাকে বিচার করার প্রবণতা কি খুব স্বাভাবিক বিচার? না কি সেটা ঔপনিবেশিক দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মধ্যবিত্ত মানসের ভিন্ন রকমের সুন্দর কিছু দেখলেই 'বিলিতি' 'বিদেশী' বলে মনে করার নিদর্শন? আমার মনে হয় জীবনানন্দের রচনার এই অভাবিতপূর্ব অভিনবত্বই তাঁর সম্পর্কে নানারকম 'মিথ' সৃষ্টি করেছে। তাঁর নিজস্ব স্বভাবের নিঃসঙ্গতা যেমন তাঁর কবিতায় আরোপ করে তাঁকে নির্জনতম কবি বলে আখ্যায়িত করে মিথের সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি তিনি ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন কিংবা প্রচুর বই পড়তেন এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বিদেশী বহু কবির দ্বারা প্রভাবিত এমন কথাও বলতে চেয়েছেন অনেক সমালোচক।

জীবনানন্দের কবিতাপাঠে আজ আমরা তেমন কোন বিদেশী ছায়া খুঁজে পাই না। এককালে মনে হত পো-র 'হেলেন্‌' বোধ হয় তাঁর 'বনলতা সেন'কে প্রভাবিত করেছে। তাঁর 'সমারূঢ়' কবিতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ইয়েটসের 'দি স্কলার্স' কবিতার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সে-ভাবনার দায়িত্ব সমালোচকের নিজের, কবির নয়। 'স্কলারের' টাক-মাথা অধ্যাপকদের প্রসঙ্গের সঙ্গে জীবনানন্দের অধ্যাপকদের মিল সামান্যই। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পরে জীবনানন্দ এক নিজস্ব কাব্যভাষায় অপরূপ যে কবিতা লিখেছিলেন তার পেছনে তাঁর একটা শিক্ষিত মনন কাজ করেছে। সে-মনন প্রকৃত কবির মনন যার মধ্যে গ্রহণ-বর্জন, আত্মীকরণ এমন এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে সংঘটিত হয় যে সহজে তার হদিস মেলা ভার। আমরা শেক্সপীয়রের মধ্যে প্লুটার্ক প্রমুখের সমান্তরাল রচনাংশের যদি বা সন্ধান করতে পারি এবং তা পারি নাটক বহিরাশ্রয়ী শিল্পকর্ম বলেই, জীবনানন্দের গীতিকবিতায় সেরকম অন্বেষণ পণ্ডশ্রম। এই কবির অধিকাংশ কবিতাই গভীর অন্তর্লোক ও বিশ্বের শাশ্বত এবং ব্যাপ্তলোকের সাযুজ্যসম্পর্কে সম্পর্কিত—এর মধ্যে কোথাও ইয়েটসের স্বপ্নিলতা, শেলির সুরের ধ্বনি, কীটসের চিত্রলতা, প্রি-র‍্যাফেলাইটদের বেদনামুখর স্থিরচিত্র আছে কি না তা হাতে গুণে গুণে বের করার প্রচেষ্টা নেহাৎই প্রতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা।

বরং জীবনানন্দের নিজের ভাষায় তাঁর নিজের কবিতা প্রসঙ্গে বলা যায় : "কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরণের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়" (জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৫৪ সংস্করণ, ভূমিকা)। অথবা, "কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার, কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য" (তদেব)। জীবনানন্দ শিল্পচিন্তার মূলে গেছেন এবং তাঁর কবিতা অভিজ্ঞতা ও চেতনাকে ছাড়িয়েও যেন কি আশ্চর্য এক ব্যাপ্তির জগতে ছড়িয়ে পড়েছে—সে-জগতের পটভূমি ভালবাসার, দেশ-মাটি-কালকে ভালবাসার, আবার সেই দেশ-কাল-মাটিকে ছাড়িয়ে এক অনন্ত বিশ্বমানবতা-কেও তিনি ভালবাসতে চেয়েছেন। এ-ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছিই আছেন—তবে তাঁর ব্যাপ্তি এই চিত্রল জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ উপলব্ধির মাধ্যমেই। রবীন্দ্রনাথের পরে ভিন্ন প্রকরণে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তির সাধনা তাঁর কবিতায় অভিনবত্ব সঞ্চার করেছে, এই অভিনবত্ব দেখে আমরা তাঁর কাব্যিক চেতনার গভীরতা উপলব্ধি না করেই তাঁর মধ্যে বিদেশী সমান্তরাল

খুঁজতে লেগেছি। নীচের কবিতাংশটিতে যদি আমরা টেনিসনের 'লোটস ইটার্সের' সুর শুনি ত তার দায়ভাগ কবির নয়, পাঠকের নিজের—

এখানে নাহিকো কাজ—উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা ;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়। (অবসরের গান)

আমার মনে হয়, সচেতন প্রভাব যদি থাকতো তাহলে জীবনানন্দ অনেক বেশি বিশেষণ পদ ব্যবহার করে আকর কবিতাটির হয়তো এক-আধবার চিহ্ন রেখে যেতেন নিজের রচনায়। না কি বলবো তিনি আত্মীকরণে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন ? বস্তুত, ব্যাপারটা সেরকম নয়। তাঁর কবিতায় দূরবর্তী রোমান্সের আবহ তথা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ (সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের আলোচিত Time-Space-Continuum)-এর ব্যাপ্তির চেতনা এবং শাশ্বত মানবতার প্রতি বেদনাবোধ তাঁর কবিতায় একটা নতুনত্বের আমেজ লাগিয়েছিল। তিনি প্রথম দিকের কবিতায় লিখেছিলেন :

অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শাশ্বত রাত্রির দিকে তবে
সহসা বিকেলবেলা শেষ হ'য়ে গেলে
চ'লে যেত কেমন নীরবে। (সবিতা)

শেষ দিকের কবিতায় তাঁর সেই মানুষ সম্পর্কেই তিনি বলেন :

মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই—তবু এই জের টেনে খেলি ;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হলে হাসি ;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে—অন্ধকারে—
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।
(তিমিরহননের গান)

বস্তুত, জীবনানন্দের কবিতায় তাঁর দেশই সব। রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ভারতসংস্কৃতির পাঠে সুশিক্ষিত ছিলেন, জীবনানন্দও তেমনি পাশ্চাত্য মানবেতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিশীলিত মন তাঁর নিজেরই। জীবনানন্দ তাঁর দেশ-কালকে চিরদিনের নক্ষত্র করেছেন। তাঁর

'মেঠো চাঁদ', 'পেঁচা', 'বনলতা সেন' আমাদেরই দেশের বিষয়—দেখার ভঙ্গিটা এত গভীর, বলার ভঙ্গি এত চিত্রল ও সুরেলা যে যে-কোন পাঠকই তাঁর কবিতাপাঠে চমক খায়। তাঁর কবিতার নিজস্ব এক গতি আছে যা তাঁর 'বুনোহাঁসের' গতিকেও ছাড়িয়ে যায় :

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।
তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু-একটা কল্পনার হাঁস। (বুনো হাঁস)

আসলে জীবনানন্দের কবিতার প্রকরণগত শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতাই বোধ হয় আমাদের নেই, তাই আমরা নিয়তই চমকে উঠি এবং সেই কবিতাকে বিদেশী-বিদেশী বলে মনে করি। প্রকরণহীনতার এই যুগে বারবার তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে আমাদের।

জীবনানন্দের গদ্যরীতি*

জীবনানন্দের একটি উক্তি এখন প্রায় প্রবচনের মতই হয়ে গেছে—সেটি তাঁর এক গদ্যরচনারই একটি অংশ—'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি'। এটি ছাড়া আর কোন বচনই মুখে মুখে ঘোরে না, যদিও এরকম চমক অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। শেক্সপীয়রের অনেক নাট্য-ও কাব্য-অংশ মুখের ভাষায় চলে গেছে আমরা জানি। জানি কোলরিজের 'বায়োগ্রাফিয়া' খড়ের বোঝার মধ্যে মাঝে মাঝে কাব্যসমালোচনার গূঢ় বক্তব্যের সূঁচ লুকিয়ে আছে—কিন্তু জীবনানন্দের বেলায় ঐ একটি ক্ষেত্র ছাড়া গদ্যাংশ মুখের ভাষায় প্রচলিত হয় নি। আসল কথা, জীবনানন্দের গদ্যরচনাগুলি তাঁর কবিতার মত অত অভিনিবেশের সঙ্গে পড়া হয় নি। তাঁর গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সেখানে বাস্তবিকই চমকের কিছু নেই।

তিনি থেমে থেমে নিজের পাঠ ও বোধিসঞ্জাত কাব্যমতামত প্রকাশ করেছেন, সেখানে একটি কথাও বাহুল্যদোষে দুষ্ট নয়, কিশোর উচ্ছ্বাসে স্পৃষ্ট নয়, মনে হয় না আমরা কোন বালক বৃদ্ধের রচনা পড়ছি। তাঁর গদ্যরচনা পড়তে পড়তে স্বভাবতই এলিয়টের অন্তরঙ্গ ভাষার কথা মনে পড়ে—এলিয়ট যেমন একটি বক্তব্যকে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করে নানা দিক থেকে তার ওপর আলোকসম্পাত করেন, জীবনানন্দও তেমনি তাঁর গদ্যরচনায় ধীর স্থির আত্মসমাহিত ভঙ্গিতে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। কোলরিজের সূঁচ তাঁর রচনায় খোঁজা বিড়ম্বনা, কারণ তাঁর রচনার স্বাদ গ্রহণ পুরো একটি রচনা পাঠেই সম্ভব—সে-ব্যাপারে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি মনে হয়—কোন পূর্ণ রচনার পাঠ ছাড়া বক্তব্য বোঝা যায় না, পাঠের পেছনে পূর্ণ ব্যক্তিত্বটিকে মনে রাখলে আরো গভীরে প্রবেশ করা সহজ হয়।

জীবনানন্দের গদ্যরচনা আমরা সামান্যই পেয়েছি। তাঁর রচিত উপন্যাস ছাড়া আর সব গদ্যই প্রধানত তাঁর কাব্যের অনুপূরক, এগুলি পড়লে তাঁর

* এই প্রসঙ্গে অরুণকুমার বসু সম্পাদিত 'বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে বর্তমান লেখকের 'গদ্য, কবির গদ্য ও কয়েকজন কবি' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

কাব্যরসগ্রহণে একটা প্রতিষ্ঠানিক আনন্দ পাওয়া যায়, সর্বোপরি বোঝা যায় তিনি আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির এক উপেক্ষিত নায়ক—সে রীতি ইম্প্রেসনিস্টিক হলেও যুক্তি, বোধি ও সহৃদয়তার এক যোগ্য মিশ্রণ। তাঁর গদ্যরচনাগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি : ১. 'কবিতার কথা'য় সংকলিত ও অন্যত্র (যেমন, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায়) তাঁর কাব্যবিষয়ক মতামত, ২. তাঁর চিঠিপত্র, এবং ৩. তাঁর আত্মজীবনীধর্মী দুএকটি রচনা। আমরা প্রধানত 'কবিতার কথা'র গদ্য নিয়েই আলোচনা করবো, কারণ এখানেই কবি তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে প্রামাণ্য জবানবন্দি রেখেছেন, এখানেই গদ্যকে তিনি যথাযথ-ভাবে আর এক শিল্পশৈলী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর অন্যান্য গদ্যরচনার কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আসবে।

'কবিতার কথা' গ্রন্থের সব কটি প্রবন্ধই কবিতারচনা, কাব্যরসাস্বাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখিত। কবিতা সম্পর্কে যে মাত্রাচেতনার কথা জীবনানন্দ বলেছেন তা তাঁর গদ্যরচনাতেও প্রাপ্য। তাঁর উক্তি, 'কবি যখন তাঁর একটি কবিতা লেখা শেষ করেন, তখন হয় তা সফল হল, না হয় হল না। কি তা হল সব চেয়ে আগে কবির নিজেরই কাছে তা ধরা পড়বে। শিল্পীমানসের গঠনের ভিতর এই কঠিন আত্মোপকারপ্রতিজ্ঞা রয়েছে ; তিনি অতীত বা আধুনিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা নৈর্ব্যক্তিক যাই হন না কেন' ('মাত্রাচেতনা,' কবিতার কথা)। এ কথাগুলি জীবনানন্দের গদ্যভঙ্গি সম্পর্কেও খুবই সত্য। তাঁর গদ্য অহেতুক-উচ্ছ্বাসবিহীন. যুক্তিনির্ভর ধীর স্থির গতিতে চলে। এদিক থেকে তিনি আমাদের ক্লাসিক লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত প্রমুখদের খানিকটা সগোত্র। তবে যেহেতু তিনি আধুনিক যুগের মানুষ এবং আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সবই কবিতাবিষয়ক, সে কারণে তাঁর রচনায় হার্দ্যগুণের সঙ্গে মিশেছে একজন সক্রিয় কবির অভিজ্ঞতা, নিজের শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা। তাঁর যুক্তিবাদী বাচনভঙ্গি আমাদের বারবার তাঁর রচনার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। এরকম কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপিত করছি :

১. প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়—এমন একটা অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতায়ই সম্ভব—অন্য কারু কবিতায় নয় (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা)।

২. মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো, কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময় চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে (কবিতা প্রসঙ্গে)।

৩.···কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনেব ব্যাপাব ; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ-তারতম্যেব, সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হ'তে হয় (জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভূমিকা, ১৯৫৪)।

তাঁর গদ্যভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায তিনি যুক্তিনির্ভর। ধীব, স্থির, বাহুল্য-বর্জিত পদবিন্যাসের সাহায্যে তিনি নিজের কাব্যোপলব্ধির কথাই বলে চলেছেন। এই ভঙ্গি তাঁব পয়ার-প্রীতির জন্যেই হয়ত এত সুন্দর এবং বাস্তবিকই তাঁর গদ্যভঙ্গি ও কাব্যরীতি যে মূলত একই সেকথা আমবা পরে বলছি।

জীবনানন্দেব অন্য গদ্যরচনার মধ্যে আছে তাঁর চিঠিপত্র ; সেই চিঠিগুলিতে তাঁর মার্জিত রুচিব পরিচয় মেলে। একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করি : "আপনার চিঠি ও কবিতা পেয়ে খুশি হয়েছি। এবারও উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। এজন্য গতবার যে কারণ দেখিয়েছি তা থেকে নিশ্চয়ই আপনাব মোটামুটি ধারণা হয়েছে যে আমি আসলে অলস, কিংবা ভালো চিঠি-লিখিয়ে নই এবং এ সব দোষ স্বীকার করবাব মত গুণ নেই আমার, কাজেই বড় কথা পেড়ে ছোট জিনিষকে চেপে রাখি। এ ধাবণা একেবারে অসত্য নয়। আমি যা লিখে-ছিলাম, তাও মিথ্যা নয়। সংসারের মোটা লেনদেনের থেকে যে চিঠি যত দূরে সে চিঠি তত—সৎ কি অসৎ বলব না—শুদ্ধতর চৈতন্যের জিনিষ। এসব চিঠির উত্তর দিতে অল্প-বিস্তর দেরি হবেই" (ময়ূখ, জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, পৃঃ ২২৪)। এখানেও আমরা জীবনানন্দেব 'শুদ্ধতর চৈতন্যের' প্রতি অনুরাগ দেখতে পাই, এবং ধীবেসুস্থে একটি পরিমার্জিত বক্তব্যেব গভীরতায় তাঁকে পৌছোতে দেখি। কিংবা এই পংক্তি কয়টি : "আপনার বাবা ও মার অসুস্থতার কথা শুনে চিন্তিত হয়েছি ; আশা করি তাঁরা এখন ভাল আছেন। খুকু হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে কলকাতায় যাবে। তমলুকে এবার খুব বন্যা হয়েছে ; আরো নানারকম গোলমাল ; খুকুর মুখেই শুনতে পাবেন। খুকু আপনার কাছ থেকে যে ক'খানা বই এনেছে তা' পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি ; ইচ্ছে ছিল

বইগুলো আরো কয়েকদিন রাখি ; কিন্তু খুকুর সঙ্গেই দিয়ে দেব" ইত্যাদি (ঐ, পৃঃ ২৩১-৩২) ।

চিঠিপত্রে কাব্যালোচনার ক্ষেত্রেও আমরা যেমন জীবনানন্দের পরিশীলিত রুচি ও মার্জিত পদবিন্যাস দেখি, ব্যক্তিগত আলাপনের ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর মার্জিত ও ধীরগতি বিন্যাস দেখতে পাই।

এখন তাঁর আত্মজীবনী ধরনের রচনায় আসা যাক। তাঁর 'আমার মা বাবা' নামক রচনাটির কথাই বলছি। এর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "আজকের পৃথিবীর জীবনবেদের তাৎপর্য মা বেশি বুঝেছিলেন, তাঁর গদ্য লেখায়, অভিভাষণে সমাজের ও নানা সমিতির কাজকর্মে লোকসমাজের সঙ্গে লেনদেনে নানারকম বই ও চিন্তার ধারার সঙ্গে পরিচয়ের পিপাসায় ভাবনা বিচারের আধুনিকতার মর্ম বুঝে দেখছিলেন যখন—তার কিছু আগেই কবিতা লেখা প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, ফলে যে মহৎ কবিতা হয় তো তিনি লিখে যেতে পারতেন, তাঁর রচিত কাব্যের ভেতর অনেক জায়গাতেই প্রায় আভাস আছে—কিন্তু কোন জায়গাতেই সম্পূর্ণ সিদ্ধি নেই—মাঝে মাঝে কবিতার ভেতর দু'চারটে বিচ্ছিন্ন সিদ্ধিকে বাদ দিয়ে। গদ্য সন্দর্ভ রচনারও একজন সৎ সাহিত্যিকের উপাদান ছিল তাঁর মধ্যে। বাবা ও পিসেমশায়ের অবর্তমানে তিনি বরিশালের ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের কাজ করতেন। আরাধনা উপাসনা আশ্চর্য নির্ঝরের মত ধ্বনিত হয়ে—তবুও ধ্বনির অতীত অর্থগৌরবের দিকে আমাদের মর্ম ফিরিয়ে রাখত, কোথাও ঠেকতেন না, তাল কেটে যেত না—পুনরুক্তি ছিল না, কিন্তু যে সাহিত্যিক ও কবির গরিমা তাঁর প্রাপ্য ছিল, সেটাকে অন্তর্দমিত করে রাখলেন তিনি—প্রকাশ্য কোনো পুরস্কার নিতে গেলেন না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখায় ও নিজের অলিখিত অনুভাবনা, বিতর্ক ও ধ্যানের ভিতর কেমন যেন আত্মনির্বাণ খুঁজে পেলেন আত্মশুদ্ধির জন্য" (উত্তরসূরী, জীবনানন্দ স্মরণে, ১৩৬১, পৃঃ ১২) ।

উপর্যুক্ত রচনাংশেও আমরা তাঁর ধীরস্থির পদবিন্যাসের মাধ্যমে তাঁর জননীর একটি রূপ দেখতে পাই। এখানেও জীবনানন্দের পরিশীলিত মানসিকতা স্পষ্ট। জননীর রেখাচিত্র অঙ্কনে তিনি মূল কয়েকটি আঁচড় টেনেছেন। উচ্ছ্বাসের বদলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আলোকসম্পাতই সার্থক চরিত্র-চিত্রণে সাহায্য করেছে।

আলোচ্য তিন ধরনের গদ্য রচনাতেই জীবনানন্দের যে বাগ্ভঙ্গি আমরা দেখতে পাই তার থেকে তাঁর পরিশীলিত মনন, বুদ্ধি, বোধি তথা হৃদয়ের

সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কোথাও বাহুল্য নেই, অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস বা অহমিকার প্রকাশ ঘটে নি। একটি বক্তব্যকে নানা দিক থেকে দেখে তিনি তার বিচার বিবেচনা করেছেন এবং যতক্ষণ না সেটি হীরের মত ঝকঝকে হয়ে উঠেছে ততক্ষণ তার ওপর সূক্ষ্ম আঘাত হেনেছেন। বস্তুত যুক্তিবাদী ঝরঝরে ভঙ্গি তাঁর চিন্তার ঋজুতাই প্রমাণ করে, এ ব্যাপারে তিনি আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট গদ্যকারদের সগোত্র, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। ওয়ার্ড সাহেব বলেছেন, Every writer has a style of some sort, good or bad ; it is the stamp of the writer's mind and personality. Sloppy-minded people will write sloppy prose ; precise clear-minded people will write clear and precise prose, expressing exactly what they mean with simplicity and brevity (A. C. Ward, *Twentieth Century Prose*, ভূমিকা)। জীবনানন্দের ভঙ্গিও ঢিলেঢালা (sloppy) নয়, সেইজন্যে তিনি অল্প লিখলেও যেটুকু গদ্য লিখেছেন তাতে স্মিত মাধুর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এই পরিমিতিবোধ জীবনানন্দ পেলেন কোথা থেকে ? কাব্যে উত্তররৈবিক বাগ্‌ভঙ্গি তাঁর চিত্রকল্পের নবীনত্বে, ইতিহাসচেতনা কিংবা মহাবিশ্ব-অনুভাবনায় প্রকাশ পেলেও, গদ্যে রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত ব্যক্তিগত, উজ্জ্বল, মুখর ভাষার দীপ্তি এড়িয়ে তিনি সেই ঐতিহ্যগত স্মিত বাগ্‌ধারা কেন বা কীভাবে গ্রহণ করলেন ? এর উত্তর হয়ত আছে আমাদের উপরিউদ্ধৃত আত্মজৈবনিক রচনাংশটিতেই। তিনি যে এক মার্জিত ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মেছিলেন, সেখানকার মিতস্বভাব পরিবেশে লালিতপালিত হয়েছিলেন এবং তাঁর কবি-জননীর বিশিষ্ট প্রভাব তাঁর ওপর কাজ করেছে তা আমরা দেখতে পাই। ব্রাহ্মসাধনার যুক্তিবাদিতার মতই তাঁর গদ্যরচনার অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসবিহীন যৌক্তিক বিন্যাস।

এই পরিমিতিবোধ তাঁর জীবনের অবদান সন্দেহ নেই, আবার এই গুণ তিনি তাঁর কাব্যভঙ্গি থেকেও পেয়েছিলেন। এই বোধ জীবন থেকে কাব্যের মাধ্যমে তাঁর গদ্যরচনাতেও সঞ্চারিত হয়েছে বললে ভুল হয় না। সে ব্যাপারে কবিতায় তাঁকে সাহায্য করেছে তাঁর প্রিয় পয়ার। বিতর্কের অবকাশ থাকলেও আমরা মনে করি বাংলায় মুখের ভাষার কাছাকাছি হচ্ছে পয়ার ছন্দ, ছড়ার ছন্দ নয়। লিখিত গদ্যের বহু পংক্তিকে আমরা পয়ারের পর্বে ভাগ করতে পারি,

যেমন পয়ারে লিখিত অনেক কবিতার পংক্তি আমাদের গন্ত বলে গ্রহণ করতেও কষ্ট হয় না। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১. মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে—সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে-আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে···(শকুন)

২. ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি ; (পাখিরা)

৩. দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
(মৃত্যুর আগে)

৪. সবিতা, মানুষ জন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে···(সবিতা)

এই পয়াব ছন্দ থেকে আব এক পা গেলে তাঁর গন্তকাব্যভঙ্গি :

১. কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা (ঘাস)

২. সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলই আমার দেখা হয়
(বিড়াল)

উল্লিখিত সব কটি কবিতাতেই আমরা বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে গন্তের কাঠামো খুঁজে পাই—সেই ধীর স্থির পদসঞ্চাব, একটি বক্তব্যের দিকে অভিযান। কবিতায় অতিরিক্ত যে সম্পদ তা বিবল চিত্রকল্পেব এবং আশ্চর্য একটি সুরের—না হলে তাঁর গন্ত ও কবিতায় বিচরণ খুবই অনায়াস মনে হয়। বস্তুত জীবনানন্দের ক্ষেত্রে গন্ত-পন্তের ভেদাভেদ মাত্র একটি পর্দাবই আড়াল মনে হয়। তাঁর সম্পর্কেই যেন বলা চলে, 'Prose is the literary medium for thought and meditation, poetry of emotion and sensation' (Ward, ঐ)। এই ভেদাভেদ মুছে দিতে সাহায্য করেছে জীবনানন্দের দীর্ঘপর্বের পয়ার যা তাঁর গন্তকবিতার অনুপূরক। তাঁর গন্তভঙ্গি এই উক্তিকেই সমর্থন করে, 'prose is best when it is most truly prosaic, when it does not encroach upon the realm of verse rhythm and artifice' (G.H. Vallins, Rhythm in Prose and Verse. In *The Best English*, ১৯৭৩, পৃঃ ১৩৪)। কবিতায় যেখানে জীবনানন্দ নিজেকে

চিত্রে, স্বরে, ক্যানভাসের বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে দেন, গন্থে সেখানে তিনি তন্ময় তথা যুক্তিবাদী বাচনে বার বার নিজেকে, নিজের কবিতাকে বিশ্লেষণ করেন— একটি ভঙ্গি স্বভাবতই অন্যটির পরিপূরক। প্রকরণের দিক থেকে পয়ারই এই দুই বাগ্‌ভঙ্গিকে কাছাকাছি এনেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর যৌক্তিক বিন্যাস তাঁর গদ্যকে এমন এক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না— সেটা সম্ভবত আমরা কোন মাধ্যমে সেই মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য না খুঁজে অন্য মাধ্যমের গুণাবলীর বাহুল্য দেখে থমকে দাঁড়াই বলেই সম্ভব হয়েছে। জীবনানন্দের গদ্যভঙ্গি নিম্নলিখিত মানদণ্ডে অবশ্যই উত্তীর্ণ এবং মনোযোগী পাঠের প্রত্যাশী: "What is produced by Style or Art in prose may be superficially beautiful in sound and sensation, but it cannot be considered good prose unless it is meaningful, conveying its idea or information intelligibly and in an attention-compelling manner" (Ward, ঐ)।

চিঠিপত্রে জীবনানন্দ

বাংলা সাহিত্যে কবিপত্রের একটি স্থান ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার কথা। মধুসূদনের চিঠিপত্রে তাঁর উত্তাল যৌবনের আন্দোলন পরিস্ফুট, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি তাঁর কাব্যচিন্তার প্রামাণ্য দলিলও বটে। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য ত একজন শিল্পীর সারাজীবনের একমাত্র সৃষ্টিই হতে পারতো—এত বিশাল তার পরিধি, এত বিচিত্র চিন্তার সমাহার সেখানে। চিন্তার সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর যাতায়াত সেখানে, এবং চারিত্রের মতই মানুষ রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যাপ্তি তার কমনীয়তা, মাধুর্যসহ সেই চিঠিগুলির পিছনে অধিষ্ঠিত মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির এক বৈশিষ্ট্য সেই সব চিঠিগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে—নারীসুলভ খুঁটিনাটির খোঁজ, পরিহাসরস, কথোপকথনের উষ্ণ মেজাজ এবং সর্বোপরি একটা শালীন ব্রাহ্ম চেতনায় তারা সংযত। জীবনানন্দের চিঠিপত্র সে তুলনায় খুবই স্বল্পপরিমাণ এবং সংযমের বাঁধুনিতে বুঝি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে যায়।

জীবনানন্দের চিঠিপত্র ইতস্তত পত্রপত্রিকায় বিক্ষিপ্ত। জানি না তিনি কত চিঠি লিখেছিলেন। তবে একথা ঠিকই সবগুলি পাওয়া যায়নি।[১] সংগ্রথিত আকারে সব কটি থাকলে তাঁর জীবন সম্পর্কে আরো অনেক কথাই হয়ত জানা যেত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই সর্তকবাণী—মৃতের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না থাকায় তাঁর প্রতি বক্রোক্তি অসমীচীন [২]—হয়ত কেউই শুনতেন না। আমরা জীবনানন্দের জীবনের ওপর কোন আলোকসম্পাত করছি না এখানে, কবির বা যে কোন শিল্পীর শিল্পকর্মই তাঁর জীবন একথা মনে রেখে আমরা জীবনানন্দের চিঠিপত্রগুলি পত্রসাহিত্য হিসেবেই বিচার করতে চাইছি। তুলনামূলক বিচারে অবশ্যই জীবনের কথা এবং তাঁর কবিতার কথাও আসবে।

জীবনানন্দের যে কটি চিঠি পাওয়া যায় এবং আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত, শ্রেণী বিভাগ করে তাদের কয়েকটি ছকে ফেলা যায়: ১. ব্যক্তিগত চিঠি—যাতে প্রাপক-প্রেরক দু-পক্ষেরই চাওয়া-পাওয়ার কথা স্পষ্ট, ২. যে-চিঠিতে কবির কাব্যচিন্তা, নিজের শিল্পকর্ম ইত্যাদির কথা ফুটে উঠেছে, ৩. যে-চিঠিতে কবির মাঝামাঝি—অর্থাৎ দুই ধরনের বক্তব্যই—একত্রিত।

ব্যক্তিগত চিঠিগুলির মধ্যে কতকগুলি বন্ধুস্থানীয় কারুর কারুর কাছে লেখা। কতকগুলি প্রথমে অপরিচিত, পরে আত্মীয় কারুর কাছে লেখা। এই চিঠিগুলিতে ব্যক্তিগত আলাপনে মানুষ জীবনানন্দের পরিশীলিত মনন চোখে পড়বে : "তোমার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা কত গভীর তা তুমিই জান ; মাঝে মাঝে আমরা দুজনে সেটা একটু আধটু ঘুলিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু অন্তঃশীল অমলতা ঠিকই আছে। স্বভাবতই মন তোমার দিকে আমাকে টানে—দূরে থাকলে বেশি টানে। কাছে এসে পড়লে তোমার জিজ্ঞাসা ও দৌরাত্ম্যের জের—মাঝে মাঝে সেটা রূঢ়ও বটে—সেই জের দেখে টের পাই সাংসারিক সফলতা ও গল্পকথকের মালমশলায় তুমি সত্যিই বেশ দুর্বার, আজকাল তো দস্তুরমত সার্থক··· যত দিন কেটে যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি হৃদয় দিয়ে সাহিত্য শিল্প তৈরি করে··· ।[৩]

উল্লিখিত অংশে বিশিষ্ট বিশেষণ ব্যবহারেও তিনি যে নিপুণ ছিলেন (অন্তঃশীল অমলতা) তা বোঝা যায়। তা ছাড়া কথাশিল্পীর শিল্পোকরণ তথা সাহিত্যের শিল্পায়নের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শোনা যায়।

আর একটি চিঠিতে স্মৃতিচারণের সঙ্গে সঙ্গে আছে তাঁর অপূর্ণ ও অপূরণীয় ইচ্ছার কথা : "তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতে আমার বরিশালের সেই সব দিনের কথা মনে পড়ছে যখন তোমাদের একটার পর একটা চিঠি হাতে আসত, উত্তর দিতাম, প্রত্যাশা করতাম। তখনকার দিনের বরিশাল আজকের চেয়ে প্রায় সব দিক দিয়েই ভালো ছিল।·· সব ছেড়ে দিয়ে শুধু লিখে যেতে পারলে ভালো হত। সেটা অনেকদিন থেকেই সম্ভব হচ্ছে না।[৪]

উপরিউদ্ধৃত চিঠি দুখানিই কবির এক বন্ধু-সাহিত্যিকের কাছে লিখিত। নীচের উদ্ধৃতাংশ আত্মীয়স্থানীয় এক মহিলার প্রতি : "কলকাতায় গেলে আপনাদের library দেখবার খুব ইচ্ছা, আমি বইয়ের খুব ভক্ত, অর্থাৎ মনের মতন বইয়ের ; তা যে শুধু সাহিত্য হবে এমন কোনো কথা নেই।···বইয়ের নেশা কাটানো মুস্কিল।···নানারকমের শারদীয় সংখ্যায় লেখা ছড়িয়ে এখন একটু বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আবার যখন লেখার দিকে টান ফিরে আসবে আপনাকে পাঠাব।·· অধ্যাপনা জিনিষটা কোনো দিনই আমার তেমন ভালো লাগেনি।"[৫] ব্যক্তিগত কথার ফাঁকেও আমরা কবির মনোভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হই (পুস্তকপ্রীতি, অধ্যাপনায় অনীহা) এবং কাব্যরচনায় আন্তরবেগের অপরিহার্যতা সম্পর্কে তাঁর উক্তি শুনি (লেখার দিকে টান)।

উক্ত প্রাপককেই তিনি আবার লেখেন . "কলকাতায় গিয়ে এবার নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ হল ; সাহিত্যিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি নানারূপ নতুন সম্ভাবনার ইসারা পাওয়া গেল। এর আগে মাঝে মাঝে আমি ২।৪ দিনের জন্য কলকাতায় যেতাম ; কিন্তু নানাদিক দিয়ে কলকাতার সামাজিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য ব্যাপারে যে এরকম সজীব পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ্য করবার সুযোগ পাই নি। বরাবরই আমার আত্মবৃত্তি ও জীবিকা নিয়ে কলকাতায় থাকবার ইচ্ছা।"[৬]

উপরের চিঠিগুলিতে আমরা একজন এমন বইপাগল লোকের দেখা পাচ্ছি যে সাহিত্যকেই জীবনের অবলম্বন করতে পারলে বেঁচে যায়। সেই পত্রলেখক কবিকে দুটি শহর আচ্ছন্ন করে রেখেছে—একটি ঔপনিবেশিক গ্রামীণ আধাশহর যার চারিদিকে জলের বিস্তার আর সবুজ শ্যামল, সেই বরিশাল, আর একটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নগরী কলকাতা। প্রকৃত সাহিত্যপ্রেমীর কাছে আমাদের কলেজ-ছাত্রের জন্যে সূচীনির্দিষ্ট সাহিত্যালোচনা যে কি বিড়ম্বনা তাবও ইংগিত রেখেছেন কবি। ঝরঝরে, নিরুচ্ছ্বাস, জীবনে পোড়-খাওয়া এক বয়স্কের রচনা বলে এগুলিকে চিনে নিতে ভুল হয় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চিঠিপত্রের শীর্ষে আছে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জীবনানন্দের চিঠি। ঐতিহ্য ও অভিভাবকত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি নিজের সাহিত্যাদর্শের আলোচনা করেছেন। সাহিত্যাদর্শ ছাড়িয়ে এখানে তিনি সৌন্দর্যদর্শনেরও ব্যাখ্যা করেছেন। Serenity-র আদর্শ কবিতার একমাত্র লক্ষণ বলে তিনি স্বীকার করেন নি, বিভিন্ন mood-এর কবিতাও ভাল কবিতা হতে পারে তিনি বলেছেন। তাঁর কথায় : "সকল বৈচিত্র্যের মত সুরবৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভেতর। ··রচনার ভেতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তা হোলে তার ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলাও করা যেতে পারে। শান্তি বা serenity-র সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্ফল হয়ে যায়।"[৭] এই শ্রেণীর আর কয়েকটি চিঠিতে তাঁর কাব্যচিন্তা, বিশেষত নিজের কাব্যকৃতির সাজঘরের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন কবি—এদের কয়েকটি প্রবন্ধাকারে তাঁর 'কবিতার কথা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৮] তাঁর ভাষায়, "· ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয় ; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। কোনো কোনো সময় কাঠামোটি, এমন কি প্রায় সম্পূর্ণ কবিতাটিও খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী

হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপর—প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে—চারদিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায়: পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এরকম অঙ্গাঙ্গিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে⋯আমার কাব্যপ্রেরণার উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতর রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়ই যে 'ধূসর' তা হয়তো নয়।"[৯] আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "বই পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায় বটে কিন্তু প্রজ্ঞা শেষ পর্যন্ত শুধু মাত্র ও-রকম বিদ্যা-সাপেক্ষ নয়, অন্য রকম জিনিষ; প্রবীণ চেতনায়ই বিচরণ করতে চায় বেশি, আপনি নবীন, কিন্তু আমার মনে হয় আপনার সহজবোধের **সেতুসার্থকতা** হয়তো বা তার খোঁজ পেয়েছে।"[১০] আমাদের **অনুরেখিত** শব্দটিতে কবির শব্দচয়নের বিশিষ্টতা ছাড়াও, উদ্ধৃতাংশে তাঁর দার্শনিক মনের পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রজ্ঞা ও বিদ্যার পার্থক্য এই বইপাগল কবির সমকালের অনেকেরই ছিল না সেকথা গবেষণাসাপেক্ষে অনেকেই বুঝে নিতে পাবেন। আর একটি চিঠিতে তিনি সাহিত্যের অন্যান্যক্ষেত্রে বিচরণের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও কেন শুধু কবিতাকেই মুখ্য করেছেন সেকথা বলেছেন। তা ছাড়া কবিতা যে আধিজৈবিক জীবনের সাফল্য আনতে পারে না, তার একটা দার্শনিকের ভূমিকা রয়েছে এই আধুনিক মতবাদেরও প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, "এই দারুণ সংগ্রামকঠিন সময়ে নানারকম আধিজৈবিক দায়িত্ব মিটিয়ে যেটুকু সময় থাকে তাতে সাহিত্যের কোনো একরকম অভিব্যক্তি (যেমন কবিতা) নিয়েই যতদূর সম্ভব পটভূমির প্রসার ও গভীরতা বাড়ানো যায় সেই চেষ্টাই করা যেতে পারে। কিছু পরিমাণে এই জন্যই কবিতা লিখতে উৎসাহ পেয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পেয়ে লিখেছি এই কারণে যে আমার যুক্তিধর্মী মানস আধুনিক সময়ের সমস্ত সঙ্গ ও অহেতুকতার সংস্পর্শে এসে কবিমানসের দৃষ্টিউজ্জ্বলতায় হতে চেয়েছে (হয়তো হয়েছে) বলে।⋯সমাজ যত বিশুদ্ধ, বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকৃৎ হোক না কেন, প্রেম, প্রকৃতি, সৃষ্টি-প্রপঞ্চ সম্পর্কে শেষ আত্মপ্রসাদ কোনো ঐকান্তিক কবি বা মনীষীর জীবনে ঘটে কি? ঘটে নি তো আমার জীবনে।"[১১]

তৃতীয় শ্রেণীর চিঠিতে ব্যক্তিগত আলাপন ছাড়াও সাহিত্যসম্পর্কিত মতবাদ, বিশেষত প্রেরকের রচনা সম্পর্কে কথাবার্তা আছে। যেমন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যকে লিখেছেন, "'পদাবলী' পড়লাম। বেশ ভালো লাগল,⋯আপনার

পাণ্ডিত্য, মনের বিস্তৃতি ও গভীরতা এসব রচনার নানা জায়গায়ই স্পষ্ট হয়ে আছে।...বাড়ি নিয়েও বড় মুস্কিলে আছি।"[১২] অথবা, "...শারদীয়া 'পূর্বাশা'র জন্যে এই সঙ্গে একটি কবিতা পাঠালাম। ভালো করে প্রুফ দেখা দরকার। আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।"[১৩] অন্য আর একটি চিঠিতে কবিকে তিনি যোগ্য সমালোচকের মত নিজেই নিজের সমালোচক-সংস্কারক হতে বলছেন, "আপনার কবিতাটি ভাল লাগল; দু একটা জায়গা বদলে দিলে ঠিক হয়, বদলাবার ভার আপনার নিজের ওপর।"[১৪]

জীবনানন্দের নিজের কথাতেই চিঠি লেখা তাঁর কাছে প্রায় এক শিল্পকর্মের মতই ছিল, "যে সব চিঠি নেহাৎ লোকাচারের ব্যাপার তাদের উত্তর আমি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেই। কিন্তু যেগুলো মনস্পর্শিতার জন্য বিখ্যাত—যেমন আপনারটি—সে সবের উত্তর দিতে মাঝে মাঝে আমার খুব দেরি হয়ে যায়।"[১৫] অথবা "সংসারের মোটা লেনদেনের থেকে যে চিঠি যত দূরে সে চিঠি তত—সৎ কি অসৎ বলব না—শুদ্ধতর চৈতন্যের জিনিষ। এ সব চিঠির উত্তর দিতে অল্প-বিস্তর দেরি হবেই।"[১৬] উদ্ধৃতাংশ দুটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় চিঠি লেখার ব্যাপারেও তিনি কত যত্নবান ছিলেন, কবিতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি কত দার্শনিক প্রজ্ঞার স্তরে উঠে যেতে পারতেন। কবিতায় যেমন ভালো করে প্রুফ দেখার দরকার বোধ করতেন, বা কবিতায় শব্দবদলের ভার কবিকেই গ্রহণ করতে বলতেন, ঠিক সেই নিখুঁত-নিষ্ঠা তাঁর চিঠি লেখার প্রতিও ছিল। জীবনানন্দের চিঠি এদিক থেকে কীটসের চিঠির মতই—দুই কবিরই মনোভঙ্গি তাঁদের চিঠি থেকে বোঝা যায়।[১৭] কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর দুই কবিরই চিঠিতে পাওয়া যাবে।[১৮] কীটসের মতই জীবনানন্দ তাঁর বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে বোধ হয়।[১৯] সময়ের বিরাট ব্যবধান থাকলেও দুই কবিরই ধ্যানজ্ঞান ছিল কবিতা, এবং জীবনানন্দের চিঠি সীমিত-সংখ্যক বলে তাঁর কাব্যসম্পর্কিত বক্তব্যই সেখানে মুখ্য বলে চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের চিঠির ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য জীবনানন্দের চিঠিতে আশা করা যায় না। জীবনানন্দের চিঠির সেই বিপুলতা নেই কারণ সেরকম সামাজিক যোগাযোগ ছিল না তাঁর। ফলত, তিনি স্বল্পায়তনে নিজেই নিজের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, অন্তরের থেকে উচ্চারণ করতে পেরেছেন কাব্যসম্পর্কিত প্রিয় বক্তব্য-গুলিকে। জীবনানন্দের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব তথা ব্রাহ্ম সংস্কার তাঁর সব রচনার মতই চিঠিপত্রকেও প্রভাবিত করেছিল মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সংস্কার

রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ যোগাযোগকে ব্যাহত করতে পারে নি, তাঁর ঔপনিষদিক ব্যাপ্তি তাঁকে বিশ্বজনীন উদারতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। জীবনানন্দ নিতান্তই এযুগের মানুষ, জীবিকার সংগ্রামে লাঞ্ছিত, ব্যক্তিশিল্পীর হীরকদ্যুতি-বিচ্ছুরণই তাই তাঁর রচনাতে চোখে পড়ে। ব্যক্তির শালীনতাবোধ ক্ষুণ্ণ করার জন্যে যে প্রতিবেশ উদ্‌গ্রীব তার প্রতি বিদ্রূপ, ঘৃণা তীব্র হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের শেষ দিকের রচনায়, তাঁর চিঠিতেও তার ছাপ আছে। দুই কবির কাব্যসম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা দুজনের পত্রাবলী সম্পর্কেও সত্য: "জীবনানন্দের কবিতায় ভাবাবেগ ও রোমান্টিকতা যে কতো সংহত তা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাশাপাশি রেখে জীবনানন্দ পড়লেই কবিতার পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন"।[২০] সে যাই হোক, জীবনানন্দের চিঠিগুলির সবচেয়ে বড় মূল্য হল এই যে সেগুলিতে তাঁর কাব্যচিন্তার কথা প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলিতেই তিনি তাঁর কবিকৃতির কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। সেগুলি বাংলা শিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অবদান।[২১]

১ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ঢাকায় থাকতেই তাঁর কাছে লেখা জীবনানন্দের আট/দশখানি চিঠি কীটদষ্ট হয়ে গিয়েছিল জানিয়েছেন' আর একজন বয়স্ক কবি জানালেন, জীবনানন্দের মৃত্যুর পর কবি সুরজিৎ দাশগুপ্ত নাকি তাঁকে লেখা জীবনানন্দের কয়েকটি বিক্ষুব্ধ চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। হতে পারে সেগুলি জীবনানন্দের শেষ দিকের লেখা যখন তিনি নানাকারণে মর্মে মর্মে পীড়িত ছিলেন। তাঁর ব্রাহ্ম সংযমই তাঁর চারিত্র্য, শেষ দিকের কবিতার বক্রোক্তি, বিক্ষুব্ধ চিত্রকল্প রবীন্দ্র চিত্রকলার বিক্ষোভের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই বিক্ষুব্ধ চিঠিগুলি—যদি থেকে থাকে—আমাদের দেখা হয় নি।

২ Cf. "Silence is a privilege of the grave, a right of the departed; let him therefore, who infringes that right by speaking publicly of, for, or against those who cannot speak for themselves, take heed that he open not his mouth with-

out a sufficient sanction..." Wordsworth, 'Letter to a friend of Robert Burns' (1816) quoted in L. Houghton, *The Life & Letters of John Keats*, লণ্ডন, ১৯৬৯, পৃ: ৫

৩ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখিত (কলকাতা, ২০. ৫. ৪৯), দ্র: জীবনানন্দস্মৃতি ময়ূখ, শীত-গ্রীষ্ম ১৩৬১, পৃ: ১২২-৩

৪ ঐ (কলকাতা, ১৩.৬.৪৯), তদেব, পৃ: ১২৪

৫ নলিনী দাশকে লিখিত (বরিশাল, ৩১.১০.৪২), তদেব, পৃ: ২৩২-৩

৬ ঐ (বরিশাল, ৮.৭.৪৩), তদেব, পৃ: ২৩৪

৭ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত (কলকাতা, ৩ পৌষ ১৩৩৭ ?) তদেব, পৃ: ২১৮

৮ সিগনেট সংস্করণ, ১৩৬২

৯ চিঠি (বরিশাল, ২৬.১২.৪৫), জীবনানন্দস্মৃতি ময়ূখ, পৃ: ২২০

১০ চিঠি (বরিশাল, ২১.১.৪৬), তদেব, পৃ: ২২৪

১১ চিঠি (বরিশাল, ২.৭.৪৬), তদেব, পৃ: ২২৮-৩০

১২ চিঠি (১৭.৫.৫৪), সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, কবি জীবনানন্দ দাশ, ২য় সং, পৃ: ১৪১

১৩ সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যকে লিখিত (৪.৯.৫৪), তদেব, পৃ: ১৪৩

১৪ অরুণ ভট্টাচার্যকে লিখিত (কলকাতা, ২৯.৭.৫০), উত্তরসূরী : জীবনানন্দ স্মরণে, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬৯, পৃ: ১৮

১৫ সূত্র ৯, পৃ: ২২৩

১৬ সূত্র ১০

১৭ Cf. S. Norman, "His (কীটসের) letters, in greater numbers and more accurate transcriptions, illuminate the poetical mind as never before..." in Lord Houghton, *op. cit.*, p.x.

১৮ Cf. A. C. Bradley, The Letters of Keats. In *Oxford Lectures on Poetry*, লণ্ডন, ১৯৬৫, পৃ: ২১০ : "...They (কীটসের চিঠি) show not a little of that general intellectual power which rarely fails to accompany poetic genius"

১৯ Cf. তদেব, "Keats, it is tolerably plain from these letters, had a clear and habitual consciousness of his genius. He never dreamed of being a minor poet"

২০ সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, কবি জীবনানন্দ দাশ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১২

২১ এই প্রসঙ্গে 'জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী' (সং দীপেনকুমার রায়), ১৯৭৮, নামক পুস্তিকাটি চোখে পড়েছে। এতে জীবনানন্দের উপর্যুক্ত পত্রগুলি-সহ মোট পঁচিশটি পত্র সংকলকের মন্তব্যসহ উৎকলিত হয়েছে। এর মধ্যে মা কুসুমকুমারী দাশ-কে ডাকনামে (মিলু) একটি পারিবারিক পত্র ছাড়াও জগদীশ ভট্টাচার্য-কে লেখা দুখানি পত্র আছে—তার থেকে শ্রীভট্টাচার্যের 'বৈজয়ন্তী' নামক মাসিকপত্রের কথা জানা যায়। তাছাড়া একটি পংক্তির যন্ত্রণা ত আজও আমাদের রয়েছে: "আজকালকার হৃদয়হীন দলাদলির দিনে আপনারা নিজের বুকের উপর হাত রেখে সাহিত্যবিচার করতে সচেষ্ট দেখে আমি প্রীত হয়েছি।"

সংকলিত আর একটি পত্রে সুকুমার রায় সম্পর্কে সিগনেট প্রেসকে কবি লিখেছেন: "আমাদের এই পৃথিবীর ভিতরেই আরো অনেক পৃথিবী রয়েছে যেন, সাধারণ চোখ দিয়ে তা খুঁজে পাওয়া যাবে এমন নয়। থাকে তা সৃষ্টিপরায়ণ মানসের ভিতর।" কায়সুল হক-কে লিখিত তিনটি পত্র সংকলিত হয়েছে। দিনেশ দাস-কে লিখিত একটি পত্রে 'অহল্যা'র সমালোচনা রয়েছে। অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তকে লিখিত চারটি ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যকে লিখিত তিনটি চিঠিতে জীবনানন্দের বিদগ্ধ কিন্তু বিক্ষুব্ধ মনের খবর পাওয়া যাবে।

গোপালচন্দ্র রায়ের 'জীবনানন্দ' নামক গ্রন্থটিতেও কবির চিঠিপত্রের সংগ্রহ রয়েছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের গদ্যরীতি

সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদক, কবি, কথাশিল্পী, প্রবন্ধকার সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের রচনা আলোচনার আগে সেই ব্যক্তিটিরই কথা মনে পড়ে। যাঁরা তাঁকে দেখেন নি তাঁরা হয়ত তাঁর রেখাচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর রচনার সাযুজ্য খুঁজতে পারেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাঁর পদবীর 'য' ফলা ব্যবহার করতেন এবং তাঁর 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার নামের দ্বিতীয় বর্ণটির দ্বিত্ব বজায় রাখতেন, কেন? আমার মনে হয়, এটা তাঁর একটা বনেদিয়ানা ছিল, একটা ক্লাসিকসের বোধ তাঁকে ঐতিহ্যসম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। কবিসভায় তাঁকে সুন্দর কাগজের পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতা পাঠ করতে দেখেছি। তাঁর হাতের লেখা ছিল সুন্দর, স্পষ্ট, গোটা-গোটা, দ্বিধাহীন, কাটাকুটিহীন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পান খেতেন সুন্দর করঙ্ক থেকে, নস্য ব্যবহার করতেন সুগন্ধ পরিমল নস্য, চোখের পাতায় দিতেন ঈষৎ সুর্মা। তাঁকে দেখতে ছিল রাজকুমারের মত, উন্নতনাসা, গৌরবর্ণ—চিরযুবা, অকৃতদার। অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও তাঁর মুখের হাসি মিলোয় নি, ঠোঁটের লালিমা কমেনি রোগযন্ত্রণাতেও।

ব্যক্তিক এই পটভূমিতেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের রচনার আলোচনা হতে পারে, হতে পারে তাঁর গদ্যরীতির আলোচনা। প্রসঙ্গত, তাঁর কবিতার কথাও উঠবে যার যথাযথ বিচার আজও হয় নি।

১৯২১ সালেই তিনি ভবিষ্যতে কবি ও সম্পাদক হবেন বলে ঠিক করে নেন এবং একটি হাতে লেখা পত্রিকা 'আরতি'-তে দুটি ভূমিকাই গ্রহণ করেন।[১] ১৯৩৫ সালে বেরোয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাগর'। ১৯৪০ সালে তিনি সহযোগী সম্পাদক (সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র) হিসেবে 'নিরুক্ত' কবিতা-ত্রৈমাসিক প্রকাশ করেন। তার অনেক আগে থেকেই বেরোত 'পূর্ব্বাশা' মাসিকপত্র (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৩২) যার জাজ্জ্বল্যমান অবস্থা ছিল পঞ্চাশের দশকেই। 'পূর্ব্বাশা' কিছুদিনের ব্যবধানের পর নবপর্যায়ে প্রকাশিত (জানুয়ারি ১৯৬৩) হতে থাকে এবং চলতে থাকে তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে পর্যন্ত। প্রকাশিত রচনাবলী ছাড়াও পুস্তকাকারে অসংগ্রথিত তাঁর বহু রচনা ঐ পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে —পাণ্ডুলিপির কথা ত বাদই দিলাম।

বিশিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক ও একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বলেই তাঁর গদ্যরচনা পরিমাণে বিপুল। এই রচনাকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি : ১. প্রবন্ধ ; ২. পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য ; ৩. উপন্যাস ও ছোটগল্প ; ৪. কিশোরোপযোগী রচনা ; ৫. চিঠিপত্র। প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর 'আধুনিক কবিতার ভূমিকা' ও 'কবি জীবনানন্দ দাশ' গ্রন্থ দুটি উল্লেখযোগ্য। শেষ গ্রন্থটিতে জীবনানন্দের কবি-স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টায় তাঁর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তিনি খুব সহজেই দার্শনিকের মত যে কোন ব্যাপারের মূলে পৌঁছোতে পারতেন। যেমন ধরুন এই কটি পংক্তি : "আমাদের যুগমানসের ভাষা প্রথম উচ্চারিত হয়েছে জীবনানন্দের কবিতায়। এ-ভাষা যদি জটিল মনে হয় তাহলে মনে করতে হবে যুগমানসই জটিল।" (কবি জীবনানন্দ দাশ, পৃঃ ১৬)। কিংবা, এই পংক্তিগুলি ('কবিতা', পূর্ব্বাশা, অগ্রহায়ণ ১৩৬১) :

"সৎ কবি সৎ ব্যক্তি—মনকে তিনি আবৃত রাখতে নারাজ। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বার-পথে মানসিক দ্বারকায় পৌঁছুতে পারলে যে কাণ্ডকীর্তি কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেয়—অহংবোধে যে পৌরুষ জাগে তাঁর চেতনায় এবং শেষটায় বিনয়বোধে যে নম্রতায় শায়িত হয় তাঁর শরীর, তার রেখাপাত করে যাওয়াই সৎ ব্যক্তির স্বরূপ, সৎ কবির কাব্য। তিনি অভিনেতা নন—এটুকু জানলেই তাঁকে সৎ ভাবা যায়।"

সমালোচক যদি কাব্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে উৎসুক হন তাহলে প্রথমত তাঁকে বিচার করতে হবে কাব্যের আন্তরিকতা। তাই কত সহজেই তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন একেবারে মূলে গিয়ে :

১. ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা পঞ্চাশের দশকের অসুস্থতা। চল্লিশের দশকে অসুস্থ যূথবদ্ধতার প্রতিক্রিয়াতেই হয়তো এর জন্ম। সমাজবিজ্ঞানীরা ঠিক বলতে পারবেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে কি না। কেউ অনেকের হয়ে বলতে পারছেন না বলেই, কবির সংখ্যাও অসম্ভব বেড়ে গেছে, যাকে সুলক্ষণ বলে হয়তো মনে করা যায় না।[২]

২. পাঠকের বিচারের জন্যেই এ-প্রশ্ন রাখা হল, দশকের চিহ্ন তুলে দিলে আলোচিত কোনো কবি সমগ্র বাংলা কবিতায় আপন স্বাক্ষর রাখতে পারবেন কিনা।[৩]

এইসব রচনা বা রচনাংশ থেকেই দেখা যায় তাঁর সমস্ত কিছুর মূলে পৌঁছোবার একটা প্রচেষ্টা ছিল, এবং তা সম্ভব হয়েছিল তিনি ঐতিহ্যাগত ও

সাম্প্রত দুই অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন বলে। ক্লাসিকসের ঋজুতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল বলে তাঁর রচনায় অতিকথনের দোষ নেই, কিন্তু নিবিড় ভালবাসার টলটলে জলের মত স্নিগ্ধতা আছে যা কবির স্নিগ্ধতা। সৌন্দর্যবোধের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তাঁর বচনাতেও সেই সৌন্দর্যবোধসঞ্জাত স্পষ্টবাচন তাই সহজেই চোখে পড়ে।

উপন্যাসের মধ্যে তাঁর শেষ দিকের উপন্যাস 'প্রবেশ প্রস্থান'-এর কথাই ধরা যাক। আত্মজীবনীমূলক এই সুবৃহৎ উপন্যাসে তিনি নিজের যুগটারই ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সুপঠিত ও সুপরিজ্ঞাত ইতিহাসচেতনা, ক্লাসিকের বোধ এর ছত্রে ছত্রে। কলকাতাব স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি বলছেন: "অবাক লাগে কলকাতার প্রমত্ত জীবনে ত্রিশ বছব বসবাস কববাব পব। লুব্ধ, গৃধ্নু, প্রতিদ্বন্দ্বী, বিলাসী মানুষের ভিড়ে আমি যে হাবিয়ে যাইনি তা বোধ হয় আমার জন্মভূমিবই গুণে। আমি সত্যিকাবেব দরিদ্র বাঙালী, সে ছোট শহব সত্যিকারেব বাংলাদেশ। কলকাতা ত বাংলাদেশ নয়। মহানগব কোনোদিনই দেশের আত্মীয় হতে পারে না। তার চবিত্র আন্তর্জাতিক।"

তাঁর বিভিন্ন বচনায় যথাযথ গদ্য ভঙ্গি দেখা যায়—সেটা তাঁব শিল্পজ্ঞানেরই পরিচায়ক। এই উপন্যাসটিতে নানা কথোপকথনেব মধ্যে দিয়ে আমরা চরিত্রগুলির বিকাশ ঘটতে দেখি, যেমন দেখি লেখকের নিজেব জীবনেবও উদ্‌ঘাটন।

তাঁর কিশোরোপযোগী 'নাবিক বাজপুত্র' ইত্যাদি নামধেয় রচনাটির কথা ছেড়ে দিলাম। 'অজানা বঙ্গকে জানো' নামক বাংলার ইতিহাস পড়লে তাঁর পঠনপাঠনেব বিস্তার দেখতে পাওয়া যায। ইয়েটস প্রসঙ্গে একজন লেখক যেমন বলেছেন, আমারও তেমনি বলতে ইচ্ছে করে: "His prose has great diversity; it is full of his varied reading and his wide intellectual curiosity; it records his tracing out a very idiosyncratic, self-educational path..."।[8] কত সহজেই লেখক পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানা নির্দেশ করেছেন, "অনেকেই হয়তো গ্রীষ্মে দার্জিলিং বেড়াতে গেছ—হিমালয় পর্বতের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছ: কিম্বা গেছ, সমুদ্রের ধারে দীঘায় বেড়াতে—দেখেছ বঙ্গোপসাগর। তা যদি গিয়ে থাকো, তাহলে মানচিত্র-বই-এর আঁকা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের উত্তর আর দক্ষিণ সীমাই শুধু ত্যাখোনি—পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ী মাটি আর সমুদ্রের জল নিজেদের চোখে দেখে এসেছ" (পৃঃ ৫)। এই গ্রন্থটি যিনি পড়বেন তিনিই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস

ছাড়াও তাবৎ সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে কি অপরিসীম ছিল তা বুঝতে পারবেন।

চিঠিপত্র সম্পর্কেও বলা যায় তাঁর পরিচ্ছন্ন রুচিশীল মনের কথা। কিছুকাল আগে 'উত্তরসূরি' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি চিঠি ছাপা হয়েছিল, যেমন ছাপা হয়েছিল 'দেশ' এর এক সাহিত্য সংখ্যায়। অপ্রকাশিত চিঠি নিশ্চয়ই অনেক আছে। লেখা মনোনীত হলে তিনি প্রত্যেক লেখককেই জানাতেন, যেমন চাক্ষুষ পরিচয়ের আগে প্রথম পর্যায়ে 'পূর্ব্বাশা' প্রকাশনের সময় আমাকেও জানিয়েছিলেন বহুবার। এখানেও সম্পাদক হিসেবে তাঁর সততা এবং সুরুচি স্পষ্ট।

মোট কথা সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের আপাতবিফল (তিনি সাহিত্য ছাড়া কোন চাকরিই করেন নি) জীবনের শিল্পমাধুর্য খোঁজা যায় তাঁর রচনাতেও। কোথাও বিন্দুমাত্র কুরুচি নেই। গদ্যে তিনি যে কোন ব্যাপারেই গভীরে যেতে চাইতেন, এবং দার্শনিকের ভঙ্গিতেই মূল বিষয়টি প্রকাশ করতেন স্বল্প কথায়। সম্পাদক হিসেবে তাঁর শিষ্টতা তাঁব জীবনের সঙ্গেই অনুস্যুত। তাঁর রচনার শিষ্টতাই আমাব আকর্ষণীয় লাগে। তাঁব প্রতিবাদের ভাষাও কত সংযত :

পৃথিবীর রূঢ় আলো মুছে দেয় সব পরিচয়,
সব ছায়া মুছে ফেলে রৌদ্রে এসে দাঁড়ায় হৃদয়।
আকুলতা নেই শুধু পড়ে আছে পৃথিবীব হাড়,
কঠিন পৃথিবী, শুধু কঠিন পৃথিবী জেগে রয়!

('পুরোনো পরিচয়', অপ্রেম ও প্রেম)

১ সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, "আমি বোধ হয় 'সকালের আকাশের মতন বয়সে'ই স্থির করে নিয়েছিলাম: কবি ও সম্পাদক হব। পাঠ্য কবিতা পড়ে নয়। পূর্বাচলের গায়ে হেলান-দেওয়া একটি শহরে জন্ম থেকে সদ্য-যৌবন পর্যন্ত বাস করে এবং বাল্যোত্তীর্ণ বয়সে একটি প্রগাঢ় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। ১৯২১-ই সম্ভবত সময়টা তখন।" এবং "প্রথম হাতে লেখা কাগজ 'আরতি'র কবি ও সম্পাদক

হয়েছিলাম ১৯২১ সনেই।" ২,

পৃঃ ২৭৫-৬)

২ 'পঞ্চাশের কয়েকজন কবি', পূর্ব্বাশা,

৩ তদেব

৪ W. B. Yeats, *Selected Prose*, Introduction, সং, A. M. Jeffares, লণ্ডন,

সুকান্ত : ঐতিহ্য ও বর্তমান

সুকান্ত বললেই আমাদের সামনে যে চিত্র প্রথমেই ফুটে ওঠে তা সহজতার। "সহজ কথা যায় না বলা সহজে" এই কথারই জের টেনে মনে হয় সুকান্ত সহজ কথা খুব সহজেই বলতে পেরেছিলেন। 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়', 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' এই সব উক্তির সহজ প্রাধান্য অনস্বীকার্য। তিনি ভাষাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের। তাঁর জীবিতকাল মাত্র একুশ বছরের (১৬ আগস্ট ১৯২৬—১২ মে ১৯৪৭)। স্বাধীনতার প্রাক্কালে সেই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিক্ষোভের কালে তাঁর জন্ম এবং কাব্যস্ফুরণের ঋতু। তিরিশের কবিরা এই সময়েই ববীন্দ্ররীতি অস্বীকারের মাধ্যমে নতুন রীতির চর্চা করছেন, কবিতায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসিকতা আরোপ করছেন।

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় অনতিপূর্বের অস্বীকৃতির ছায়া পড়ে অনতিপরের রচনায়। সেই কারণেই সম্ভবত সুকান্ত নিকট অতীতের সুললিত রচনারীতি অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথের সহজ সুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সামাজিক আবেদনও সম্ভবত তাঁকে এই সহজ সুর গ্রহণ করতে উদ্বোধিত করেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে তাঁর আধুনিকতার দীক্ষা রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তির মাধ্যমেই ঘটেছে। তিনি একজন বিপ্লবী কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বা শুধু শিল্পপ্রাণ মনে করেন নি, প্রকৃত বিপ্লবীর মত সেখানকার যা শিক্ষণীয় তা গ্রহণ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের পতনের সময়, যুদ্ধের দামামা যখন বাজছে, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যখন সাবা দেশে, তখন তিনি সেই বিশাল মানবিকতা, সেই রবীন্দ্রনাথের, দিকে মুখ ফিবিয়েছেন। সেকারণেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন :

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।

. ...

যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে

এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার প্রাণের দিকে দিকে।

(রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

কিংবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের মিলটনের পুনর্জন্মের আহ্বানের মত এই কটি পংক্তি :

আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ,
আর একবাব জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।
হতাশায় স্তব্ধবাক্য ; ভাষা চাই আমরা নির্বাক,
পাঠাব মৈত্রীর বাণী সারা পৃথিবীকে জানি ফেব।

(পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে)

কিংবা,

আরবার ফিরে এল বাইশে শ্রাবণ।
আজ বর্ষশেষ হে অতীত,
কোন সম্ভাষণ
জানাব অলক্ষ্য পানে ?
ব্যথাক্ষুব্ধ গানে
ঝবাব শ্রাবণ বরিষণ (প্রথম বার্ষিকী)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকলেও একথা সত্যিই যে রবীন্দ্রনাথ ও সুকান্তর জগৎ আলাদা, কাব্যবিষয়ও আলাদা। সুকান্ত তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে মানুষের বঞ্চনার কথাই প্রধানত বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘায়ু জীবনে নিখিল মানবের নানা ভাবেব বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের মিলনেব সেতু এই মানুষ, মানুষের বেদনার চিন্তাই সুকান্তকে রবীন্দ্রনাথেব কাছে টেনে নিয়ে গেছে।

আমরা শুনেছি সুকান্ত সর্বক্ষণের পার্টিকর্মী ছিলেন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে তাঁর অনেক সময় কাটতো। তাঁব কবিতায় তথাকথিত প্রসাদগুণের তিনি পরোয়া করেন নি। তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষাই হয়তো তাঁকে সোজাসুজি কথা বলার প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাঁর কোন ছলনা (প্রিটেনশন) ছিল না, তিনি চাঁদ নিয়ে কবিতা লিখলেন, দিনেশ দাস লিখলেন সেই প্রবাদপ্রতিম কবিতা— 'চাঁদের শতক আজ নহে তো, এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে'।

বিষ্ণু দে তারই অনুরণনে সংযোজন করলেন তাঁর ভাষ্য :

আপাতত নেই শিরে বোমার ফ্যাসাদ

অভাবেও আছি বেশ স্বাস্থ্যে,
বর্গীর দলে ভেড়ে যত প্রভুপাদ,
ঠগেরা বেনেরা পাতে চশমের ফাঁদ।
স্বার্থ ছিটায় মুখে মৃত্যুর স্বাদ,
চাঁদের উপমা তাই কাস্তে।

এই বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে স্বদেশের সামাজিক চরিত্র ও তার মূল্যবোধ পরিবর্তনের অভ্রান্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই সময়ে বাংলা কাব্যে জনচেতনার প্রতিফলন ঘটতে থাকে অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের কবিতায়। চল্লিশ দশকের গোড়াতে তার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। একদিকে ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধ এবং অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন। বাংলা কবিতার সেটা ছিল সবচেয়ে স্মরণীয় কাল। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি সাম্রাজ্যলোভী পশ্চিমী সভ্যতার বিরুদ্ধে তিরস্কারবাণী উচ্চারণ করে গেলেন তাঁর 'সভ্যতার সংকটে'। 'ঐকতান' কবিতায় তিনি জানিয়ে গেলেন তাঁর সুরের অপূর্ণতার কথা।

আমরা মনে করতে পারি সুকান্তই কবির প্রতীক্ষিত সেই অজ্ঞাত জনের নির্বাক মনের কবি। সুকান্তর কবিতার গোটাটাই গণমুক্তির চেতনায় চঞ্চল; মন্বন্তর ও বিশ্বযুদ্ধের ছায়ায় এই কবির চেতনার উন্মেষ ও জাগরণ। সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত এই কিশোর কবির চেতনায় ছিল জীবনের পূর্ণতার দীপ্ত মানসিকতা। স্বল্পায়ু জীবনেও কবি হিসেবে তিনি কৃতিত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিণতির সুস্পষ্ট সংকেতে। স্বদেশের পরাধীনতার বেদনায় তাঁর প্রতিটি কবিতা অনুরণিত। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজের শোষণের বিরুদ্ধে রেখে গেছেন প্রতিবাদ। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন বঞ্চিত মানুষের বেদনার কথা, সেই বঞ্চিত উপেক্ষিত জীবনের কাছে এই সত্য প্রতীয়মান হয়—ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

প্রতীকে চিত্রকল্পে কখনো বা সরব উচ্চারণে সুকান্ত চল্লিশের দশকের বাংলা কাব্যে একটা 'ফেনোমেনান'; তাঁকে বাদ দিয়ে সেদিনের গণমুক্তির ব্যাপক

বিশাল আন্দোলনের সার্থকতার কথা অচিন্তনীয়। তিনি তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাসের কথা শিল্পসম্মতভাবে বলতে পেরেছিলেন :

তাইতো অবাক আমি, দেখি যত অশথ চারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ ;
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে।

কিংবা,

ছোট ছোট চারাগাছ
রসহীন খাদ্যহীন কার্নিশের ধারে
বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে।

এ সমস্তই প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ধারার বিশিষ্ট প্রকাশ। দেশ স্বাধীন হবার পরও সেই ধারা ম্লান হয় নি। কেন না কবিতার অন্বিষ্ট মানুষের মুক্তি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ সেই মুক্তির একটি অধ্যায়। সমাজকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করতে হলে মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির দিকেই তাকে যেতে হবে। বিষ্ণু দে তাঁব ১৫ই আগষ্ট কবিতায় তার ইঙ্গিত দেন :

কলকাতার ঐক্যতান
খুলে দেয় রাত্রিশেষে সকালের প্রখব আশ্বাস,
অমর হিম্মৎ,
দুর্জয় শপথ
দেশব্যাপী ইমারৎ রাত্রিদিন স্বাধীন সমাজ সচ্ছল আকাশ
সাগরসঙ্গমে দিনভোর বিনিদ্র নির্মাণ।

সেই দিনভোর বিনিদ্র নির্মাণই প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা। কবিতা সেই নির্মাণেরই ডাক দেয়। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে এক মুঠো ভাতই একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত। সুতরাং আমাদের কবিতার দৃষ্টি সেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত মানুষের দিকে সতত জাগ্রত থাকবে এ আশা করা অযৌক্তিক নয়। তবে কবিতা তো শব্দশিল্প, তার আবেদন পড়ামাত্র ফুরিয়ে যায় না। মানুষের অন্তরে তার নিরন্তর প্রতিধ্বনি যুগ থেকে যুগান্তরে চলতে থাকে। সে শ্লোগান নয়, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কাজে তার কোনো আত্মসমর্পণ নয়, মানুষের জন্যই তার শিল্পের সৃষ্টি এবং তার স্ফুরণ। পৃথিবীর সব রণ-রক্ত-সফলতারই পশ্চাদপটে রয়েছে অপরাজেয় মানুষ। সেই মানুষের মুক্তির জন্য বন্দেমাতরম্-এর যুগ থেকে আজ সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগ পর্যন্ত

বাংলা কবিতার একটি উজ্জ্বল ধারা তার স্বাক্ষর অম্লান রাখতে পেরেছে, এ গৌরব বাংলা সাহিত্যের এবং তার সৃষ্টিশীল কবিদের।

অনায়াসেই বহু মেলোড্রামাটিক পদ লিখতে পারতেন কবি কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি ও রাজনীতির তীক্ষ্ণতা এবং রাজনৈতিক কবিতায় সোজাসুজি বক্তব্যই তো কাম্য, যেমন,

আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে
আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে। (মণিপুর)

তাঁর কোন প্রিটেনশন ছিল না বলেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও মহামানবকে আহ্বান জানাতে দ্বিধা করেন নি :

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার,
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার। (বোধন)

কিংবা 'মহাত্মাজীর প্রতি' কবিতা লিখতেও দ্বিধা করেন নি :

চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজি।

কিংবা, 'মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি'। আবার রয়েছে সরাসরি এই সব কবিতাও :

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত ধ্বংসস্তূপ পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমাব দেহের রক্তে নতুন শিশুকে

করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস ॥ (ছাড়পত্র)

আজকের দিনে তাঁর কোন কোন কবিতা tour de force বলে মনে হলেও মানবচিন্তাপরায়ণ সুকান্তর নিশ্চয়ই কোন দ্বিধা ছিল না তাঁর রচনা সম্পর্কে। নিপীড়িত মানুষের দুঃখই তাঁকে আচ্ছন্ন করে ছিল, তবে তিনি তার মধ্যে হতাশায় ও মন্ময় বিলাসে নিমজ্জিত না হয়ে উত্তরণের চেষ্টা করেছেন, অশ্বত্থের চারাগাছ দেখে তাঁর মনে তাই ধ্বনিত হয়েছে :

মনে হয় এই সব অশ্বত্থ শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম,
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উঠতে পারে যে, কম বয়সের—বিশেষত সুকান্ত যখন অল্প বয়সেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন—একটা ধর্মই হল আত্ম-অনুরণন, অকারণ বিক্ষোভ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনায় এমন আত্মমুখীনতা ছিল যতদিন না তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর সমাজে মিশে যান। সুকান্ত অল্প বয়স থেকে মাতৃস্নেহবঞ্চিত হওয়ার ফলে হয়ত তাঁর মধ্যেও একটা অনিকেত বিচ্ছিন্ন মনোভাব গড়ে ওঠে। আমরা দেখেছি, এই মনোভাব থেকে সুরু হলেও তিনি আত্ম-অনুরণনটাকে এক বৃহত্তর মানবিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেছেন। হয়ত রাজনীতিই তাঁকে সেই বৃহত্তর জগতে নিয়ে গেছে। তাঁর কবিতার প্রতিবাদ ক্রমশই নিপীড়িতদের প্রতিবাদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য এর ক্রমবিকাশ দেখার আগেই কবি লোকান্তরিত হয়েছেন। আত্মঅনুবর্তন থেকে মানবমুখীনতায় উত্তরণের মধ্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই আমরা।

আজকের দিনে সুকান্ত বিচার করতে বসে কতকগুলি কথা স্বভাবতই মনে পড়ে যায়। আজকের বহু কবিতাই শব্দভারজর্জর, অর্থবিবিক্ত, সম্পাদক-মুখাপেক্ষী—নেহাতই ব্যক্তিগত কণ্ডূয়ন। আমাদের ভাল লাগে মিষ্টি পংক্তি, হঠাৎ একটি চিত্রকল্প, কিছু অসংলগ্নতা, ছন্দভাঙা অছন্দিত কবিতা। আমাদের সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে এরকম অসংলগ্নতা। সেই সব কবিতায় অনেক সময়ই যৌনচারিতার অস্বাভাবিক এবং অনৃত নাটকীয় উচ্চারণ দেখা যায়। এই দেখেই—এই নাটকীয় ঢং দেখে যদি আমরা চমৎকৃত হই, তাহলে সুকান্তকে

নাটকীয় বা ভাবাবেগপূর্ণ বলে ছুঁড়ে ফেলি কী করে? ঘরে বসে মনে মনে কিংবা ছোট্ট আসরে বা নিজেদের পূর্বআয়োজিত কবিতার আসরে পঠিত কবিতাই সত্য, আর স্কুল কলেজে আপিসে কাছারিতে সাধারণ ছাত্র মানুষ কর্তৃক আবেগভরা কণ্ঠে সুকান্তর কবিতার উচ্চারণ সত্য নয়—একটা ঠিক আর একটা ঠিক নয় এ কে বলবে? তবে একথা ঠিকই সুকান্তর এক বৃহৎ পাঠক-ও-শ্রোতৃসমাজ আছে কারণ সুকান্তর ভাষা আমাদের তৃতীয় জগতের বৃহত্তর হ্যাভ-নটদেরই ভাষা। স্বভাবতই সে ভাষা শুনে হ্যাভ-নটরা উদ্দীপিত হন।

বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের আগে থেকেই একটা বস্তুনিষ্ঠ ধারা বহমান ছিল। রামায়ণগান, মঙ্গলকাব্য পাঠ এবং উনিশ শতকে ঈশ্বর গুপ্তের সামাজিক কবিতা ও পরবর্তীকালে দেশাত্মবোধক রচনার মাধ্যমে সেই ধারা চলে আসছিল। এই শতকে নজরুল, শেষ বয়সের রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাই বহন করছিলেন। দেশাত্মবোধ যেমন নিপীড়িত জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে রাজনীতির আশ্রয় নেয়, কবিতাও তেমনি দেশাত্মবোধের ধারা বেয়ে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে উচ্চারিত হচ্ছে। সুকান্ত সেই ধারারই কবি। এই কবিতার উচ্চারণ ঘটেছে নিগ্রোদের মধ্যে, অন্যান্য দেশের নিপীড়িত কবিদের ভাষায়—আমাদের সৌভাগ্য অন্যান্য কয়েকজন কবির সঙ্গে এদিকে সুকান্ত একটি উজ্জ্বল নাম হয়ে রইলেন। তাঁর সুর প্রতিবাদের সুর :

জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ
শুরু করো প্রতিরোধ জনযুদ্ধ
জনগণ শক্তির ক্ষয় নেই
ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই। (জনযুদ্ধের গান)

কিংবা,

হে সাথী আজকে রক্তিম দিন গোনা—
ব্যর্থ নয় তো, বিপুল সম্ভাবনা—
দিকে দিকে, উদ্‌যাপন করছে লগ্ন
পৃথিবী সূর্য-তপস্যাতেই মগ্ন।
বন্ধু, আজকে দোদুল্যমান পৃথ্বী,
আমরা গঠন করব নতুন ভিত্তি ;
তারই সূত্রপাতকে করেছি সাধন
হে সাথী, আজকে রক্তিম অভিবাদন। (অভিবাদন)

বিষ্ণু দে সুকান্তর কবিতায় প্রতিশ্রুতি নয়, একেবারে পরিণতিই লক্ষ করেছেন। আমরা সেই পরিণত, পরিশীলিত মননকে সাহিত্যের পটভূমিতে এই কয়েকটি বৈপ্লবিক ভূমিকায় দেখতে পাই :

১. সুকান্ত আবহমানকাল প্রচলিত বাংলা বস্তুনিষ্ঠ কবিতার ঐতিহ্যে কবিতা লিখেছেন। সেই ঐতিহ্য তাঁর যুগের রাজনৈতিক বাতাবরণে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি একাধারে নতুন এবং পুরনো। পুরনো ধারাকে নতুন ধারণায় মুখর করেছেন।

২. মহান উত্তমর্ণ রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত ভাষাদর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন যদিও স্বাভাবিক কারণেই যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্যের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় দুজনের মধ্যে। শেষ দিকের রবীন্দ্রনাথ—যিনি সাম্রাজ্যবাদের নিন্দুক—তাঁর মনের খুব কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের 'ছাড়পত্র', 'নবজাতক', 'বোধন' প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁকে মুগ্ধ করেছে, এবং সেগুলিকে তিনি তাঁর নতুন চিন্তার সঙ্গে অন্বিত করেছেন।

৩. অদূরপূর্ববর্তী তিরিশের কবিদের কোন ছায়া তাঁর কবিতায় নেই। সরাসরি মানবিক রাজনৈতিক কবিতা রচনার জন্যে এবং বিশেষ করে স্পষ্ট-উচ্চার্য অর্থপ্রধান কবিতা রচনার জন্যে তাঁকে মাত্রাবৃত্তের আশ্রয় নিতে হয়েছে, পয়ারের সহজ পথে চলতে হয়েছে। তাঁর কবিতার সহজ, তাৎক্ষণিক আকর্ষণ লক্ষণীয়। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'তার কিশোর হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতার সঙ্গে পদে পদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে একটি কঠিন, সংকীর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ। কবিতাগুলি যেন সেই মতবাদের চিত্রণ মাত্র, জোর গলায় চেঁচিয়ে বলা, কবিতা না হয়ে খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফ হলেই যেন মানাতো'। বুদ্ধদেব একথা লেখেন সুকান্তর মৃত্যুর পরে। কিন্তু সুকান্তকে তাঁর জীবিত-কালেই তিনি লিখেছিলেন, 'রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছ তুমি ; তোমার জন্য দুঃখ হয়'—এই চিঠি পড়েও সুকান্ত তাঁর রচনারীতি পাল্টান নি। আসলে কবিতা বললে যে তথাকথিত 'বিশুদ্ধ কবিতা'ই হতে হবে, কিংবা 'হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতা' বাংলার বস্তুনিষ্ঠ প্রাণবন্ত কাব্যধারায় অন্বিত হতে পারে না, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, ঔপনিবেশিক দীক্ষায় দীক্ষিত কাব্যচিন্তাই একমাত্র কাব্যের জন্ম দেয় এমন কথা কি হলফ করে বলা যায়! বরং সুকান্তর কবিতা অভিভাবকদের তাবৎ সতর্কতাবাণী সত্ত্বেও একটা নতুন (বরং বলা যায় ঐতিহ্যসম্মত) দিককে তুলে ধরেছে সেকথা অস্বীকার করা যায় না। অত্যধিক

লিরিক-চর্চা, দায়দায়িত্বহীন অসংলগ্নতার ফলশ্রুতি তো আজ পত্রপত্রিকার অসংখ্য জোলো কবিতায় সহজেই চোখে পড়ে।

৪. সুকান্ত চল্লিশের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পষ্টভাষী এবং আনপ্রিটেনশাস ছিলেন, এবং সে-কারণেই মাঝেমধ্যে দুর্বল পংক্তিও লিখতে পিছপা হতেন না। তাঁর ভেতরের আবেগ, রাজনৈতিক চেতনার তীব্রতা তাঁর ভেতরের আগুনকে প্রকাশ করেছে। তবে তাঁর সমস্ত চেতনাই আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর মানবিকতা—লাঞ্ছিত মানুষের জন্যে অপমানবোধ ও বিদ্রোহ।

৫. এই মুহূর্তে তাঁর কাব্যের আবেদন লক্ষ করেছি আপিসে, কাছারিতে, স্কুলকলেজে। অত্যধিক অর্থহীন শব্দের জন্যেই শব্দের আকর্ষণে আমরা যখন ডেকাডেণ্ট পদরচনায় ব্যস্ত এবং তরুণেরাও যখন একই শব্দবৃত্তে বিচরণশীল, তখন সুকান্তর কবিতার স্পষ্টতা, তার যন্ত্রণা নিশ্চয়ই নতুন পথনির্দেশে সহায়তা করবে।

সব বলা হলেও মনে হয় সুকান্ত নিঃসঙ্গ। রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করলেও তাঁর একাকিত্ব যে কোন একক মানুষেরই একাকিত্বের মত। মানুষ একই সঙ্গে সমাজসম্পৃক্ত, আবার নিঃসঙ্গ—ঘরের কোণে একলা কবি। নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানবসমাজের হয়ত এই-ই নিয়তি। একক মানব-আত্মার প্রতীক সেই 'রানার' তাই একই সঙ্গে জীবনে যুক্ত ও বিযুক্ত হয় :

রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;
শপথের চিঠি নিয়ে চল আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে';
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখনি—
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম হে রানার।

সাঁওতালী সাহিত্য : উন্মেষ ও বিস্তার

পূর্বভারতে উপজাতি সম্প্রসারণ

পূর্বভারতে আর্য সংস্কৃতির প্রসার প্রথমে বিদেহ বা মিথিলাতেই ঘটেছিল বলে ধরা হয়ে থাকে। খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শতপথ ব্রাহ্মণে সরস্বতী পেরিয়ে পূর্ব দিকে পবিত্র অগ্নির বিস্তারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেখান থেকে আর্যের আলোক ক্রমে ক্রমে পুণ্ড্রবর্ধন, মগধ ও প্রাগ্‌-জ্যোতিষে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এর থেকে আমরা এতদঞ্চলের আদি-অস্ট্রাল নরগোষ্ঠীর প্রসারণের কোন নির্দেশ পাই না। সে নির্দেশ বরং আছে আরো পূর্ববর্তীকালের ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে এমন কি সিন্ধু উপত্যকাতেও। সিন্ধু উপত্যকায় আদি-অস্ট্রাল জাতির মাথার খুলি পাওয়া গেছে। এরই সঙ্গে কতকগুলি সাংস্কৃতিক উপাদানের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এই অঞ্চলে এত পূজ্য বস্তু পাওয়া গেলেও মন্দির কেন নেই এই প্রশ্ন অনেকে করেছেন। লোক-সংস্কৃতির কথা বাদ দিলাম, কারণ উদ্বৃত্ত সম্পদের মত লোকসংস্কৃতি তখন হয়ত গড়ে ওঠেনি, কিন্তু আজও আমরা দেখি যে আদি-অস্ট্রাল উত্তরপুরুষ অস্ট্রিক-ভাষীদের মধ্যে মন্দির নির্মাণের কোন প্রথা নেই। গ্রামের পাশে প্রথম নিবাসের স্মারক একখণ্ড জঙ্গল—যাকে জাহের থান বা সারণা বলা হয়—তাই তাদের মন্দির, সেখানেই বিশেষ কয়েকটি গাছের নীচে কয়েকটি পাথরে নানা নামের দেবদেবীর পুজো করা হয়। মহেঞ্জোদড়োর বেড়াঘেরা একটি গাছের প্রতিমূর্তিসহ একখানি সীল এইরকম কোন 'সারণা'র স্মারক কিনা কে জানে!

ঋগ্বেদের যুগে আমরা আর্যদের সঙ্গে দাস-দস্যুদের যুদ্ধের কথা শুনি। বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের তখন অন্যতম নাম পুরন্দর। কারণ তিনি অনেক দুর্গ ধ্বংস করেন যার মালিক শত্রুপক্ষীয় দাস-দস্যুরা। দুর্গের প্রতিশব্দ গড। মুণ্ডাদের প্রসারণ তথা স্থানিক পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা তাদেরই ঐতিহ্য থেকে জানতে পারি যে তারা গড আখ্যায়িত অনেকগুলি দেশের মধ্যে দিয়ে গেছেন, যেমন, কালাংজরগড়, গড়পিপার, রুইদাসগড় ইত্যাদি। সাঁওতালরাও তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা ক্ল্যান-এর জন্যে প্রসারণের সময় বিভিন্ন জায়গায় গড় তৈরি করে, যেমন, খায়রাগড়, কোয়েন্দাগড়, চম্পাগড়, বাদোলিগড় ইত্যাদি। এইসব

দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় আর্যদের সেই আদি-অস্ট্রাল বংশধরদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, এবং সেই বংশধরেরাই বর্তমান কালের অস্ট্রিক ভাষাভাষীদের পূর্বসূরী। পূর্বভারতীয় এই অস্ট্রিক ভাষাভাষীদের মধ্যে হলুদের ধর্মাচারগত ব্যবহার এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। হলুদের ব্যবহার এদের মতই সুদূর ট্যাকোপিয়াব আদিবাসীদের মধ্যেও বিস্তৃত। বাক-পতিরাজের গৌড়বহতেও হলুদপাতায় আবৃত রমণীদের কথা বিবৃত আছে, তারই স্মারক হয়ত পর্ণশবরী, যার প্রতি দেবী হিসেবে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কবে জুয়ং-রা, যারা নিজেরাও পর্ণ-আচ্ছাদিত (ড্যালটন জানিয়েছেন জুয়ং রমণীর পর্ণবস্ত্রের প্রতি এক সংস্কারগত আকর্ষণ)। প্রসারণের সময় সাঁওতালরা 'সাসাংবেদা' (হলুদের প্রান্তর) বলে এক জায়গায় কিছুকাল অধিষ্ঠান করেছিল। সে অঞ্চলটি নিশ্চয় হলুদ চাষোপযোগী পূর্বখণ্ডের কোন অঞ্চল। ফ্রেজার সাহেব দ্রাবিড়ভাষী খোন্দদের মধ্যে হলুদের রং ঘন লাল করার জন্যে নরবলি প্রথার উল্লেখ করেছেন। বলি বা মিরিয়ার দেহ থেকে হলুদ অনুলেপনের খানিকটা নেওয়ার জন্যে স্ত্রীলোকদের হুড়োহুড়ির কথাও তিনি বলেছেন। 'নিষাদ' শব্দটির যে বিশা (হলুদ)+অদ্+অন্ বা হলুদভক্ষক হিসেবেও ব্যুৎপত্তি করা যায় একথাও বলা হয়েছে। এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হয় আদি-অস্ট্রালদের কাল থেকেই হলুদের চলন ছিল এবং তাদের উত্তরসূরী অস্ট্রিকেরা ইতিহাসের কোন এক স্তরে সিন্ধু-গঙ্গার উপত্যকা অঞ্চলে ছিল (সাঁওতালরা সপ্তনদী প্রবাহিত চম্পায় একদা তাদের নিবাসের কথা উল্লেখ করেছে)। গঙ্গার দুই তীরবর্তী ভারতীয় মধ্যভূখণ্ডেই তাদের অধিষ্ঠান ছিল একসময়—তার অন্যতম এবং পরোক্ষ প্রমাণ এই যে হিমালয়ের পাদদেশে পাঞ্জাব থেকে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পযন্ত অস্ট্রিক ভাষার প্রভাবান্বিত অনেকগুলি ভাষা দেখা গেছে। এই অঞ্চল থেকেই ঋগ্বেদের যুগে কোন এক সময়ে আর্যদের চাপে এই ভাষাভাষীরা সিন্ধা, কৈমুব পেকে আরম্ভ করে ছোটনাগপুরের পাহাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এব পরেই মেগালিথ বা মৃতের অস্থিসঞ্চয়নেব ওপর লম্বালম্বি কিংবা আড়াআড়ি প্রস্তর প্রতিষ্ঠার কথা মনে আসে। ঋগ্বেদে ধরিত্রীমাতার কোলে মৃত সন্তানের শান্ত সমাধির কথা যেমন আছে, তেমনি আছে ছাগচর্মাবৃত মৃতের অগ্নিতে আহুতির কথা। ইন্দো-ইরানায় সংস্কৃতিতে অগ্নিব পবিত্রতা (যা এখনও পার্সীবা মান্য করেন) অতি প্রাচীনকাল থেকেই মান্য কবা হয়। তাদেবই প্রভাবে মনে হয় আর্যরা প্রথমে মৃতকে অগ্নিতে সমর্পণ করতেন না। অনেকে বলেন যজ্ঞেব ধাবণা উন্মেষ লাভ করার পরই অগ্নিতে আহুতিব কথা আর্যদেব

মনে আসে। এদিকে অস্ট্রিকভাষাভাষী সব জাতিই মৃতকে পোড়ান, এবং মৃতের অস্থিবিশেষ গোষ্ঠীর প্রস্তরদণ্ডের তলায় পুঁতে দেন—সাঁওতাল এবং দু একটি জাতিই শুধু সেই অস্থিখণ্ড জলে বিসর্জন দেন। মনে হয় অস্থিসঞ্চয়নের প্রথা কিংবা মৃতের অগ্নিতে আহুতি ইত্যাদি প্রথাগুলি আর্যেরা নতুন দেশে আসার সময় দেশজ প্রথা হিসেবে গ্রহণ করে। যদিও মেগালিথ সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে, তবু মনে হয় এই প্রথা আদি-অস্ট্রালদেরই দান, কারণ তারা একদিকে হিমালয় অন্যদিকে বিন্ধ্য-কৈমুর-ছোটনাগপুরের পাহাড়কে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। পাহাড় এবং পাথর তাদের কাছে আগের মত আজও প্রাণময় সত্তা, তার মধ্যে তারা জীবনস্পন্দন আছে বোধ করে। পাথরের প্রতি তাদের আকর্ষণ শুধু দেবদেবীর স্মারক হিসেবেই নয়, তাদের অন্যতম প্রধান দেবতা মারাংবুরু, পাট সারণা ইত্যাদি বড় পাহাডকেই বোঝায়। বিরাট পাহাড় কোন এক বিশ্বাসবলে একদা তাদের গ্রামের জাহের থানে এসে আশ্রয় নিয়েছে—পাহাড়-দেবতা যে নাকি বৃষ্টিরও দেবতা তাদের এত অন্তরঙ্গ কেন সে বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন জাগে। তাদেব মত পাহাড়ের প্রতি অন্তরঙ্গতা বৈদিকযুগের লোকদের মধ্যে ছিল না। এই আত্মীয়তাবোধ হয়ত জন্মেছে অতি প্রাচীনকাল থেকে গণ্ডোয়ানাভূমিতে তাদের অধিষ্ঠান বলে। মনে হয় উত্তরের গাঙ্গেয় উপত্যকায় যেমন, তেমনি মধ্যভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে তাদের নিবাস সুপ্রাচীন কাল থেকে। সংখ্যাধিক্যের ফলে কিংবা অন্য কোন উপজাতি, বিশেষত দ্রাবিড়ভাষীদের চাপে পডে তারা ক্রমে ক্রমে আরো পূর্বদিকে গিয়ে ছোটনাগপুরে একত্রিত হয়। এই প্রসঙ্গে সাঁওতালদের শেষকৃত্য 'ভণ্ডনের' কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। কী কারণে সাঁওতালরা মৃতের অস্থিবিশেষ দামুদা বা দামোদর নদীতে ভাসিয়ে দেন—ভারতবর্ষে অন্যান্য নদী, বিশেষত গঙ্গা ত খুব দূরে ছিল না ('গাং' শব্দটিকেও ত অস্ট্রিক বলে অনুমান করা হয়েছে)? এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে দামোদর নদীর সঙ্গে সাঁওতালদের পরিচয় হয়ত বহুকালের। হয়ত সম্প্রসারণের কোন এক আদি যুগে দামোদরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে তাদের পরিচয় নিবিড় হয়ে যায়।

অস্ট্রিকভাষী মধ্যভারতের সব উপজাতিরই ভোজ্য চাল—বাসি ভাত বা 'হণ্ডি' তাদের কাছে উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। পূজার উপচার হিসেবে আতপ চালেব ব্যবহারও তাদের মধ্যে দেখা যায়। যদিও চালের ব্যবহার দেশে বিদেশে

বিস্তৃত, তবু তারা আর্যদের মত যব বা গোধূম ব্যবহার করে না বলে মনে হয় তারা মধ্য ও পূর্বভারতের দীর্ঘকালের বাসিন্দা। পূজার আর একটি প্রধান উপচার সিঁদুর। সিঁদুরকে অনেকে প্রজনন ধর্ম তথা বলিদানের স্মারক হিসেবে গ্রহণ করেন। মুণ্ডাদের মধ্যে 'অণ্ডকা' বা মানুষ বলিদানের ক্ষীণ স্মৃতি আছে। তার মধ্যে দ্রাবিড় প্রথা কতটা আছে তা অবশ্য জানা যায় না। প্রজনন ক্ষমতার তীব্রতার জন্যেই হয়ত তুলনীয় জাদু হিসেবে তারা প্রচুর ছাগ ও মুরগী বলি দেয়—এবং এই প্রাণীগুলি ভারতের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে প্রচুর জন্মায়।

এ ছাড়া আরো কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণ আছে যা থেকে বোঝা যায় মধ্যভারত থেকে অস্ট্রিকভাষীরা ধীরে ধীরে পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উড়িষ্যাতে ও মেদিনীপুরে বেশ কয়েক ঘর অথর্ববেদী ব্রাহ্মণের সন্ধান পাওয়া গেছে। উড়িষ্যার মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহারকে শবরীবিদ্যা বলা হয়, এবং বিরহড় প্রমুখ অন্যান্য উপজাতিরা এই বিদ্যায় পারদর্শী। পুরীর জগন্নাথদেবকেও শবর দেবতা বলা হয়ে থাকে। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় শবর, নিষাদ, কোল, ভিল প্রমুখ তৎকালীন যাবতীয় অস্ট্রিক ভাষাভাষী উপজাতি ধীরে ধীরে পূর্বভারতে বিস্তার লাভ করে।

পশ্চিমবঙ্গে আজ যে আমরা একাধিক জল-অচল শ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণকে দেখি তারা হয়ত একদিন উপজাতিদের অঙ্গীভূত ছিল, হিন্দু পুরোহিততন্ত্র তথা আচার-ব্যবহারের মাধ্যমেই তারা হিন্দুর সমাজবিন্যাসে স্থান করে নিয়েছে। তাদের সেই পূর্বতন স্মৃতি আমরা এখন পাই লোকসংস্কৃতিতে। পুরুলিয়া, মানভূম ইত্যাদি অঞ্চলের বড়াম (গ্রামদেবতা), ইদ, করম ইত্যাদি পূজা ও উৎসবের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সমাজস্তরের যোগসূত্র খুঁজে পাই। এইভাবেই সামাজিক লেনদেনের ফলে উপজাতি ক্রমে ক্রমে হিন্দু 'কাস্ট'-এ পরিণত হয়। আরো আগের অবদান হিসেবে হিন্দুর স্ত্রী-আচারে আমরা হলুদ, পান, সিঁদুর, তেল ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্যে উপজাতিদের আচারের অবশেষ দেখতে পাই। হয়ত তা কোন আদি-অস্ট্রাল বা তৎপরবর্তী যুগেই ঘটে থাকবে।

অর্থনৈতিক কারণে আজও বিভিন্ন উপজাতির সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে। ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন উপজাতি সমতলভূমিতে চাষের কাজে নেমে এসেছে, কেউ গেছে আসাম ও উত্তর বাংলার চা-বাগানে শ্রমিক হিসেবে। বিভিন্ন উপজাতি তাদের আবদ্ধ সমাজ থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতির এলাকার পরিবর্ধন ঘটে।

(২) সাঁওতালী লোককবিতা

আমাদের আলোচ্য সাঁওতাল উপজাতিও এইরকম ছড়িয়ে পড়েছেন। গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে এই অগ্রসরমান জাতিটি লোককবিতা তথা লোকসঙ্গীতে তাঁদের জীবনচর্যার একদিক প্রকাশ করেছেন। আমরা জানি আদিম অধিবাসীদের সাহিত্য লিখিত ছিল না—চারপাশের পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলিকে পেতে গেলে তাদের ম্যাজিকের শরণ গ্রহণ করতে হত, বৃষ্টির জন্যে হাত-পায়ের মুদ্রাসহযোগে বৃষ্টিপাতের অনুকরণ করতে হত—তারই রেশ রয়ে গেছে আজকের সংঘবদ্ধ নৃত্যে, সমাজবদ্ধ জীবনে—জর্জ টমসনের ভাষায় (*Marxism and Poetry*, ১৯৫৪ সং, পৃঃ ৬) "a dance in which they reproduced the collective, co-ordinated movements previously inseparable from the task itself. This is the mimetic dance as still practised by savages today." সেই নৃত্যের তালে, লোকসঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় আজো আদিবাসীদের যৌথ জীবনের আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। টমসন সেকথাই বলেছেন (পৃঃ ১৩) : In man rhythm has been humanised, that is, it has developed a social function—to organise men's wills for some concerted action or, later, to organise their emotions so as to draw them closer together in a union of mutual sympathy. It is not hard to see that this humanised rhythm originated from the use of tools.

জীবনসম্পৃক্ত নানা কবিতায়, গানে সাঁওতালদের সেই কর্মমুখর জীবনের নানা দিকের কথা জানা যায়, যেমন,

১. এক এক মেয়ে জ্বলছে যেন তারার মত
জানি না সেই তারা কোথায় মাটির বুকে না আকাশে
ধ্রুবতারার মতন শুধুই জ্বলছে তারা।

২. ইটের ভাঁটায় কাজ করতে যাচ্ছ তুমি
কার কাছে আজ রেখে তুমি যাও আমাকে
মেয়েটি ছোট্ট ছেলেও ছোট্ট
কেমন করে তাদের আমি করবো মানুষ
—পাঁচটি বছর অপেক্ষা তুই করিস, সখি,

তখন যদি না ফিরি ত ছ বছরে
আবার বিয়ে করিস রে তুই আবার বিয়ে।

উপরিলিখিত সাঁওতালী লোককবিতা বা লোকসঙ্গীত দু'টি চব্বিশ-পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের সাগরদ্বীপ, পাতিবুনিয়া, বাগডাঙা, মৌসিনি অঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত কবিতা / সঙ্গীতের ভাষান্তর। এঁদের পূর্বপুরুষেরা গত একশো বছরের মধ্যে জঙ্গল হাসিল করতে এদেশে এসেছিলেন ময়ূরভঞ্জ থেকে। মেদিনীপুর কিংবা বীরভূমের সাঁওতালদের থেকে আচার-আচরণে সামান্য পার্থক্য থাকলেও সব জায়গার সাঁওতালদের মতই এঁদের ভাষা এক, সংস্কার এক। নাচগানগুলিরও নাম ঐতিহ্যাশ্রয়ী—লাঁগড়ে, দং ইত্যাদি। এই লোককবিতার বিরাট একটা অংশ জুড়ে বিয়ের গান, করম গান থাকলেও, অনেক গানেই তাদের দুঃখকষ্ট ও সংগ্রামের দিকটাও ফুটে উঠেছে। জীবন-সংগ্রামের চিত্র পাওয়া যাবে এই কটি কবিতাতেও :

১. সকালবেলায় কাজে যাওয়ার গান :

মোরগ ডাকে বনমুরগি ডাকে
চলো ওহে জমির রাজা
এগিয়ে চলো জমির রাজা
ভুড়ুক ভুড়ুক দাও হে টান তোমার পিতল-হুঁকোয়।
গ্রামের পথে যেতে যেতে
কামিন্ মেয়েগুলির দিকে চোখ রাখে সে চোখ রাখে
উঁচু পথে গিয়েছে সে এখন নামে নিচু পথে,
পায়েতে তার আলতা-মাখা
আলতা-মাখা চিহ্নগুলি হারিয়ে গেল কাদায়।

২. চাষের গান :

ভূমির রাজা, পরাই ফলা
ভূমির রাজা, লাগাই লাঙল,
কাদামাটির জমিতে যা
প্রবেশ করবে সূক্ষ্মভাবে।

৩. বীজরোপণের গান :

ধানের ঝুড়ি ধরো ওহে
ছোট্ট ঝুড়ি ধরো

ধানের ঝুড়ি ধরো ওহে
ছোট্ট ঝুড়ি ধরো
এক মুঠো বীজ পুঁতে দিলাম
দু মুঠো দিই ছড়িয়ে
তিন মুঠো বীজ পুঁতে দিলাম
সারা মাঠটা ভরিয়ে।

৪. চাষী-মজুরের রোষ (পুরুষের উক্তি) :

গরুর মত জড়ো করলে
মোষের মত জড়ো করলে
জলায় আমাদের,
অমুক তমুক দাও আমাদের, আমরা যাব
ওহে অমুক, আমরা যাব—
তারা ফুটছে মাথার ওপর,
সূর্য ডোবে,
অমুকতমুক দাও আমাদের, আমরা যাব।

৫. চাষী-মজুরের রোষ (মেয়েদের উক্তি) :

ঝিঙেফুল ফুটছে এখন, রাস্তা আঁধার
ঘরের মালিক, রাস্তা আঁধার,
শস্যমাপনি খুঁজতে গিয়ে সন্ধে হল।
কোথায় লুকোয় মাপনিটা যে ?
ও মেয়েরা, মেঝে ঝাড় দে,
রাণীকাজল ধান
ও যে রাণীকাজল ধান।

৬. মাছ ধরার গান :

উত্তরে দক্ষিণে পুবে ও পশ্চিমে
কালো মেঘ ঐ ওঠে,
সুবর্ণরেখায় বান,
আমি পেতে রাখি মাছ-ধরা জালখানি
সে জালে কখন ধরা পড়ে গেছে রুই ও চিতল,
যা কিনা আমি ত বেচতে পারিনি

ক্রেতার অভাবে,
আমগাছওলা ঐ বাড়িটার
তেঁতুলগাছের ঐ বাড়িটার
লোকটা এখন নিচ্ছে এগুলি।

৭. অন্যান্য :

রাম ছিল, সীতা ছিল,
সীতা গেল বাস করতে
রাবণ রাজার বনে,
সীতার কথা কেই বা জানে?
হায়রে হায়, কেমন করে পেট ভরাব,
আমি যে হায় পেটের চিন্তায়
অগাধ জলে দাঁড়িয়ে এখন।

(৩) সাঁওতালী সাহিত্য

আদিবাসীসম্পৃক্ত আলোচনা খুবই অনুভূতিপ্রবণ বিষয়। বিরাট আদিবাসী মানবসমাজের সঙ্গে পরিচয় এদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রায় সুরু থেকেই। অবুঝ বিদেশীদের স্বার্থপ্রণোদিত রাজস্ব-সংগ্রহ-চিন্তা নানাভাবে এদেশের লোকদের এবং আদিবাসীদের বিব্রত করেছে, তাঁদের বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মিশনরিদের ধর্মপ্রচারের উন্মাদনায় আদিবাসীদের প্রতি একটা না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি মেনে চলেছিলেন ব্রিটিশ শাসক—বৃহৎ ভারতীয় জীবনধারার থেকে তাদের আড়াল করে রেখেছিলেন তাঁরা। গেরিলা যুদ্ধে তৎপর, কষ্টসহিষ্ণু, বীর, নীতিনিষ্ঠ আদিবাসীদের দূরে গণ্ডীবদ্ধ রেখে ব্রিটিশ শাসক রাজনীতিগতভাবে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

সেইকালেই আদিবাসী ভাষা ও লোকসাহিত্য সংগ্রহের মত নিষ্পাপ ও বিতর্কবিহীন সংস্কৃতিচর্চা চলতে থাকে। আমাদের দেশে বিশের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান পঠনপাঠন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের সংস্কৃতিচর্চা পাঠ্য হয়। তারপর স্বাধীনতার প্রাক্কালে কলকাতায় ভারতীয় নৃবিজ্ঞান নিরীক্ষণের প্রধান দপ্তর তৈরি হওয়ার পর এবং স্বাধীনতার পরে আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে নৃবিজ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা হওয়ায় ও রাজ্যে রাজ্যে রাজ্য সরকারদের আদিবাসীচর্চা পর্ষদ গঠন হওয়ায় বহুসংখ্যক

জাতিভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থ (Memoir) রচিত হতে থাকে—সেই গ্রন্থগুলিরই মধ্যে বিধৃত হতে থাকে আদিবাসী লোকসাহিত্যের কথা, তার সংগ্রহ। এছাড়া বরাবরই আদিবাসীপ্রেমী রাজকর্মচারী, উকিল (আর্চার, শরৎচন্দ্র রায়) এবং দরদী মিশনরি সাহেব (বডিং, ক্যাম্পবেল) আদিবাসী লোকসাহিত্যসংগ্রহ প্রকাশ করে যান।

সম্প্রতি আদিবাসীসমাজ শিক্ষিত হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে লোকসাহিত্যের বদলে লিখিত সাহিত্য রচিত হচ্ছে। এই সাহিত্য প্রচারের বাহন অবশ্যই তাঁদের পত্রপত্রিকা, তা ছাডা অনেকেই পৃথক গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এসব ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী সাঁওতালী ভাষা। আমাদের আলোচ্য সাঁওতালী সাহিত্য। সাঁওতাল শ্রেণীর জন্যে প্রতিদিন রেডিও প্রোগ্রাম ত রয়েছেই বিকেলে—সাঁওতাল ভাষা এখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতেও একটি ভাষা হিসেবে গণ্য। রোমান হরফে উচ্চমাধ্যমিক সাঁওতাল ভাষার একটি সাহিত্য সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে।

সাঁওতালী একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাষা। এটি অস্ট্রো-এসিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অনেক আদিবাসীই নানা কারণে নিজের ভাষা ভুলে গেছেন বা যাচ্ছেন। সাঁওতালরা নিজেদের ভাষা ভোলেন নি। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় তাঁরা নিজেদের ভাষায় কথা বলেন—যদিও বিভিন্ন রাজ্যে তাঁদের লিপি সেই সেই রাজ্যেরই লিপি। পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের লিপি বাংলা, বিহারে দেবনাগরী, উড়িষ্যায় ওড়িয়া, আসামে অসমীয়া। এছাড়া মিশনরিদের দ্বারা প্রবর্তিত এবং খৃস্টানধর্মী সাঁওতালদের দ্বারা সমর্থিত রোমান লিপিতেও এই ভাষা প্রচলিত। কিছুকাল ধরে ওড়িয়া ধরনের একটি লিপি 'অল চিকি' নিজেদের লিপি বলে দাবি করে আসছিলেন এক বিপুলসংখ্যক সাঁওতালগোষ্ঠী। এর সপক্ষে সাঁওতাল-মানসের স্বাজাত্যবোধ কাজ করেছে—এর বিপক্ষে অযৌক্তিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বাহন হিসেবে এই লিপির দাবি সমর্থন করেছেন—এতে সাঁওতালী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ সম্ভব হবে (স্টেটসম্যান, কলকাতা,

১. পুরাণ কথা

সাঁওতালী ভাষায় ক্লাসিক গ্রন্থ হল 'হড়কোরেন মারে হপরামকো রেয়াঃ

কথা' ('সাঁওতালদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কথা')। দুমকার কাছে বেনাগড়িয়ার নর্দার্ন চার্চেস মিশনরিদের স্ক্রেফসরুড সাহেব ১৮৮৭ সালে সাঁওতাল গুরু কলিয়ানের মুখের কথা শুনে শুনে যে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন এটি তারই ফলশ্রুতি। এতে সাঁওতালদের জন্মকাহিনী, তাদের সামাজিক আচারব্যবহার, প্রথা ইত্যাদির কথা আছে। রোমান লিপিতে লিখিত এই গ্রন্থটি সাঁওতালদের —বিশেষত সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের—জীবনের এক সামাজিক আলেখ্য। ১৯৪২ সালে 'ট্রেডিশনস অ্যাণ্ড ইনস্টিটিউশনস' বলে এর বডিং-কৃত এক পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ বের হয়, এবং তারও অনেক আগে 'সাঁওতালী কথা' বলে বাংলায় এর অনুবাদ প্রকাশ করেন সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক (১ম সং ১৯২৮ সালে, ২য় সং ১৯৫৫ সালে)। বাঁকুড়ার Census Handbook 1951 (অশোক মিত্র সম্পাদিত)-এ এর অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেন বৈদ্যনাথ হাঁসদা।

সাঁওতালদের জীবনধারা নিয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে। ঘাটশিলার রামদাস মাঞ্‌ঝী টুডু সেই গ্রন্থটির লেখক ছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'খেরওয়াল-বংশ, ধরম-পুঁথি'। বইটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় এবং এতে সাঁওতালদের—বিশেষত, মেদিনীপুরঘেঁষা সাঁওতালদের ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সাঁওতালদেরই পৃথক নাম 'খেরওয়াল'। গ্রন্থটি বাংলা হরফে লিখিত এবং সাঁওতাল জীবনের অনেকগুলি কাঠখোদাই ছবি আছে এতে। আচার্য সুনীতিকুমারের ভূমিকাসহ এর একটি পুনর্মুদ্রণ বেরোয় পরবর্তীকালে।

২. লোককথা

সাঁওতাল জীবনসম্পর্কিত নানা দিক নিয়ে পরবর্তীকালে অনেকগুলি 'সাঁওতাল লোককথাসংগ্রহ' বেরোয়। বডিং-এর তিনখণ্ডে 'সাঁওতাল ফোক-টেলস' বেরোয় নরওয়ে থেকে—তার এক পাতায় সাঁওতালী মূল, অন্য পাতায় ইংরেজি অনুবাদ। ক্যাম্পবেল-ও অনুরূপ একটি সংকলন প্রকাশ করেন। বমপাস ১৯০৮ সালে সাঁওতাল লোককাহিনী নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। বডিং-এর বইয়ের কিছু কাহিনী নিয়ে ১৯২৪ সালে 'হড় কহনীকো' বলে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'গম কহনী' বলে রোমান লিপিতে একটি

লোককথাসংগ্রহ বেরোয় ১৯৪৮ সালে। এইসব কাহিনী সাঁওতালী গল্পের পরিচয় বহন করে।

৩. ইতিহাস

সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) নায়ক সিদো ও কানহুকে নিয়ে সাঁওতালদের গর্ববোধের অন্ত নেই। প্রতি বছর ৩০শে জুন তারিখে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণ-উৎসব পালন করেন এঁরা। এই সাঁওতাল বিদ্রোহকে অবলম্বন করে তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা করেছেন ছটরায় দেশমাঞ্ঝী যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বেনাগড়িয়া মিশনের 'ছটরায় দেশমাঞ্ঝী বেয়াঃ কথা' নামক গ্রন্থে।

৪. কাব্য

সাঁওতাল লোকগীতিসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন আর্চার। সম্প্রতি তাঁর একটি বৃহদাকার গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। উনি ১৯৪২ সালে 'হড় সেরেং' আর 'দং সেরেং' নামে লোকসংগীতসংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এখন পত্রিকাদিতে বহু কবিতা প্রকাশিত হয়ে থাকে। রোমান লিপিতে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় ৺পল সোরেনের 'ওনড়হে বাহা ডালবাক্' (ফুলের ডালি) নামক কাব্যগ্রন্থ। ১৯৪৫ আর ১৯৫১ সালে বাংলা লিপিতে প্রকাশিত হয় পঞ্চানন মারণ্ডির 'সেরেং হতা' (গানের অঙ্কুর) আর ঠাকুরপ্রসাদ মুর্মুর 'এভেন আরাং' (জাগরণ গান)। পুরুলিয়ার কবি সারদাপ্রসাদ কিসকু তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থের জন্যে বিখ্যাত। দেবনাগরী লিপিতে ১৯৫৩-তে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভুরকা ইপিল' (শুকতারা) কাব্যগ্রন্থ। নারায়ণ সোরেনও তাঁর অনেক সুন্দর কবিতার জন্যে খ্যাতনামা। এছাড়া কাব্যে আরো অনেকের নামই উল্লেখযোগ্য, যেমন, মঙ্গলচন্দ্র সোরেন, বালকিশোর কিসকু, বাবুলাল মুর্মু, ভাগবত মুর্মু, রঘুনাথ মুর্মু, রূপনারায়ণ হেমব্রম, শ্রীধর কুমার মুর্মু, গোমস্তাপ্রসাদ সোরেন, চন্দ্রনাথ মুর্মু, কালীরাম সোরেন, যুগলদাস মারণ্ডি, রামচন্দ্র মুর্মু, দুর্গাচরণ হেমব্রম, হপনচন্দ বাস্কে, বিব-লিটা হেমব্রম, রবিলাল মারণ্ডি, স্টিফেন মুর্মু প্রভৃতি।

৫. কথাসাহিত্য

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথমেই স্মরণযোগ্য আর. কার্স্টেয়ার্সের 'হারমাজ ভিলেজ' গ্রন্থের আর. আর. কে. রাপাজ-কৃত অনুবাদ, রোমানলিপিতে লিখিত

'হারমাওয়াঃ আতো' (হারমার গ্রাম) গ্রন্থটি (১৯৪৬)। সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসটি রচিত। 'হাড়মা' এই উপন্যাসের নায়ক।

সুনকু সোরেনের 'মুহিলা চেচেৎ দাই' (অধ্যাপিকা 'মুহিলা') ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। মুহিলা নামের জনৈকা অধ্যাপিকার প্রেমকথাই এর উপজীব্য।

বালকিশোর বাস্কি লিখিত ছটি কিশোরোপযোগী সামাজিক কাহিনী নিয়ে ১৯৫২ সালে 'কুকমু' (স্বপ্ন) নামে একটি কাহিনীসংকলন প্রকাশিত হয়। ডোমন সাহু 'বুল মুণ্ডা' (মদ্যপ) নামে একটি গল্পসংকলন প্রকাশ করেন। ডোমন সাহু প্রেমচন্দের 'পঞ্চ্ পরমেশ্বর', 'নমক কা দারোগা', 'মুক্তিধন', প্রভৃতি গল্পগুলিরও সাঁওতালী অনুবাদ করেন। চারুচন্দ্র সোরেন 'পুরাহা কাহিনী' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।

৬. নাটক

সি. এইচ. কুমার পদ্যাকারে বাইবেল-নির্ভর একটি নাটক লিখেছিলেন। ময়ূরভঞ্জের রঘুনাথ মুর্মু ১৯৪২ সালে উড়িয়া লিপিতে এবং ১৯৪৭ সালে বাংলা লিপিতে 'বিদুচাঁদন' নামে নাটক লেখেন। এতে প্রাচীন সাঁওতাল সমাজের রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে। ১৯৫২ সালে বাংলা লিপিতে এঁর 'খেরওয়াড় বীর' নামে আর একটি নাটক প্রকাশিত হয়। এতে মানব-দানবের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে—এবং সাঁওতালদের কল্পিত আদিপুরুষ খেরওয়াড়ের চরিত্রচিত্রণ করা হয়েছে। কালীরাম সোরেন-এর 'সিদোকানহু' নাটকটিও প্রশংসিত হয়েছে। রূপনারায়ণ শ্যামের দেবনাগরী লিপিতে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'আলে আতো' (আমাদের গ্রাম) একটি সামাজিক নাটক। বালকিশোর বাস্কি ১৯৫৯ সালে মদখাওয়ার কুফল নিয়ে 'আকিল আরসী' (জ্ঞানদর্পণ) নামে একটি নাটক লেখেন।

৭. পত্রপত্রিকা

সাঁওতাল সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চা প্রধানত ক্ষীণকায় কতকগুলি পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করেই এগিয়ে চলেছে। বেনাগড়িয়া মিশনের 'পেড়া হড়' (অতিথি) আগে ১৮৯০ সালে বডিং-এর সম্পাদনায় 'হড় হপনরেন পেড়া' (সাঁওতাল-সুহৃদ) নামে প্রকাশিত হত। দুধানির ক্যাথলিক মিশনের 'মার্শাল তাবোন' (আমাদের আলো) ১৯৪৬ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলি খৃস্টবিষয়ক পত্রিকা। এদের লিপি রোমান।

বিহার সরকার ডোমন সাহুর সম্পাদনায় ১৯৪৭ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'হড়সম্বাদ' (সাঁওতাল সমাচার) প্রকাশ করছেন। দেবনাগরী লিপিতে সাঁওতাল সাহিত্য প্রচারের এটি একটি বিশিষ্ট মাধ্যম। 'সগুণ সাকাম' (নবপল্লব) নামে একটি সাঁওতালী পাক্ষিক দেবনাগরী ও বাংলা লিপিতে প্রকাশ করেছিলেন আদিবাসী মহাসভা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চাশের দশকে বাংলা লিপিতে 'গালমারাও' (কথাবার্তা) নামে একটি সাঁওতালী সাহিত্যপাক্ষিক প্রকাশ করেন, সেটিই এখন 'পছিম বাংলা' (পশ্চিমবঙ্গ) নামে রূপান্তরিত হয়েছে। ভবতোষ সোরেন কিছুকাল প্রকাশ করেন 'খেরওয়াড় আরাং'। বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হয় দ্বি-ভাষিক (বাংলা ও সাঁওতালী) 'সমাজবাণী'। এখন হাওড়ার সাঁওতালী প্রতিষ্ঠান আবোআঃ গাঁওতা প্রকাশ করেন 'এভেন' (জাগরণ) নামক পত্রিকা। উত্তরবঙ্গ থেকে ন্যাথানিয়েল মুর্মুর একটি সাঁওতালী পত্রিকা বেরোয়। 'তেতরে' নামে আর একটি কাগজ বেরোয় পুরুলিয়া থেকে। এছাড়া আছে 'হরিয়াড় সাকাম' (সবুজপত্র) এবং অন্যান্য পত্রিকাদি।

৮. অনুবাদ ও অন্যান্য

সাঁওতালীতে 'ঈশোপনিষদ' ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইত্যাদি অনুবাদিত হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজিতে সাঁওতালী লোকগীতিসংগ্রহ বেশ কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে। সাঁওতাল লিখিত বাংলা গ্রন্থের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের 'সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিলীপ সোরেনের 'সাঁওতাল শব্দ-পরিচয়' গ্রন্থটিও সাঁওতাল গবেষকের বাংলা ভাষায় বিশিষ্ট অবদান বলে গণ্য হবে।

সাঁওতাল সাহিত্যচর্চা এগিয়ে চলেছে। একদা মিশনরি ও রাজকর্মচারীদের এই ভাষাচর্চা ও লোকসাহিত্যসংগ্রহ দিয়ে এর যাত্রা সুরু হয়েছিল (স্ক্রেফসরুড, বডিং-এর সাঁওতালী ব্যাকরণ, গ্রিয়ার্সনের লিংগুইস্টিক সার্ভে স্মর্তব্য)। তারপর আর্চার-এর লোকগীতি সংগ্রহ অব্যাহত থাকে—সেই গীতিগুলি রবীন্দ্রনাথেরও প্রিয় ছিল। সব শেষে, ক্যাম্পবেলের ইংরেজি-সাঁওতালী ও সাঁওতালী-ইংরেজি অভিধান (নতুন মুদ্রণপ্রকাশ সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত) এবং বডিং-এর কয়েক খণ্ডের সাঁওতালী অভিধান গ্রন্থগুলি চিরস্মরণীয়। বডিং-এর সাঁওতাল-ব্যবহৃত ভেষজ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিও তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের নিদর্শন।

অনুবাদ, অনুবাদের সমস্যা ও দু'খানি বই

অনুবাদ সম্পর্কে দান্তে বলেছিলেন, অনুবাদক বিশ্বাসঘাতক (traduttore—traditore); কিন্তু দান্তের রচনার সঙ্গে সারা পৃথিবী ত অনুবাদের মাধ্যমেই পরিচিত! টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'র মড-কৃত অনুবাদ ভাল, না গার্নেট-কৃত অনুবাদ ভাল, এই তর্ক কয়েকজন পড়ুয়ার মুখেই শুনেছি—তাঁদের দ্বন্দ্ব ছিল অনুবাদ নিয়েই, অথচ কেউই রুশ জানতেন না। এক জীবনে হাজার হাজার ভাষা শিখে মূল গ্রন্থ পাঠের কল্পনা বাতুলতা মাত্র, কাজেই অনুবাদের সাহিত্যিক ও সামাজিক মূল্য স্বীকার করতেই হবে। বাঙালীদের গর্ব ও গৌরব যে তাঁরা অনেক আগে থেকে ইংরেজি শিখেছেন, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাভাষীদের চেয়ে দুএক পুরুষ আগে থেকেই বাঙালীদের ইংরেজি-চর্চা সুরু। আর এই ইংরেজিতেই রয়েছে সারা বিশ্বের বহু রচনার অনুবাদ। বাঙালী সেগুলির রসাস্বাদন করেছেন সর্বাধিক, কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে সাঙ্গীকৃত করেছেন কতটুকু? ভারতীয় অন্যান্য অনেক ভাষার চেয়েই বাংলার অনুবাদসাহিত্য পরিমাণে ন্যূন।

কবিতা অনুবাদ করা যায় কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। এই বিতর্কের নতুনভাবে সূত্রপাত করেন সম্ভবত কোলরিজ, যিনি এ ধরনের অনুবাদ সম্পর্কে বিরুদ্ধমত পোষণ করতেন। আধুনিককালে ফ্রস্ট অনুবাদের বিরোধিতা করেছিলেন কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে। তাঁর মতে কবিতা হল তাই যা অনুবাদ করলে আর গদ্য বা পদ্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথ 'কবিতার অনুবাদ পোড়ো না, ওতে কিছু পাওয়া যায় না' বললেও, নিজেই হাইনে, এলিয়ট, হুইটম্যান প্রমুখের কবিতার অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। এ-সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি স্মরণীয়: 'কবিতার অনুবাদও একটি সপ্রাণ, সংক্রামক, মূল্যবান সাহিত্যকর্ম, এবং কখনো কখনো—কবি আপন ভাষায় কবি হ'লে—তা সৃষ্টিকর্মেরও মর্যাদা পায়। যাকে লেখা বলে, তাও তো একরকমের অনুবাদ—ভাষার সাহায্যে চিন্তার অনুবাদ, কেউ কেউ একাধিক ভাষায় একই চিন্তার অনুবাদ করেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা আর ইংরেজি কবিতায়—আর নিজের ভাবনার অনুবাদ যে-সব মানসক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকে, অন্যের ভাবনার অনুবাদেও তার ব্যতিক্রম হয় না' ('কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত',

স্বদেশ ও সংস্কৃতি)। সুধীন্দ্রনাথ এ-ব্যাপারে প্রথমে বলেছিলেন, 'আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব'—পরে বলেছেন, 'অনুবাদে বৈশিষ্ট্যের অবকাশ যতই থাক না কেন, তার সুপরিমিত সীমা যেহেতু স্বেচ্ছাচারের পরিপন্থী, তাই তার চর্চা স্বায়ত্তশাসনের নামান্তর' (ভূমিকা, প্রতিধ্বনি)। বিষ্ণু দে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর অনুবাদে 'মূল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাসে বহন করতে' (ভূমিকা, হে বিদেশী ফুল)। অন্যত্র বিষ্ণু দে বলেছেন, 'এলিঅটের সব কবিতার অনুবাদ ঘটনে বাধা থাকলেও তাঁর রীতি আমাদের সহায় এমন কি তাঁর কবিতার অলঙ্কার, অঙ্গবিন্যাস, জগৎ ভিন্ন হলেও। কাব্যের মুক্তির চেতনায় ফল হয়েছে এই' (ভূমিকা, এলিঅটের কবিতা)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনুবাদ একটা বিশিষ্ট শিল্পকর্ম যার সামাজিক মূল্য অপরিসীম। সারা বিশ্বেই ত আজ আমরা কমবেশি একরকমের চিন্তা করছি, একরকমের পোষাক পরছি, মোটামুটি একই ধরনের বই পড়ছি, লিখছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সারা পৃথিবীই আমাদের ঘরবাড়ি। সারা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক অবদান প্রতিটি মানুষের উপভোগ্য। আমাদের সাহিত্যে গদ্যানুবাদ হয়েছে; কাব্যানুবাদ করেছেন, করছেন মূলত কবিরাই। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদের চাবিকাঠি আগেই দেখিয়ে গেছেন—তার পরেও উল্লিখিত তিরিশের কবিরা (এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র 'হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মহাপৃথিবীর কবিতা'য়) এই ঐতিহ্য বহমান রেখেছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়—বিশেষত লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে—অনুবাদের জন্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

আমার কৃত কিছু আদিবাসী কবিতার অনুবাদ 'শালপলাশ: বাংলায় আদিবাসী কবিতা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে আমার নিজের কিছু সংগ্রহ আছে—যা সুন্দরবনের কাকদ্বীপ, সাগর ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গার আদিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। অধিকাংশই আদিবাসীদের সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষাগ্রন্থে সংকলিত ইংরেজি কবিতার অনুবাদ। এইরকমই অপর একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে আমার যুগ্ম সম্পাদনায় 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী লোকসাহিত্য' নামে। 'শালপলাশ'-এ সংকলিত হয়েছে অসুর, মালপাহাড়িয়া, লেপচা, বিরহড়, ওরাওঁ, টোটো, সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, শাওরা, খাড়িয়া প্রমুখ আদিবাসীদের কবিতা।

আসলে এগুলি আদিবাসীদের গান। জীবনচর্যার বিভিন্ন পর্বে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এগুলি গীত হয়। বাংলায় এগুলিকে আমি ছড়ার ছন্দে রূপান্তর করেছি। সাঁওতালী ছাড়া অন্যান্য মূল আদিবাসী ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। সাঁওতালী গান শুনে মনে হয়, বাংলায় ছড়ার ছন্দেই আদিবাসীদের কবিতা খোলে ভাল। কোন কোন গবেষক বলতে চেয়েছেন যে বাংলার ছড়ার ছন্দ অস্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের অবদান। সাম্প্রতিক সাক্ষ্য-প্রমাণ সহযোগে এ বক্তব্যের ঐতিহাসিক সময় নির্ধারণ কতদূর সম্ভব তা বলতে পারি না, তবে দেখেছি আদিবাসীদের কবিতা বা গান, যার মধ্যে সহজ জীবন-যাত্রা, নিসর্গচিত্র বিবৃত হয়েছে তা ছড়ার ছন্দের আন্দোলনের মাধ্যমেই বেশ খানিকটা স্পষ্ট হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্তেরও সাহায্য নিয়েছি—সেখানেও ছন্দের দোলা পাঠককে আকর্ষণ করবে বলে আমার ধারণা, যেমন,

তৃষ্ণা মেটাতে ক্ষুধাও মেটাতে ভাঙা করে নিচু বুনলাম ধান
তবুও যে ক্ষুধা ক্ষুধার বেদনা এখনো বিদ্যমান (সাঁওতালী)

আদিবাসীদের লোককবিতা দ্রুত অবলুপ্তির পথে। তাঁদের সমাজ এখন আর আবদ্ধ সমাজ থাকছে না, অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাব তাঁদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন বৃদ্ধরা ও মেয়েরা ছাড়া এইসব লোককবিতার ধারক আর কেউ নেই—অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে এবং ধারকবাহকদের অন্যমনস্কতার জন্যে এগুলি হারিয়ে যাবেই। লোককবিতা সংগ্রাহকদের এগুলি সংগ্রহের দিকে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

এই সুপ্ত সম্পদ যা খানিকটা নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায়, লোককবিতা সংগ্রাহকের রচনায় এবং বেশির ভাগই আদিবাসীদের মুখেই রয়ে গেছে, তার অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বাড়াতে পারে নানাভাবে—১. আমরা বিদেশী সাহিত্য পাঠ করেছি এতকাল, আমাদের কবিতায় তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অনেক—আদিবাসীদের কবিতার অনুবাদ স্বভাবতই আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনমুখী হতে সাহায্য করে; ২. আমাদের আশপাশের নিসর্গচিত্র আদিবাসী কবিদের চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পারি, পাখির গান, নদীর কলতান আমরা তাদের কান দিয়ে শুনতে পাই।

এই কবিতাগুলির অনুবাদকালে প্রথমেই মনে হয়েছে যে, সেই অজানা লোককবিদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকা চাই অপরিসীম; তাদের এই ঝকঝকে কবিতাগুলির জন্যে ত তারা সম্পাদকের দ্বারে দ্বারে ঘোরেনি—নিজেদের

আনন্দেই তারা গান বেঁধেছিল, গান গেয়েছিল। আমরা অন্তত সেই স্বাধীন চেতনার রসাস্বাদন করি।

আমার 'বদল্যারের উন্মোচিত হৃদয়' (১৯৭১) গ্রন্থটি বদল্যারের 'ম' কর মিজা নু' (আমার উন্মোচিত হৃদয়) নামক তাঁর ডায়েরি ও 'প্রেমের আপ্তবাক্য' বা 'সোয়া দ মাক্সিম কঁসর্লাৎ স্যুর লামুর' নামক নিবন্ধের অনুবাদ। এই ডায়েরিটি ইংরেজিতে 'ইন্টিমেট জর্নালস' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। আমি এটি খুব দ্রুত অনুবাদ করেছিলাম। মূলগ্রন্থ ইংরেজি হলেও, কখনো কখনো 'লালিয়ঁাস ফ্রাঁসে দ্য কালকুত্তা'য় পড়া আমার সামান্য ফরাসী ভাষার বিদ্যে দিয়ে আমি এটাসেটা দেখেছিলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে মূল গ্রন্থে এবং ল্যারুসের অভিধানে। যতদূর জানি, বদল্যারের এই ডায়েরিটির বাংলা অনুবাদ হয়নি। অথচ কবির কবিতা বুঝতে গেলে অনেক সময় তাঁর একটি চিঠি হয়ত খুবই সাহায্য করে, ডায়েরি ত করেই। আমার গ্রন্থটির ভূমিকা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে—'কবিতার বদল্যার এবং জীবনের বদল্যার যেন একই লোক—দুজনেই সমান দার্শনিক, দুজনেই জীবনকে আলোকের দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন। দুজনেই সোজা কথা, মনের কথা, ঘরের কথা সোজাভাবে বলছেন। বদল্যারের কবিতা ও জীবনের যোগসূত্র রচনা করেছে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তার 'উন্মোচিত হৃদয়' সংকলনটি। কবিতার মত ঝকঝকে সুন্দর পংক্তিতে, অল্প কথায় ইঙ্গিতে তিনি নানা দিক থেকে তাঁর মনের দরজা খুলে দিয়েছেন এই গ্রন্থে। 'নষ্টকুসুম' কাব্যগ্রন্থের পশ্চাৎপটে আছে এই ডায়েরিটি, নষ্ট জীবনের পশ্চাতেও এর স্বীকৃতিগুলির ঐতিহাসিকতা অনস্বীকার্য'।

বদল্যার যে কত বড় লেখক ছিলেন তা তাঁর ডায়েরির অনেক উক্তি থেকেও বোঝা যায় : 'স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা করা ও কেমন করে স্বপ্ন দেখতে হয় তা জানা আবশ্যিক। প্রেরণার উদ্রেক। জাদু শিল্প। এক্ষুনি বসতে হবে ও লিখতে হবে। আমি বড় বেশি বিচার বিবেচনা করি। খারাপ হলেও তাৎক্ষণিক কর্ম দিবাস্বপ্নের চেয়ে ভাল। ইচ্ছাধীন ছোট ছোট কর্মপরম্পরা বৃহৎ ফল এনে দেয়। ইচ্ছার প্রতিটি পরাজয় হারানো জিনিসের অংশ হয়ে যায়। তা হলে দ্বিধা কত অপব্যয়ী! এত অপচয় মেরামত করতে যে কি পরিমাণ শেষ প্রয়াস দরকার তার থেকেই একথার বিচার করা যায়। যে লোক তার সান্ধ্য প্রার্থনা উচ্চারণ করে সে যেন এক ক্যাপ্টেন যে তার পাহারাদারদের ঠিক মত জায়গায় দাঁড় করিয়েছে' (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪-২৫)।

কোন অনুবাদের প্রথম শর্ত এই হওয়া উচিত যে অনুবাদকের যেন তাঁর নিজের ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল থাকে। দ্রুত অনুবাদ করতে গেলে হাতের পাশে যোগ্য অভিধান থাকা দরকার। বাংলা ভাষায় হরিচরণ ও জ্ঞানেন্দ্র-মোহনের মত বা ইংরেজি অক্সফোর্ড অভিধানের মত ইংরেজি-বাংলা তেমন কোন ভাল অভিধান নেই—অনুবাদকের পক্ষে তার কাজের এ একটা প্রধান অন্তরায়। অনুবাদের সংযমের জন্যে যে কোন লেখকই মাঝে মাঝে সংযমী হতে বাধ্য হন। ছোট বড় প্রত্যেক লেখকেরই যে-কোন একখানি গ্রন্থের অনুবাদকর্ম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে পুষ্ট করা উচিত।

কবিপত্রে কাব্যচিন্তা

পূর্বকথা

অডেন তাঁর সেই ছোট্ট কবিতাটিতে শেক্সপীয়রের একটিও চিঠি নেই বলে খেদ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এক শিলিং-এর সেই জীবনীতে সব জানা যাবে—কেমন করে তার বাবা তাকে মারতো, সে পালিয়ে যেত, যৌবনে কিসের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, কী কাজ করে সে তার কালে মহানায়ক হয়ে যায়, কেমন করে সে লড়াই করতো, মাছ ধরতো, শিকার করতো, সারারাত কাজ করতো, ঝিমুনি লাগলেও নতুন পাহাড়ে চড়তো, কোন সাগরের নাম দিত ইত্যাদি। আধুনিক গবেষণায় এমনও বলে যে, সে প্রেমে পড়ে নাকি আমাদের মতই কেঁদে বুক ভাসাতো। কিন্তু সব সম্মান পেয়েও সে একজনের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো যে থাকতো বাড়িতে, যে নিপুণতার সঙ্গে বাড়ির টুকিটাকি কাজ কবতো, শিস দিত, চুপচাপ বসে থাকতো কিংবা বাগানে এলোমেলো ঘুরে বেড়াত—খুব লম্বা সুন্দর চিঠিও লিখতো যার একটাও আর পাওয়া যায় না।

শেক্সপীয়রের চিঠির অভাব যুগে যুগে দেশে দেশে অনেক কবি ও অন্যান্য শিল্পকাবেরা পূরণ করে গেছেন, কিন্তু শেক্সপীয়বের অনেক আগে থেকেই এই পত্রসাহিত্যের ঐতিহ্য বর্তমান ছিল। প্রাচীনকালে কবিদের মধ্যে হোরেস, ওভিদ, পেত্রার্ক কাব্যরূপে নানাধরনের চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যে সাহিত্য-সম্পর্কিত চিঠিও ছিল। ইংরেজি সাহিত্যে নানা লোক নানা চিঠি লিখেছে ষষ্ঠদশ শতক থেকে—সেগুলি প্রধানত সমাজদর্পণ। কবিদের মধ্যে ডন, মিলটন, গোল্ডস্মিথ প্রমুখ অনেকেই সমাজ-ও-রাজনীতিপ্রধান চিঠি লিখেছেন। ঔপন্যাসিকেরা চিঠি সাজিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, উনিশ শতকে সুইনবার্নও তাঁর একমাত্র উপন্যাসের দ্বিতীয় শিরোনামা দিয়েছিলেন 'এক বছবের চিঠি' বলে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকেই চিঠিতে সহজ আত্মপ্রকাশের সুর লাগলো। চিঠি ক্রমশই সহজ, স্বাভাবিক ও সুপ্রকাশিত হতে আরম্ভ করলো, যে লেখে আর যে পড়ে তাদের দুজনের মনের সেতুবন্ধন হল চিঠিতে। কত বড় বড় কথা সহজ খোলামেলাভাবে প্রকাশিত হল সেই সব চিঠিতে। আমরা

তাতে পরবর্তী কালের কবিদের জীবন ও শিল্পের নানাদিক উন্মোচিত হতে দেখলাম। অন্য অনেকের মতই গ্রে, কুপার থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত দেশবিদেশের নানা কবি সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখেছেন। এইসব চিঠিতে কবির বিশেষ মেজাজ ছাড়াও তাঁর শিল্পনির্দেশনা, ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ ইত্যাদি আছে। ঐতিহ্যাশ্রিত কাব্যশিল্পকে বুঝতে গেলে সব কবিদের মনের মধ্যে, অর্থাৎ তাঁদের চিঠিগুলিতে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। পশ্চিমে বহুকাল থেকেই কবিদের মোটা মোটা পত্রসংগ্রহ প্রকাশিত হচ্ছে। পাঠক আমরা সেই চিঠিগুলির শিল্পমূল্য ছাড়াও সেগুলিকে গ্রীনরুমের উপকরণ হিসেবে দেখবো। সেই কবিদের অনেকেই সহজ মানুষের মত প্রেমিকাকে চিঠি লিখেছেন, সমাজ-নীতি, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, নিজেদের জীবনের নানাদিক উদ্ঘাটন করেছেন। এসব ব্যাপারে সাহিত্যগুণান্বিত চিঠিতে তীব্র আবেগ থাকলেও অনেক সময়ে তথ্যের ভুল থাকতে পারে, কিন্তু যখন তাঁরা খুব খোলা-মেলাভাবে নিজেদের শিল্পকর্মের বা শিল্পভাবনার কথা বলেন তখন সেটা তত্ত্বকথা হয়ে যায় এবং তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশ পায়। কীটসের বা ব্রাউনিং দম্পতির বিখ্যাত প্রেমপত্রগুলি পত্রসাহিত্যের বিরল সৃষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য কোন গুণী ভাষাশিল্পী যদি সেগুলি লিখতেন তাহলেও অবাক হবার কিছু ছিল না, কিন্তু এই কবিরা ও অন্যান্য আরও অনেক কবি যখন তাঁদের শিল্পকর্মপদ্ধতি তাদের চিঠিতে প্রকাশ করেন তখন সেগুলি হয়ে দাঁড়ায় অনন্য শিল্পচিন্তা।

কিন্তু কবিরা নিজেদের চিঠি সম্পর্কে কী ভাবেন? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তাঁর চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।' এ ত গেল একদিক—চিঠির উৎকর্ষের কারণ-বিশ্লেষণ, কিন্তু চিঠির স্বরূপ কী? রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছেন, 'মানুষের একটা বিশেষ খাতা আছে, তার আলগা পাতা, সেটা যা-তা লেখবার জন্যে, সে লেখার দামের কথা কেউ ভাবেও না। লেখাটাই তার লক্ষ্য, কথাটা উপলক্ষ্য। সে রকম লেখা চিঠিতে ভালো চলে, আটপৌরে লেখা—তার না আছে মাথায় পাগড়ি, না আছে পায়ে জুতো। পরের বা নিজের কোনো দরকার নিয়ে সে যায় না—সে যায় যেখানে বিনা দরকারে গেলেও জবাবদিহি নেই, যেখানে কেবলমাত্র বকে যাওয়ার জন্যেই যাওয়া-আসা। স্রোতের জলের যে ধ্বনি সেটা তার চলারই ধ্বনি, উড়ে-চলা মৌমাছির যেমন পাখার গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই

মানসিক চলে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে বকে যাওয়া।… বক্তৃতার জন্যে লোক চাই অনেক, বকার জন্যে এক-আধজন।' রবীন্দ্রনাথ চিঠির হালকা চালের কথাই বলেছেন, আমরা জানি তাতে অনেক নিগূঢ় কথা বলা হয় —তাঁরই কথায় 'পাত পেড়ে ভোজ দেওয়া তাকে বলা চলবে না; সে হবে গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাওয়ায় পড়ে-যাওয়া ফল আঁচলে ভরে দেওয়া। তার কিছু পাকা, কিছু কাঁচা; তার কোনোটাতে রঙ ধরেছে, কোনোটাতে ধরেনি। তার কিছু রাখলেও চলে, কিছু ফেলে দিলেও নালিশ চলবে না।' আমরা কবিদের রচনায় তাঁদের ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ দেখতে পাই। মার্কিন কবি জেমস রাসেল লাওয়েলের ভাষায় 'মদে একটু পিপের গন্ধও থাকা দরকার'। র‍্যাঁবোর উচ্ছ্বাস দেখি তাঁর চিঠিতে, যেমন বায়রনের চিঠিতে দেখি এক প্রতিভাবানের কাটা-কাটা সুন্দর কথোপকথন। কীটসের চিঠিতে পাই নম্র সুর। প্রত্যেকের চিঠিতেই তাঁদের ব্যক্তিত্বের ছাপ লেগে থাকে। অসকার ওয়াইলড একজন সুন্দর বক্তা ছিলেন, তাঁর সেই কথোপকথনের মেজাজ আছে তাঁর চিঠিতে। আঁদ্রে জিদকে একদা ওয়াইলড বলেছিলেন: 'আমার জীবনের বৃহৎ নাটকটি জানতে চান? সেটা হল, আমি আমার প্রতিভা জীবনে মিশিয়ে দিয়েছি, শিল্পকর্মে রাখিনি।' তাই যদি হয়, তবে প্রতিভার স্বরূপ নিশ্চয়ই উন্মোচিত হয় চিঠিতে যাতে সহজ সুরে গভীর কথা বলা যায়।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী কাব্যসম্পর্কে তাঁদের ধ্যানধারণা ও অভিজ্ঞতা বিবৃত করে। মধুসূদনের ইংরেজি পত্রাবলী আমাদের সম্পদ, আর রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি পত্রাবলী, বিশেষত, 'লেটার্স টু এ ইয়ং ফ্রেণ্ড' বিশ্ববন্দিত

রবীন্দ্রনাথের উরবনা, ইলিনয় থেকে ৫ জানুয়ারি ১৯১৩ তারিখে এজরা পাউণ্ডকে লেখা ছোট্ট চিঠিটি পত্রমৈত্রীর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আমাদের বর্তমান ইংরেজি বর্জনের যুগে তাঁর ইংরেজি ভাষার প্রতি মমতা বড় স্পষ্ট চোখে পড়ে। কিছু অনুবাদ পাঠিয়ে তিনি লিখেছিলেন '…আমি ইংরেজি ব্যাকরণ মোটেই ভাল জানি না—যেখানে দরকার দয়া করে সংশোধন করে নিতে দ্বিধা করবেন না। এ ছাড়া আমি আপনাদের ইংরেজি শব্দের সঠিক অর্থও জানি না'—অথচ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি এই সমৃদ্ধ ভাষার শব্দ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এদের কতকগুলি সর্বদা ব্যবহারের ফলে নিহিতার্থ হারিয়ে ফেলেছে এবং আর কতকগুলি সম্ভবত এখনও পর্যন্ত নিহিতার্থই অর্জন করে নি।' সবশেষে বলেছিলেন, 'সুতরাং

আমার শব্দব্যবহারে পরিমিতিবোধ ও যথোপযুক্ততার অভাব দেখা গেলে তা বন্ধুর করস্পর্শে মার্জিত হতে পারে।'

সংগ্রথিত নীচের চিঠিগুলির অনুবাদে নানা কবির নিজের বা পরের কবিতা, কাব্যাদর্শ, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ পেয়েছে। একটি কি দুটি চিঠিতে সার্বিক ব্যক্তিত্ব খুঁজে না পেলেও বিন্দুতে অন্তত সিন্ধুর স্বাদ প্রত্যাশা করা যায়।

পত্রাবলী

১. রাইনার মারিয়া রিলকে ১৮৭৫-১৯২৬ হানস উলব্রিখট-কে ২৪ মার্চ ১৯২৬

তোমার চিঠি এবং তোমার একটি ও আরো একটি (বিশেষ করে শেষেরটি) লিরিক প্রচেষ্টায় এমন কতকগুলি নিজস্ব ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রকাশ আছে যাতে তোমায় স্পষ্ট চেনা যায়; কিন্তু দুরকম উচ্চারণেই (একটি শৈল্পিক ও একটি বার্তাবাহী) বড় বেশি সাদৃশ্য।

এর ফলে (আবার একবার) আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে একটা বয়সে লিরিক রচনা কি ব্যর্থ ও অসহায় কর্ম, যেহেতু তার কাজ ভাষার মাধ্যমে এবং তা যথেষ্ট শিল্পকর্মের মাধ্যমে স্বাধীন কোন কিছুকে গড়ে উঠতে দেয় না (আমি শৈল্পিক অর্থে একথা বলছি না বলছি একান্ত জৈব অর্থে)। যা নিয়ত জীবন থেকে উৎসারিত হয় তাই আবার জীবনের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—একটা অস্তিত্ব যা এভাবে নিজেকে নির্ভর করতে গিয়ে নিজের কাছে যে সব জিনিস অসহ্য সে সবের নিবিড়তর প্রকাশে নিজেকে আরো জড়িয়ে ফেলে, আপাতবিদূরিত ও বিমুক্ত আপন দুঃখের ভারে নত হয়, তাদের কৃপার পাত্র হয় যদি না কখনো লিরিক চেতনায় আচ্ছন্ন ও বিধৃত হত। যেখানে তরুণ প্রতিভাও এই প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসে অথবা এক অর্থে এর সূচনা করে (হাইম[১] বা ট্রাক্‌ল্[২]), সেখানেও ফলশ্রুতিকে জয় করার মত বা রূপান্তরে আনন্দবর্ধনের জন্যে অল্পই বস্তু থাকে; একজন ট্রাক্‌ল্ (ভেবে দেখো) যে তার প্রতিভা কবিতার বদলে ছবি-

১ কবি গেওর্গ হাইম (১৮৮৮-১৯১২) স্কেটিং করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যান

২ কবি গেওর্গ ট্রাক্‌ল্ (১৮৮৭-১৯১৪) আত্মহত্যা করেন

আঁকা বা সঙ্গীতে লাগাতে পারতো, সে অত্যধিক কর্মভারে মারা যেত না, যা তাকে অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল।

যেহেতু, তোমারই কথামত, জীবন তোমার কাছে দ্রুত নানারকমের পরিবর্তন দাবি করবে: হোক না তারা—যা আমিও ইচ্ছে করি—তাই যা তোমার হাতে এখনই স্পর্শযোগ্য কিছু গুঁজে দেবে, খুব স্পষ্ট অর্থে কোন পেশাই। ভয় রইলো কিছুকাল তুমি কবিতা লেখার চেষ্টা করতেও পারবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তোমার হাতে একটা কলম থাকে, তবে তাকে 'ভাবুকতার' চর্চা থেকে বিরত করো, তাকে তোমার ও বিশেষ করে দূরবর্তী জীবনের বাস্তব ঘটনা টুকে রাখতে বাধ্য করো, এবং যেমন ভাবেই হোক, যে-কলম দিয়ে বন্ধুদের তোমার উন্নতি ও কর্মের নিদর্শন দেখাও, সেটি ছাড়া, দ্বিতীয় একটি কলম তুলে নাও যেটি তুমি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে: এবং এই দ্বিতীয় কলম থেকে যা কিছু উৎসারিত হয় তার জন্যে বিচলিত হয়ো না, তোমার সামান্যতম রচনার প্রতিও কঠিন হও। কারিগর হিসেবে যা তুমি লিখেছো, যাকে এই অপর কলমটি সীমাচিহ্নিত করে তা তোমার জীবনের ওপর আর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না, রূপ দেবে, স্থান বদলাবে, রূপান্তর ঘটাবে যার প্রতি তোমার 'আমিত্ব' প্রথম ও শেষ উৎসাহ জুগিয়েছে, কিন্তু যা তখন থেকেই তোমার কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়, তোমার উদ্দীপনা থেকে জন্মে কিন্তু একই সঙ্গে তোমার কাছ থেকে দূরে শৈল্পিক বিচ্ছিন্নতার স্তরে, কোন এক বস্তুর নির্জনতায়, গিয়ে সরে থাকে যাতে তুমি এই রহস্যময় তন্ময় বস্তুটির পূর্ণতাসম্পাদনে নিজের ভূমিকাটা শুধুমাত্র কোন এক নীরব হুকুমতামিলকারীর মত অনুভব করো।

যাই হোক ব্যাপারটা তোমার কাছে জরুরি: তোমাকে তোমার লিরিক কবিতার এই পরিবেশ ছাড়িয়ে যেতে হবে, কবিতার পিছন পিছন যেমন ঘোরো চিঠির পিছনে তেমন ঘুরো না, এবং জীবনকে চিত্তবৃত্তির ও অনুভূতির অবিশ্বাস-যোগ্যতার একটা সুযোগ বলে মনে করো না। এটা তার চেয়েও বেশি। এটা খুবই খারাপ হবে যদি শব্দবিদ্ধ হয়ে তোমাকে শেষে যৌবনের বিমূঢ়তাই বহন করতে হয় এবং তুমি না জানো যুবক-হওয়ার আচ্ছন্নতা কাকে বলে, যা শুধুই অস্তিত্ব বলে গণ্য।

২. ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স ১৮৮৫-১৯৩০ এডওয়ার্ড গার্নেটকে ১৭. ৪. ১৯১৩

আমি দুঃখিত যে কবিতাগুলি মাত্র ১০০ কপি বিক্রি হয়েছে। —ফ্রিডা দারুণ ক্ষুব্ধ। তোমার কি মনে হয় না ডাকওয়ার্থের মুদ্রাকর বা আর কেউ অত্যন্ত মন্থর? যদি কেউ চায় যে জিনিসগুলি গরম কেকের মত বিক্রি হোক তাহলে কেকগুলোর অবশ্যই গরম হওয়া উচিত। কিন্তু কাব্যগুলি কয়েকমাস পড়ে ছিল—'সন্স অ্যাণ্ড লাভার্স'ও সেইরকম পড়ে আছে। এর যেটুকু আকর্ষণ তা ধীরে ধীরে উত্তাপ সঞ্চার করছে। এটা ভাল নয়—যদি এখন 'হ্যামলেট' ও 'ঈডিপাস' প্রকাশিত হত, তাহলে তারাও ১০০ কপির বেশি বিক্রি হত না যদি না সেগুলির জন্যে তদ্বির ('পুশ') করা হত: আমি জানি যতদিন আমার নাম না হয় ততদিন তার টাকার জন্যে ডাকওয়ার্থকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি বুঝেছি সে আমাকে এগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একটু দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু তার ভয় করার দরকার নেই। আমি জানি ইংল্যাণ্ডের যে কোন লোকের চেয়ে বৃহত্তর জিনিস লিখতে পারি। এবং আমি যা পারি তাই আমাকে লিখতে হবে। আমি ডেভিড ও হ্যারলড শ্রেণীর লোকদের জন্যেই লিখি—তারা শিগ্গি আমার লেখা পড়বে। আমার কথাবস্তু তারা যা চায় তাই: যখন তারা জানতে পারবে তারা কী চায়। তুমি অপেক্ষা করে থাকো।... আমি কি 'ফোরাম' পত্রিকার জন্যে কিছু কবিতা আর একটি গল্প পাঠাবো? · আমার মনে হয় আমাদের এই চিঠিগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ। ফ্রিডা এত লম্বা চওড়া লেখে যে আমাকে গুটিয়ে ছোট করতে হয় নিজেকে। আমি খুব সংক্ষিপ্ত হতে পারি।...

৩. (ক) অসকার ওয়াইল্ড ১৮৫৪-১৯০০ স্তেফান মালার্মেকে

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

আপনি যে মধুর ভঙ্গিমার ঐ মহৎ গদ্যসিম্ফনিটি—যা মহান কেলটিক কবি এডগার অ্যালান পোর প্রতিভানিঃসৃত সঙ্গীত দ্বারা অনুপ্রাণিত—আমাকে উপহার দিয়েছেন তার জন্যে কেমনভাবে আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত জানি না। ইংল্যাণ্ডে আমাদের গদ্য এবং কবিতা আছে, কিন্তু ফরাসী গদ্য ও কবিতা আপনার মত প্রতিভাধরের হাতে এক এবং একই বস্তু হয়। 'ফনের অপরাহ্নে'র লেখককে জানার সুযোগ কারুর কাছে খুব আনন্দদায়ক না

মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন তার আবিষ্কারেই আপনার অবিস্মরণীয় সত্যতাকে জানা যায়।'

অতএব, প্রিয় মাস্টার, আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

(খ) ডবলিউ গ্রাহাম রবার্টসনকে (১৮৮৮ ?)

ছবিগুলোর জন্যে তোমায় ধন্যবাদ। আমার আনন্দের প্রকৃত উৎস ওগুলি। তুমি ফিরে আসার মধ্যেই আমি আশা করি গল্পটা শেষ করতে পারবো। আমার ইচ্ছে আমি যদি তোমার মত আঁকতে পারতাম, কারণ আমি শব্দের চেয়ে রেখা ও বাক্যের চেয়ে রং বেশি পছন্দ করি।

যাই হোক, 'বিশ্বকে' মাঝে মাঝে সনেটে বিধৃত করার চেষ্টা করে নিজেকে সান্ত্বনা দিই।

কোন একদিন তুমি নিশ্চয়ই সনেটের জন্যে একটা ছবি আঁকবে: একটি যুবক এক অদ্ভুত স্ফটিকের দিকে তাকিয়ে আছে যার মধ্যে সারা পৃথিবী প্রতিফলিত। কবিতাকে স্ফটিকের মত হতে হবে, এটা পৃথিবীকে আরো বেশি সুন্দর ও আরো কম বাস্তব করবে। তুমি চলে যাচ্ছো বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু তোমার নার্সিসাস তোমাকে আমার মনে গেঁথে রেখেছে!

৪. জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স ১৮৪৪-৮৯ আর. নিক্সনকে ৫ অক্টোবর ১৮৭৮

...আপনি মিলটন সম্পর্কে যা লিখেছেন তার সঙ্গে আমি একমত। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় তা দরকারী এবং চিরন্তন (পারসেলের সঙ্গীতও আমার কাছে তাই মনে হয়)। এখন মিলটনকে বেশ ভাল করে পড়া হচ্ছে, এবং ম্যাসন তাঁর একটা জীবনী লিখছেন বা লিখেছেন। কোন এক ত্রৈমাসিকে 'মিলটন সম্পর্কে ফরাসী সমালোচক (মনে হয়, শেরের)-এর মত' এই প্রবন্ধের ম্যাথু আর্নল্ডকৃত একটা সুন্দর রিভিউ দেখেছি। সেই ম্যাথু আর্নল্ডই বলেছেন মিলটন ও ক্যাম্পবেল আমাদের দুই স্টাইলের রাজা। মিলটনের শিল্পকলা অতুলনীয়, কেবল ইংরেজি সাহিত্যেই নয়, আমার মতে যে কোন সাহিত্যেই; গ্রীক বা রোমান সাহিত্যের সুন্দরতমের সঙ্গে সমান, যদি না তার চেয়েও বেশি কিছু হয়। তাঁর কাব্যে, ছন্দে, রীতিপ্রকরণে এই গুণ সবিশেষ

দেখা যায় বলে, এটা বিস্ময়কর লাগে যখন দেখি নিউম্যানের মত বিরাট লেখকও ভুল করে 'অ্যাগনিস্টেসের' প্রথম কোরাসটি 'থালাবার' (সাদের কবিতা) আবক্তের সঙ্গে তুলনা করেন এই বলে যে মিলটনের পরে কাব্যরূপে মসৃণতা ও শুদ্ধতা লাভ করা গেছে—যদিও মিলটন কাব্যের গঠনভঙ্গিতে শুধু যে তাঁর কালের এবং পরবর্তী কালেরই অগ্রবর্তী তাই নন, এই বিশেষ কোরাসগুলি তাঁর নিজেরই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ যেন দেবীমন্দিরের ফ্রিজের সঙ্গে পায়ের টেবিলের তুলনা করে শেষেরটির সপক্ষেই রায় দান।

আমি মিলটনের ছন্দপ্রকরণের দিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছি এবং তাঁর শেষ পর্যায়ের ছন্দ সংগ্রহ করেছি: একাজ আমি করেছিলাম যখন কয়েক বছর আমাকে ছন্দ-অলঙ্কারের ওপর বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ আমি দেখেছি 'প্যারাডাইস রিগেনডে' এবং লিরিকের সুরে 'অ্যাগনিস্টেস'-এ। আমি প্রায়ই সে-সম্পর্কে লিখবো ভেবেছি, সাধারণভাবে ছন্দের ওপরই লিখবো ভেবেছি, আমার মনে হয় বিষয়টি কমই বোঝার চেষ্টা হয়েছে।

আমি কবিতা লিখি কি না আপনি জিগ্যেস করেছেন। যা লিখেছিলাম জেসুইট হওয়ার আগেই পুড়িয়ে ফেলেছিলাম এবং যদি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরা ইচ্ছে না করেন ত আর লিখবো না বলে মনস্থ করেছিলাম যেহেতু তা আমার জীবিকার সমধর্মী ছিল না; সেইজন্যে সাময়িক প্রয়োজনে উপহারের জিনিস হিসেবে সাত বছরের মধ্যে আমি দুতিনটি ছাড়া আর কিছুই লিখি নি। কিন্তু '৭৫ এর শীতে যখন টেমসের মুখে ডয়েটসল্যাণ্ড জাহাজটি ডুবে গেল, এবং ফক আইনের বলে জার্মানি থেকে নির্বাসিত পাঁচ জন ফ্রানসিসকান সন্ন্যাসিনী ডুবে মারা গেলেন, তখন আমি সেই ঘটনার কথা শুনে খুব বিচলিত হয়েছিলাম এবং রেকটরকে সেকথা বলতে তিনি কেউ যদি বিষয়টি নিয়ে একটি কবিতা লেখে এমন ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এই আভাস পেয়ে প্রথমে আমার অভ্যাস ছেড়ে গেলেও আমি কাজে লেগে গেলাম ও একটি কবিতা লিখলাম। অনেক দিন ধরে আমার কানে একটি নতুন ছন্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল যা এবার আমি কাগজে রূপ দিলাম। অল্প কথায়, অক্ষরের ('সিলেব্‌ল') সংখ্যার হিসেব ছাড়াই এটা কেবল প্রস্বর ('অ্যাকসেন্ট') ও ঝোঁকের ('স্ট্রেস') মাধ্যমে পর্ব-বিভাগ বোঝায়, যার ফলে কোন 'পর্ব' বলতে একটি কঠিন অক্ষর বা অনেকগুলি সহজ ও একটি কঠিন অক্ষর বোঝায়। আমি বলছি না চিন্তাটা সম্পূর্ণ নতুন; সঙ্গীতে, শিশুকবিতায়, জনপ্রিয় চুটকিতে এর আভাস আছে, এবং তার পর

থেকে আমি সমালোচকদের কথায় এটি সম্ভবপর বলে উচ্চারিত হতে শুনেছি। দৃষ্টান্তগুলি এই—'ডিং ডং বেল ; পুসি'জ ইন দি ওয়েল ; হু পুট হার ইন ? লিট্‌ল্ জনি থিন। হু পুলড হার আউট ? লিট্‌ল্ জনি স্টাউট'। সেই রকমই, 'ওয়ান টু, বাক্‌ল্ মাই শু' ইত্যাদি। ক্যাম্পবেলে পাবেন 'অ্যাণ্ড দেয়ার ফ্লীট এ্যালং দি ডিপ প্রাউডলি শোন'—'ইট ওয়াজ টেন অব এপ্রিল মর্ন বাই দি চাইম' ইত্যাদি। শেক্সপীয়রের 'হোয়াই শুড দিস ডেজার্ট বি ?' সম্পাদকেরা ভুল করে সংশোধন করেছেন, মুরের ছোট্ট গানটা অবশ্য আমি উদ্ধৃত করতে পারছি না। আমি যতদূর জানি কেউ-ই এটা জোর গলায় এবং পুরোপুরি রীতি হিসেবে ব্যবহার করেন নি। এতদ্‌সত্ত্বেও, আমি স্বীকার করি, আমার মতে এটি সাধারণ পদ্ধতির চেয়েও ভালো এবং স্বাভাবিক, অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক ও এর অনেক বেশি সম্ভাবনা। যাই হোক, ঝোঁক-গুলিকে আমায় নীল খড়ি দিয়ে চিহ্নিত করতে হয়েছিল, সেগুলি ও পংক্তিতে পংক্তিতে বিন্যস্ত আমার মিলগুলি, আমার পঠিত ওয়েলশ কবিতার কিছু ধ্বনি এবং আরো অদ্ভুত কয়েকটি বস্তু কোন সম্পাদকের চোখে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতো, সেইজন্যে যখন আমি এটি আমাদের 'মানথ' পত্রিকায় দিলাম তখন তারা প্রথমে এটি গ্রহণ করলেও, কিছুদিন পরে পিছু হাঁটলো এবং এটি ছাপতে সাহস করলো না। এটা লেখার পর আমি লেখার ব্যাপারে মুক্ত হলাম, কিন্তু তবু বিবেকের কাছে এগুলি লিখে কালক্ষেপ করার সাড়া পাচ্ছিলাম না, সেইজন্যে আমি অল্পই লিখেছি এবং আরো অল্পই লিখবো। ইউরিডিসের ওপর একটি ছোট কবিতা লিখেছিলাম, সেও আমার দেওয়া নাম এই 'স্প্রাং রিদমে', এবং এটি আরো সহজ, আরো ছোট, ও চিহ্নহীন ছিল এবং এটিও 'মানথ'-কে দিলাম, কিন্তু তারা এটাও পছন্দ করলো না। আমি কিছু সনেট ও ছোট ছোট আরো কিছু লেখা লিখেছি, কয়েকটি 'স্প্রাং রিদ্‌ম্'-এ আরো নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে—'বাড়তি পর্ব' হিসেবে, যাতে অংশবিশেষ পর্ব-বিভাগের সময় ধরা হয় না (আর্ষপ্রয়োগ হিসেবে যা শেক্সপীয়রের নাটকে দেখা যায়, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে পরিকল্পিত প্রয়োগ); অন্যগুলি সাধারণ পর্ববিভাগে বিপরীত সঙ্গীতাবদ্ধ (counterpoint) হত [এই হল বিপরীত সঙ্গীত : 'হোম টু হিজ মাদার'স হাউস প্রাইভেট রিটার্ণ্ড' এবং 'বাট টু ভ্যাংকুইশ বাই উইজডম হেল্লিশ ওয়াইলস' ইত্যাদি]; অন্য একটি দুটি সাধারণ বিপরীত সঙ্গীতবিহীন

ছন্দে লেখা। কিন্তু লেখার উৎসাহের অভাব আছে কেননা প্রকাশ করার কোন চিন্তাই আমার নেই।

আমি এই সঙ্গে বলবো যে মিলটন বিপরীতসঙ্গীতের (counterpoint) মহান আদর্শ। 'প্যারাডাইস লস্ট' ও 'রিগেনডে', বিশেষত শেষেরটায় খুব বেশি করে আছে, যেহেতু সেটাতে তাঁর প্রকরণগত প্রাগ্রসরতা দেখা যায়, তিনি সব জায়গাতেই 'কাউন্টারপয়েন্ট' ব্যবহার করেন, এখানে সেখানে স্পষ্টতই ব্যবহার করেন; কিন্তু আমার বিচারে 'স্যামসন অ্যাগনিস্টেস'-এও আগাগোড়া 'কাউন্টারপয়েন্টে'র ব্যবহার, অর্থাৎ, প্রায় প্রতি পংক্তিতেই দুটি আলাদা পর্ববিভাগ পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু সেই বিন্দুতে পৌছোলে দ্বিতীয় পর্যায়ের বা 'মাউন্টেড রিদ্‌ম্‌', যা প্রকৃতই 'স্প্রাং রিদ্‌ম্‌' মৌল ও চিরাচরিতটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তখন এটা বাড়তি হয়ে যায় ও এটিকে ছেঁটে ফেলা যায়; ঐ শেষ পন্থা অনুসরণ করে সোজা 'স্প্রাং রিদমে' পৌছোনো যায়। মিলটন অবশ্যই এটা জানতেন কিন্তু এটা না গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি ছিল।

৫. স্তেফান মালার্মে ১৮৪২-৯৮ ফ্রাঁস কাউন্টির গেজেটে সেপ্টেম্বর ১৮৭২

আপনার সম্মানিত পত্রিকা ঠিকই ঘোষণা করেছেন যে বহুকাল থেকে ভিক্টর হুগোর অনেক পারিসীয় বন্ধুরা আমাদের সেই বিখ্যাত কবি যেখানে জন্মেছেন সেই গৃহে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করেছেন।

বেসাসোঁতে আমি যখন অল্প সময়ের জন্যে গিয়েছিলাম, তখন আপনাদের সহরে এই বাড়িটি একজন আমাকে দেখিয়েছিল যা, আমার বিশ্বাস, অল্পই পরিচিত, মঁসিয়ে কাটুল মাঁদে ও আমি একটা পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেছি যা আপনার সম্মানিত পত্রিকাও নিজেরা চিন্তা করে দেখতে পারেন।

আমাদের থেকে দূরে বেসাসোঁ সহর যে তার কৃতী সন্তানকে নিজেই সম্মানের গৌরবে ভূষিত করতে চলেছে সে বড় আনন্দের কথা; কিন্তু আমাদের চিন্তার পূর্বাবির্ভাবের জন্যে আপনাকে বলবো যে আমাদের সহযোগিতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবেন না। আমরা সসম্মানে সেই মর্মরফলকটি আপনাকে দিতে চাই যাতে ভিক্টর হুগোর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত আছে।

এটি একজন বিখ্যাত ভাস্কর মঁসিয়ে গডেবস্কির সৃষ্টি যাঁকে প্রত্যেক বছর সালোঁতে তাঁর স্ট্যাচু ও বাস্টগুলির জন্যে জনসাধারণ প্রশংসা করে।

এই মুহূর্তে যখন আপনাকে লিখছি, তখন কাজটি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। প্রধান সম্পাদকমশাই, আমি প্রার্থনা করি যে আপনার পরবর্তী সংখ্যায় এই চিঠিটি প্রকাশ করবেন, এবং আমাদের জানাবেন আমরা মঁসিয়ে গডেবস্কিকে তাঁর কাজটা চালিয়ে যেতে বা থামিয়ে দিতে বলবো কি না।

৬. আর্তুর র‍্যাঁবো ১৮৫৪-৯১ থেওডর দ বাঁভিলকে[১] ২৪ মে ১৮৭০

আমরা এখন প্রেমের মাসে পৌঁছেছি, আমার বয়স হল সতেরো।[২] কেউ কেউ যেমন বলে—আশায় ভরা স্বপ্নের বয়সকাল,—এবং আমি সুরু করেছি, আমি সরস্বতীর অঙ্গুলিস্পৃষ্ট শিশু—মাফ করবেন কথাটা যদি নেহাৎ বাজে মনে হয়,—যে আমার কবিজনোচিত বস্তুগুলিকে—আমার উত্তম বিশ্বাস, আশা, অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করবে,—আমি একেই বসন্তঋতু বলি।

এই কবিতা থেকেই যদি কয়েকটি আপনাকে পাঠাই,—এবং নামী প্রকাশক আলফ লমেরের মাধ্যমে—যেহেতু আমি সব কবিকেই, সব পার্নাসিয়েনদেরই ভালবাসি—যারা আদর্শ সৌন্দর্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত—এবং কবি বলতে পার্নাসিয়েনই বোঝায়; খুব সূক্ষ্মভাবেই আমি আপনার মধ্যে র‍ঁসারের একজন উত্তরাধিকারীকে, ১৮৩০-এর মহারথীদের একজন ভ্রাতৃস্থানীয়কে, একজন প্রকৃত রোমান্টিক, একজন প্রকৃত কবিকেই প্রশংসা করি। সেইজন্যেই এই। আমার আশঙ্কা, এগুলি প্রলাপ, তাই নয় কি, কিন্তু অবশেষে ?··

—আঁসিও, কাগজের সম্পাদকমশাইরা, আমি পার্নাসিয়েন হবো।

—আমি জানি না আমার মধ্যে কী আছে—যা প্রকাশিত হতে চায়···প্রিয় মাস্টার, আমি শপথ করছি যে আমি সর্বদা দুই দেবীর আরাধনা করবো, তাঁরা শিল্প ও স্বাধীনতা।

এই কবিতাগুলি পড়ার সময় বেশি জিভ ভ্যাঙাবেন না···প্রিয় মাস্টার, আপনি যদি 'পার্নাসিয়েনে' আমার 'ক্রিডো ইন উনাম' রচনাটির স্থান করে দেন তাহলে আমি আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে যাবো। 'পার্নাসের' শেষতম সংখ্যায় আমার রচনা থাকা উচিত : এটা কবিদের মতবাদ হয়ে যাবে। হায় উদ্বেল উচ্চাশা!

১ বাঁভিল 'ল পারনাস কঁটেমপর‍্যাঁ'র নির্বাচকমণ্ডলীতে ছিলেন

২ তখন র‍্যাঁবোর বয়স প্রকৃতপক্ষে ১৫ বছর ৭ মাস ছিল

৭. ওয়াল্ট হুইটম্যান ১৮১৯-৯২ উইলিয়াম ডি. ও'কনরকে ৬ জানুয়ারি ১৮৬৫

…আগে যেমন বলেছি 'ড্রাম-ট্যাপস' খুব সম্ভব এই শীতে প্রকাশিত হবে। এখন ঠিক করা হয়ে গেছে, এবং একটা সম্পূর্ণ কপি ছাপাব জন্যে প্রস্তুত। আমি অবশেষে অনুভব করছি, এবং এই প্রথম বিনা দ্বিধায় অনুভব করছি যে এর সম্পর্কে আমি পরিতৃপ্ত, আমি এই ভেবে তুষ্ট যে এ এখন উপস্থিত শব্দ ও যতিচিহ্নসমেত পৃথিবীর দরবারে যেতে পারে। আমার মতে এটি 'লীভস অব গ্রাসের' চেয়ে ভাল—শিল্পকর্ম হিসেবে এটি আরো পূর্ণাঙ্গ, সব দিকে সুপরিমিত, এবং এর আবেগের সেই অপরিহার্য গুণ আছে যার ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে এটা বাধাহীন উদ্বেলতা মনে হলেও প্রকৃত শিল্পী এর সংযম লক্ষ করতে পারবেন। আমি 'ড্রাম-ট্যাপসের' জন্যে সম্ভবত এই কারণে সবচেয়ে সুখী যে যে-কর্তব্য করার উচ্চাশা আমি পোষণ করেছিলাম তা এখন করা গেছে—আমি একটি কবিতার মাধ্যমে (যেমন ভাবে পারি তেমনভাবে) আশানিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত, পরিবর্তনমুখর, পুঞ্জীভূত ঘূর্ণি ও উচ্চকিত স্বরে পূর্ণ এই যে সময় ও পরিবেশে আমরা ভাসছি (তবু সবার উপরে অদৃশ্য হাতের স্পর্শে যার একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য ও চিন্তার রূপ আছে) তার ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ করেছি—যেখানে আহত ও বিক্ষুব্ধ সুন্দর যুবাপুরুষদের অভূতপূর্ব মনোব্যথা, সামগ্রিক মৃত্যু ও বিমর্ষতার মাধ্যমে সব কিছুই কখনো কখনো যেন রক্তের রং, রক্তের নির্ঝর। বইটি সেকারণে অনন্য দুঃখে ভরা। (এই দিনগুলি যেমন, নয় কি?)—কিন্তু তবু এতে শিঙার বজ্রনির্ঘোষ, দামামার উচ্চনাদ রয়েছে ও তারই সঙ্গে সুমধুর সৌহার্দ্য ও মানবিক প্রীতির অন্তর্লীন সুর এই হট্টগোলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে যা প্রত্যেকটি বিরতির সময় শোনা যায়—সত্যিই, এর মধ্যে বিশ্বাস ও জয়ের ধ্বনিও রয়েছে।

'ড্রাম-ট্যাপস'-এ 'লীভস অব গ্রাসের' বিক্ষোভগুলি নেই। আমি 'লীভস অব গ্রাস' নিয়ে পরিতুষ্ট, এর বেশি অংশই যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমনি প্রকাশ করেছে, এটি কাটা-কাটা আত্মকথনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির সত্তা উন্মোচন করেছে, তা ছাড়া এটি আমেরিকায় ব্যবহারের জন্যে ব্যক্তিত্বের একটি বৃহৎ ভ্রূণ বা কঙ্কালকে চিহ্নিত করেছে ও ছড়িয়ে দিয়েছে,—যা পশ্চিমের দেশি আদর্শের উপযোগী—কিন্তু কিছু জিনিস আছে যা আমি পরবর্তী সংস্করণে সযত্নে তুলে দেব, এবং কিছু জিনিস আমি অনেকখানি বদলে দেব।

আমি বলে ফেলেছি যে 'ড্রাম-ট্যাপস'-কে আমি 'লীভস অব গ্রাসের' চেয়ে

উন্নততর মনে করি। সম্ভবত একথা আমি বলেছি শিল্পকর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে, বিষয়ের অধিকতর সহজ ও আকর্ষক স্বভাবের কথা ভেবে, এবং আরো একটা কারণে যে এর মধ্যে থেকে আমি ইচ্ছেমত সমস্ত বাড়তি জিনিস বাতিল করতে পেরেছি, শব্দের বাড়তি ব্যবহারের কথাই বলছি। আমি তেমনি একটি কবিতা লিখতে ভালবাসি যার মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করি যে তেমন কোন শব্দ নেই যা কবিতাটির বা আমার বক্তব্যের অপরিহার্য অংশ নয়।

তবুও 'লীভস অব গ্রাস' আমার প্রিয়, সর্বদাই আমার প্রিয়তম। যেন এটি আমার প্রথম সন্তান, যেন আমার জীবনের প্রথম আশা, সন্দেহের দুহিতা, এবং এর মধ্যে আমি সেই দিনগুলির প্রয়াস ও উচ্চাশা সংহত করেছি—সত্যিই, এখন দেখি যে, এখন লিখলে এর অনেক কিছুই আমি লিপিবদ্ধ করতাম না, কিন্তু তবু সেগুলিকে আমি অবশ্যই রেখে দেব, অন্তত এ-কারণে যে এগুলি বিগত পর্যায়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে।...

৮. রবার্ট ব্রাউনিং ১৮১২-৮৯ রিচার্ড মকটন মিলনেসকে ৭ জুলাই ১৮৬৩

আমি সুইনবার্ন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না, এবং তাকে আমি খুব পছন্দ করি : সে আমাকে সম্মান দেখিয়েছে এবং শুনেছি সে আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান —একথা আমি সত্যিই বিশ্বাস করি। তার রচনা সম্পর্কে বলতে পারি যে তার প্রথম বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর তার একখানি কবিতা যা আমি রসেটির কাছে অনেকদিন আগে দেখেছিলাম ও সেদিন রাতে সে নিজেই যেগুলো পড়েছিল সেগুলি ছাড়া আর একটি লাইনও আমি জানি না : সুতরাং, এইগুলো সম্পর্কেই আমার মতামত গড়ে উঠতে পারে। আমি ভেবেছিলাম ওগুলি নৈতিক ভুল যা যথেষ্ট বুদ্ধিবল প্রয়োগ করে ঠিক করা হয়েছে। ওগুলো আশুপ্রকাশ্য বইটির নমুনা অথবা কেবলমাত্র ব্যতিক্রমের উদাহরণ হতে পারে —আমি আশা করি সেরকমই কিছু হবে।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন সুইনবার্নের ক্ষমতা সম্পর্কে যখন আমার মতামত চাওয়া হল, তখন কী করবো না জেনে বলেছিলাম "তার প্রতিভা আছে এবং সে কবিতাও লিখেছে কিন্তু আমার মতে তার মধ্যে ভাল বলে আদৌ কিছু নেই"। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদেরও যে মত এক একথা আমি বলেছিলাম কারণ আমার নিজের এগিয়ে গিয়ে একজন তরুণ কবিকে এই চেরি-বাচিটা ছুঁড়ে মারতেও অনীহা ছিল।

ঈশ্বর জানেন আমি কেমন করে সেই অনীহা কাটিয়ে উঠেছি এবং সেই মনোভাব এত বয়সেও রাখতে পেরেছি (যে বয়স "উত্তম ও সুন্দরের সমস্ত ধারণাই হারিয়ে ফেলে")। তিরিশ বছর ধরে আমাকে নিজের একান্ত দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে সাধারণ্যে ও ব্যক্তিগত উৎসাহে যেরকম শিক্ষা দিতে হয়েছে তাতে আমি যদি কোন ছেলের হাতের ময়লা পরিষ্কার করা দরকার মনে করি ত আমায় ক্ষমা করা উচিত—কিন্তু আমি তা কল্পনা করি না। দুর্ভাগ্যবশত, সত্য সত্যই, এবং মাঝে মাঝে সেটা বলতেই হবে। এক্ষেত্রে আমার দুটি তিনটি কবিতার ওপর বিরূপ সমালোচনাকে—যেগুলো আমি একটা অসম্ভব পুরো প্রশংসার দাবির বিরুদ্ধে করেছিলাম—একটা সম্পূর্ণ বইয়ের ওপর, যাতে আমি যতদূর জানি হয়ত অনেক ভাল কবিতাও আছে—প্রয়োগ করে চ্যাপম্যান অন্যায় করেছেন ; কিন্তু যেহেতু তিনি যেসব জিনিসগুলির পরিপোষকতা করেন সেগুলির গুণ সম্পর্কে যথাসম্ভব সত্য বাচন করাই আমার অভ্যাস এবং যেহেতু তাঁর বিজ্ঞাপনে তাদের শিরোনামাগুলি অদৃশ্য হতে দেখি নি, সেকারণে আমি এই বলে শেষ করি যে তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাস ঢাকবার জন্যে আমার সাক্ষী মানতে চান।·

৯. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪-৮৩ রাজনারায়ণ বসুকে (১৮৬১ ?)

দয়া করে মেঘনাদ সম্পর্কে আমায় লিখে জানাও। আমি শ্বাস রোধ করে তোমার রায় শুনবো বলে অপেক্ষা করছি।

তুমি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আমার দারুণ জ্বর হয়েছিল এবং ছ সাত দিন শয্যাশায়ী ছিলাম। সে এক যুদ্ধ—মেঘনাদ আমায় শেষ করে না আমি মেঘনাদকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি জয়ী হয়েছি। তিনি মারা গেছেন, অর্থাৎ প্রায় ৭৫০ লাইনে আমি ৬ষ্ঠ সর্গ শেষ করেছি। তাঁকে মারতে আমায় অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে। যাই হোক, খুব শিগ্রি তুমি নিজেই সেটা বিচার করার সুযোগ পাবে।

কাব্যটি দিনে দিনে দারুণ জনপ্রিয় হচ্ছে। কেউ বলে এটা মিলটনের চেয়ে ভালো—কিন্তু ওসব বাজে কথা—মিলটনের চেয়ে কিছুই ভাল হতে পারে না ; কেউ বলে এটা কালিদাসের মত লাগে ; আমার তাতে আপত্তি নেই। ভার্জিল,

কালিদাস এবং টাসোর সমকক্ষ হওয়া আমি অসম্ভব মনে করি না। গৌরবোজ্জ্বল হলেও তাঁরা মরণশীল ; মিলটন ঐশ্বরিক।

হে বৃদ্ধ, তুমি যা ভাবো আমায় লিখে জানাও। লক্ষ লোকের উচ্চরোলের চেয়ে তোমার মত মূল্যবান।

আমি বুঝতে পারছি, অনেক হিন্দু মহিলা বইটা পড়ছেন আর চোখের জল ফেলছেন। তোমার স্ত্রীকেও বইটা পড়তে দিও।··

১০. এমিলি ডিকিনসন ১৮৩০-৮৬ টি. ডবলিউ. হিগিনসনকে মে ১৮৭৪

ভেবেছিলাম কেউ নিজেই কবিতা হয়ে গেলে কবিতা লিখতে পারে না, কিন্তু ভুলটা অনুধাবন করুন। এটা যেন বাড়ি যাওয়ার মত, সুন্দর ভাবনা-গুলিকে আবার দেখার মত, যা এতদিন নিষিদ্ধ ছিল—দেশপ্রেমিক যখন তাঁর 'জন্মভূমির' কথা বলেন তখন কি সেটা বুদ্ধিবৃত্তি? আপনি নিজে যার 'নিদারুণ মূল্য' দেন তা আমার উদ্ধৃত করতে ভয় লাগে।

আপনার পবিত্রতার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমি এটা এখনো পরীক্ষা করি নি।

জীবনধারণ করো—

জীবন থেকে নাও—

কিন্তু ছুঁয়ো না ও-হ্রদ কখনো—

আপনি দয়া করে আমার ফুল ও বইয়ের খোঁজ করেছেন—আমি সম্প্রতি খুব কমই পড়েছি—অস্তিত্বের বোঝা বইগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে।···বড় বড় কথাগুলি এত সরু যে সেগুলিকে আমরা সহজেই পেরোতে পারি—কিন্তু যার সেতু নেই তার গভীরতর জল আছে।···

১১. শার্ল বদল্যার ১৮২১-৬৭ মাদাম অপিককে ৯ জুলাই ১৮৫৭

কাব্যগ্রন্থটি (দু সপ্তাহ আগে প্রকাশিত) সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল যে প্রথমে তোমাকে এটা দেখাবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আবার চিন্তা করে দেখলাম যে আমার বিনয় কিংবা তোমার দুর্বিনীতভাব দুইই সমান অর্থহীন, যেহেতু শেষকালে তুমি বইটি সম্পর্কে লোকের মতামত জানতে

পারবে, অন্তত যে রিভিউগুলি আমি পাঠাব সেগুলি থেকেই। সাধারণ কাগজে ছাপা ১৩ কপি ও পাতলা কাগজে ছাপা ৪ কপি আমি পেয়েছি। শেষের একটি আমি তোমার জন্যে রেখে দিয়েছ, এবং এখনো যে সেটি পাও নি তার কারণ ওটি আমি বাঁধাতে চেয়েছিলাম। তুমি জানো সাহিত্য বা শিল্প যে কোন নৈতিক আদর্শ প্রচার করে এমন কথা আমি কখনও মা... ক'রি নি এবং আমার কাছে চিন্তার সৌন্দর্য ও স্টাইলই যথেষ্ট। কিন্তু এই বই, যার নাম 'ফ্লর দু মাল' সব কিছু বলে দেয়, তুমি দেখবে এটা একটি শীতল ও কঠিন সৌন্দর্যে আবৃত; এটা আবেগ ও প্রয়াসের সাহায্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। তা ছাড়া, এ সম্পর্কে সব বিরোধী উক্তিই এর ইতিবাচক গুণেরই নির্দেশ করে। বইটি লোকদের ক্রুদ্ধ করে। সত্যিই, আমি যে ভীতির উদ্রেক করতে চলেছি তাই দেখে বিমূঢ় হয়ে আমি ছাপানোর সময়েই বইটির এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিই। ওরা বলে আমার কিছুই নেই—না কল্পনা, না ফরাসী ভাষার জ্ঞান। আমি ঐ বেজন্মাদের সম্পর্কে কিছুই ভাবি না, এবং আমি জানি যে বইটি তার দোষগুণসমেত ভিক্টর হুগো, থেওফিল গতিয়ে, এমন কি বায়রনের কবিতার মতই সাহিত্যপাঠকের স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে। আমার একটি অনুরোধ: যেহেতু তুমি সর্বদাই এমন-দের সঙ্গে থাকো, দেখো যেন বইটি মাদমোজেল এমনের হাতে না পড়ে। যাজকমশাই, যাঁকে তুমি আপ্যায়ন করো, তাঁর সম্পর্কে বলি যে এটি তুমি তাঁকে দেখাতে পারো। তিনি ভাববেন আমি অধঃপাতে গেছি এবং তোমাকে বলতে সাহস করবেন না। গুজব শুনেছি যে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে, কিন্তু ওরকম কিছু হবে না। যে সরকারের সামনে প্যারীর ভয়ঙ্কর নির্বাচনের কাজ রয়েছে তার পক্ষে একজন পাগলের বিরুদ্ধে মামলা করার সময় নেই।

আমার দম্ভের শিশুসুলভ উৎসারের জন্যে সহস্র ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি হনফ্লরে যাওয়ার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেছি, কিন্তু সে-সম্পর্কে তোমায় কিছু বলতে সাহস করি নি। সমুদ্রতীরে প্রভূত কাজের মধ্যে আমার কুঁড়েমিকে ছিন্ন করবো ভেবেছি—সমস্ত হালকা ব্যস্ততা থেকে দূরে, হয় এডগার পো-র তৃতীয় খণ্ডের কাজে কিংবা আমার প্রথম নাটক রচনার কাজে ডুবে যাবো।

কিন্তু আমার যা কাজ তা যেখানে গ্রন্থাগার, ছাপা বই ও যাদুঘর নেই সেখানে করা যায়-না। প্রথমে আমি 'সৌন্দর্যের কৌতূহল', 'রাত্রির কবিতা' ও 'অহিফেনসেবীর স্বীকারোক্তি'টি শেষ করবো।

'রাত্রির কবিতা' (পরের নাম 'ছোট গদ্য কবিতা') 'দুই পৃথিবীর রিভিউ' পত্রিকার জন্যে; 'অহিফেনসেবন'টি পারীতে অজানা একজন বিখ্যাত লেখকের (ডিকুইনসির) রচনার নতুন অনুবাদ! এটি 'মনিটর' পত্রিকার জন্যে।···

১২. এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং ১৮০৬-৬১ মেরি রাসেল মিটফোর্ডকে

২০. ১. ১৮৪২

আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি এই গ্রীক কবিরা আর অ্যাথিনিয়ম পত্রিকা আমায় টানাটানি করছে। ·· ম্যাগাজিনের লেখা কিংবা উঁচুজাতের গদ্য লিখে কবিতাকে যেন বর্জন না করি একথা তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি শুনে সুখী হবে যে সে কাজ আমি চেষ্টা করলেও করতে পারতাম না। আমার যেটুকু ক্ষমতা তা ঐ কবিতাতেই—ওতে আমার ব্যক্তিগত সুখ, তার চেয়ে বেশি আমার ভালবাসা নিহিত। এমন কোনদিন আমার মনে পড়ে না যখন একে ভালবাসি নি—সেই ন বছর বয়সে শুয়ে-জেগে-থাকা ধরনের আবেগ দিয়ে আর তারও পরে প্রবল অনুভূতি দিয়ে একে ভালবেসেছি—যাকে আমার জীবনআন্দোলনকারী সমস্ত দুঃখও নাড়া দিতে পারে নি। এই মুহূর্তে একে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসি—এবং সম্ভব হলে এর জন্যে আমি আগের চেয়েও দিনরাত কাজ করতে প্রস্তুত···জনপ্রিয়তার জন্যে নয়, আমার যেটুকু ক্ষমতা তারই প্রকাশের জন্যে। আমার মননশীলতার এটাই লক্ষ্য—যদি বেঁচে থাকি এটা করবোই। যেরকম পরিশ্রমই করি না কেন কর্মপদ্ধতিতে তিক্ততা থাকবে না কারণ জনপ্রিয়তার জন্যে বা কোন উন্নত ধরনের যশের জন্যে আমি এটা করতে যাচ্ছি না, এটা কবিতারই জন্যে করতে যাচ্ছি—বরং আরো নম্র ও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে এটা আমি ভালবাসি বলেই করতে যাচ্ছি। প্রেম সব ব্যাপারেই সবচেয়ে নিরাপদ ও অক্লান্ত গতির নিয়ামক—এ বীরের কাজ করে।

ধর্মীয় কবিতা সম্পর্কে আমাদের কিছু মতপার্থক্য থাকতে পারে·· যদিও যে নমুনাগুলো এখন আছে সেগুলো সম্পর্কে নয়। তোমার সাহিত্যচিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার স্থির মতবাদ হল যে অল্পই পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে ··এবং শাতোব্রিয়াঁর পরিকল্পিত খৃস্টবাদের প্রতিভার মহত্তর প্রকাশ এখনো কাব্যিক মহিমা ও আলোকে বিকশিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ধর্মীয় কবিদের ব্যর্থতা

তাঁরা ধার্মিক বলে নয়, তাঁরা কবি নন বলে। খৃস্টের ধর্ম একান্তই কবিতা—মহিমান্বিত কবিতা। তোমার মতে মত মিলিয়ে আমি যেমন বলি যে কাব্যিক উৎসাহের জন্যে মানবিক উৎসাহের প্রয়োজন, তেমনি আমি আরো ধরে নিই যে মানবিক উৎসাহকে পরিপূর্ণ করতে গেলে ধর্মীয় উৎসাহের প্রয়োজন—যা বিশ্বের মানবতার মহান ও সদাপ্রভাবশীল উন্নতি ও কিরীট হিসেবে গণ্য।...[১]

ইতিমধ্যে, এই যে 'অ্যাথিনিয়ম'।.. একমাত্র একটি জিনিস নিশ্চিত যে আমি কবিতার ওপর নিরুৎসাহ হবো না। আর একটা জিনিসও নিশ্চিত—তা হল 'অ্যাথিনিয়ম'ও তাই। তুমি ঠিকই বলেছ—আমি বিজ্ঞান এড়িয়ে ধৈর্যধারণ করেছিলাম—কিন্তু তা আমি নিতে ও রাখতে পারি নি যখন আমি ওদের প্রত্যেককে রেড ইণ্ডিয়ান, ইংরেজ ভ্রমণকারী, বন্যজাতি, স্টীম-ইঞ্জিন ও সঙ্গীতযন্ত্র ইত্যাদি ব্যাপারে গভীর মনোযোগী দেখলাম,· এবং সবাই এক সঙ্গে ওপরের ঠোঁট বেঁকিয়ে—নিরুৎসাহ, উদাসীন, একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে গেল যখন একজন প্রকৃত কবি বা বিয়োগান্ত নাট্যকার প্রকৃতির অবদান সেই মহৎ চিন্তাগুলিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে লাগলো। এটা আগেও যেমন এখনো তেমন মন ভেঙে দেয়, মাথা নিচু করে দেয়। কেন না এখন সাহিত্যের মতই প্রকৃত কবি আছেন। মিঃ ব্রাউনিংকে ঐরকম হাল্কা, অর্ধ হাস্যকর, করুণ হাস্যকর নিচু ধরনের সমালোচনার চেয়ে অনেক বেশি ভালো সমালোচনা করা যেত।...ওর চেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে কি কিছু বলা যেত না? —সমালোচকের বা তাবৎ পৃথিবীর শ্রদ্ধার সমান! আমি নিচু স্বরেও মিঃ ব্রাউনিং সম্পর্কে ওরকম বলতাম না—ওরকম কথা নিজেকে বলতেও সাহস করতাম না।·[২]

১ 'অ্যাথিনিয়মে' ওঁকে কয়েকটি লেখা লিখতে হয়েছিল। তার মধ্যে একটি গ্রীক খৃষ্টীয় কবিদের সম্পর্কে প্রবন্ধ ছিল

২ ব্রাউনিং-এর 'পিপা পাসেস' সম্পর্কে অনতিবিরূপ সমালোচনা

১৩. জন কীটস ১৭৯৫-১৮২১ জন টেলরকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৮

আপনার অদলবদলে লেখাটির প্রভূত উন্নতি হয়েছে বলে মনে করি। এখন আপনার উল্লিখিত যতিচিহ্নের কথা ধরা যাক। 'সোবারলি' শব্দটির পরেই কমা হবে, এবং অন্য অংশটিতে 'কোয়ায়েট' শব্দটির পরে কমা বসবে। এই পরিবর্তন ও পরের সাবধানবাণীর জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। *আমার

কবিতা পড়তে কাউকে যদি সংস্কারমুক্ত হতে হয় ত সে আমার পক্ষে বড় দুঃখের কথা। কোন একটি অংশের মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনার চেয়ে এটি আমায় বেশি আঘাত করে। 'এণ্ডিমিয়নে' সম্ভবত আমি এক শিক্ষানবিশী থেকে আর এক শিক্ষানবিশীতে উপনীত হয়েছি। কবিতায় আমার কয়েকটি মূল সূত্র আছে, এবং আপনি দেখবেন আমি তাদের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কতদূরে আছি :

১. আমি মনে করি কবিতা অসাধারণত্ব নয়, সূক্ষ্ম অতিরেকের সাহায্যেই চমকে দেবে ; পড়লে পাঠকের মনে হবে যে তিনি তাঁর মহত্তম চিন্তার ভাষাই শুনছেন, যেন এটি তাঁর স্মৃতিরই প্রকাশ।

২. এর সৌন্দর্যের স্পর্শ কখনোই মধ্যপথে থেমে যাবে না যাতে পাঠক বিস্মিত হয় কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। চিত্রকল্পের উদয়, অগ্রসর ও অস্ত তার কাছে সূর্যের মতই স্বাভাবিকভাবে আবির্ভূত হবে, তার ওপর কিরণসম্পাত করবে এবং ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে, যদিও মহত্ত্বের বশে গোধূলিআলোয় তাকে আপ্লুত করে যাবে। কিন্তু কবিতা লেখার চেয়ে কবিতা কেমন হবে সেকথা চিন্তা করা অনেক সহজ।

এই থেকেই আমার আর একটি মূল সূত্র হল—গাছের পাতার মত স্বাভাবিক-ভাবে যদি কবিতার আবির্ভাব না হয়, তাহলে তার আবির্ভাব আদৌ না হওয়াই ভালো। আমার রচনায় যাই থাক না কেন, আমি নতুন কোন রচনায় 'আগুনের কবিতা তুমি জাগো' না বলে থাকতে পারি না। যদি 'এণ্ডিমিয়ন' আমার পথিকৃৎ হয়, তাহলে আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি শেক্সপীয়র পড়তে পারি এবং তাঁকে তাঁর গভীরে বুঝতে পারি, এবং আমি নিশ্চিত জানি যে আমার অনেক বন্ধু আছে যারা আমার ব্যর্থতায় আমার জীবন ও মেজাজের যে কোন পরিবর্তনে গর্ব নয়, নম্রতাকেই দায়ী করবে —দায়ী করবে আমি যে মহৎ কবিদের পাখার তলায় মাথা নিচু করে আছি তার জন্যে, আমার কবিতার প্রশংসা হয় নি বলে সেই তিক্ততার জন্যে নয়। 'এণ্ডিমিয়ন' ছাপাবার জন্যে আমি উদগ্রীব যাতে ওর কথা ভুলে গিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। তৃতীয় অধ্যায়টি কপি করেছি, চতুর্থে হাত দিয়েছি। আমি দেখবো যাতে মুদ্রাকর আমায় বেশি জড়িয়ে না ফেলে। পার্সি স্ট্রীটকে আমার কথা বলবেন।···

পুঃ খুব শিগ্রি আপনাকে একটি ছোট ভূমিকা লিখে পাঠাচ্ছি।

১৪. উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৭৭০-১৮৫০ লেডি বোমোণ্টকে ৩ জুন ১৮০৬

বাড়িতে (গ্রাসমিয়ার) পৌছোনোর পর আমার বেশির ভাগ সময়ই ঘরের বাইরে কেটেছে, অনেকটাই লেকের ধারের এক বনে যে জায়গাটা আপনার ভাল লাগবে। আমি প্রেমগুঞ্জন না করলেও কাব্যলক্ষ্মী সেখানে একদিন সকালে আমার কাছে এসেছিলেন এবং কয়েকটি কবিতা আমাকে গুণগুণ করে শুনিয়েছিলেন যাতে আমি গ্রোসভেনর স্কয়্যারকে ভুলতে পারি নি, কারণ আপনি জানেন ওটা শেষ হয়নি বলে আমি আবার ধুয়ো ধরতে পারি।…

মিঃ প্রাইস আমাকে অত্যন্ত বিনীত একখানি চিঠি লিখেছেন, মহৎ ('সাব্লাইম') সম্পর্কে আমি যা বলেছি তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে।… তিনি আমাকে ফক্সলিতে যাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, এবং ওয়াই নদীর পার্শ্ববর্তী দৃশ্যাদি বর্ণনা করে প্রলুব্ধ করেছেন?

১৫. পার্সি বিশি শেলি ১৭৯২-১৮২২ জোসেফ সেভার্নকে ২৯ নভেম্বর ১৮২১

বেচারা কীটসের ওপর শোকগাথাটি পাঠালাম—আমার ইচ্ছে এটি আপনি গ্রহণযোগ্য মনে করবেন। ভূমিকা পড়েই বুঝতে পারবেন তার শেষ সময়ের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়ার আগেই আমি এটি লিখেছিলাম, এখনো পর্যন্ত আমি যা জানি তা সবই এক বন্ধুর কাছে শুনেছি যে কর্নেল ফিনচের কাছ থেকে সব খবর সংগ্রহ করেছে ; তার প্রতি আপনার আচরণ যেমন দাবি করে তেমনি আমার অনুভব অনুযায়ী আমি শ্রদ্ধা ও স্তুতি প্রকাশ করতে সাহস করেছি।

তার অলৌকিক প্রতিভা সত্ত্বেও কীটস কখনো জনপ্রিয় কবি হয় নি, হবেও না ; তার মনের আশ্চর্য ফসলগুলি এখনও পর্যন্ত যেরকম অবহেলার অন্ধকারে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন তা সেই লেখকের পক্ষে দূর করা অসম্ভব যার কবিতা যদিও কয়েকটি বিশেষ গুণে কীটসের কবিতা থেকে আলাদা, তবু অন্তত একটি আকস্মিক ব্যাপারে মেলে—তা হল জনপ্রিয়তার অভাব।

সেকারণে আমার অল্পই আশা যে যে-কবিতাটি পাঠালাম তা আদৌ কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করবে কি না, তার রচনার বিদগ্ধ আলোচনা যে একটি পাঠকও পড়বে তা আমার মনে হয় না। এই বাধাগুলি না থাকলে তার

অবশিষ্ট রচনাগুলি নিয়ে তার জীবনী ও সমালোচনাসহ একটি সংকলন বার করার ইচ্ছে আমার ছিল। সে কি কবিতা বা যে কোন ধরনের কোন লেখা রেখে গেছে, সেগুলো কার কাছে আছে? এসম্পর্কে খবর দিয়ে আপনি আশা করি আমাকে বাধিত করবেন।

যে ছবিটি আপনি দেবেন বলে প্রতিশ্রুত তার জন্যে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই : আমি সেটিকে অতীতের পবিত্রতম স্মারক বলেই মনে করবো। আমার কথা বলি, আমি যখন শেষবার কীটসকে বন্ধুবর লে হাণ্টের ওখানে দেখি তখন আমি ভাবি নি যে আমি তারও পরে বেঁচে থাকবো।...

১৬. জর্জ নোয়েল গর্ডন বায়রন ১৭৮৮-১৮২৪ পার্সি বিশি শেলিকে

২৬. ৪. ১৮২১

..কীটসের সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন তা পড়ে আমি মর্মাহত— ব্যাপারটা কি সত্যি? আমি জানতাম না সমালোচনা এত প্রাণঘাতী হতে পারে। তার কৃতি সম্পর্কে আপনার ও আমার মতামতের মূল পার্থক্য থাকলেও, আমি অপ্রয়োজনীয় বেদনাকে এত ভয় করি যে আমি তাকে এরকম-ভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে পার্নাসাসের সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন দেখতেই চাইতাম, হায় বেচারা! অপরিমিত আত্মপ্রীতির জন্যে সে সম্ভবত খুব সুখী ছিল না। আমি 'কোয়ার্টাবলি'তে 'এণ্ডিমিয়নের' রিভিউ পড়েছি। লেখাটা তীক্ষ্ণ, কিন্তু ঐ পত্রিকা ও আরো অনেক পত্রিকায় আরো অনেকের সম্পর্কে যেরকম তীক্ষ্ণ রিভিউ বেরোয় সেরকম তীক্ষ্ণ অবশ্যই নয়।

আমার প্রথম কবিতা সম্পর্কে 'এডিনবরার' বক্তব্যে আমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল মনে পড়ছে, দারুণ ক্রোধ, তারপর প্রতিরোধ এবং মনের মুক্তি জন্মেছিল—কিন্তু অসহায়তা বা নৈরাশ্য জন্মায় নি। স্বীকার করি ওগুলি সৌহার্দ্যের অনুভূতি নয় কিন্তু এই হট্টগোলের পৃথিবীতে, বিশেষ করে লেখার ব্যাপারে আখড়ায় প্রবেশের আগে একটি লোককে তার প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিমাপ নিতে হবে।...

আপনি ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যধারা সম্পর্কে আমার মতামত জানেন। আপনার কাব্যসম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণার কথাও আপনি জানেন,—কেন না আপনার কাব্য কোন গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। আমি 'সেনসি' পড়েছি—কিন্তু

বিষয়বস্তুটি একান্তই অনাটকীয় মনে করা ছাড়াও আমি আমাদের পুরনো নাট্যকারদের আদর্শ বলে প্রশংসা করতে পারি না। এযাবৎ ইংরেজদের যে আদৌ কোন নাটক ছিল একথা আমি অস্বীকার করি। যাই হোক, আপনার 'সেনসি'তে শক্তি ও কাব্যগুণের পরিচয় আছে। আমার নাটক সম্পর্কে একথাই বলবো যে আপনার নাটক সম্পর্কে আমি যেমন খোলাখুলি আলোচনা করেছি আমার সম্পর্কেও তেমন আলোচনা করে শোধ নিন।

আপনার 'প্রমিথিউস' আমি এখনো পাই নি, যদিও সেটি দেখতে ইচ্ছে করছে। আমার বই সম্পর্কে কোন কথা শুনি নি, এবং জানিও না এখন প্রকাশিত হয়েছে কি না। আমি পোপ-বিতর্কের ওপর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছি যেটি আপনার পছন্দ হবে না। যদি আমি জানতাম যে কীটস মারা গেছে—কিংবা সে জীবিত আছে ও অত অভিমানী--তাহলে তার কবিতা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আমি বাদ দিতাম, পোপের ওপর তার আক্রমণের ফলে এবং তার লেখার ধরন আমার পছন্দ না হওয়ার জন্যে আমি যা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আপনি আমাকে একটি মহৎ কবিতা লিখতে বলেছেন—কিন্তু আমার সেরকম কোন ইচ্ছে বা ক্ষমতা নেই। যতই বয়স বাড়ছে, ততই আমার জীবনের উৎসাহব্যঞ্জক শক্তির ওপর—জীবনের প্রতি নয়, কারণ এটিকে আমরা সহজাত প্রবৃত্তির বশেই ভালবাসি—ঔদাসীন্য বেড়ে চলেছে। তাছাড়া ইটালিয়ানদের সাম্প্রতিক পরাজয় নানাকারণে আমাকে নিরাশ করেছে—কতকগুলি কারণ সামাজিক, কতকগুলি ব্যক্তিগত। শ্রীমতী শেলিকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।···

১৭. টমাস গ্রে ১৭১৬-৭১ ওয়ালপোলকে ১৭ মার্চ ১৭৭১

···ভলটেয়ারের 'ক্র্যাম্ব রেককটা'[১] যিনি হজম করতে পারেন তাঁর উদর নিশ্চয়ই খুব সুস্থ। নাস্তিক্য কুৎসিত খাদ্য, যদিও ফ্রান্সের সমস্ত রাঁধুনীই একযোগে এর থেকে নতুন আহার্য তৈরি করছেন। আত্মা বলতে যা বোঝায় তা সম্ভবত কন্টিনেন্টে নেইই; কিন্তু আমি মনে করি আমাদের সে-জিনিস ইংল্যাণ্ডে আছে। উদাহরণস্বরূপ, আমার বিশ্বাস শেক্সপীয়রের সে-জিনিস

১ জুভেনাল ৭,১৫৪

অনেকগুলিই ছিল। ইহুদিদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য (যদিও তারা শুয়োরের মাংস খায় না) হল, আমি তাদের ভালবাসি কেন না তারা ভলটেয়ারের চেয়েও ভালো খৃস্টান।...

১৮. উইলিয়ম কুপার ১৭৩১-১৮৩০ জনসনকে ৩ মার্চ ১৭৯০

তুমি ঈর্ষার যোগ্য. কেন না তুমি কখনো পৃথিবীর অন্যতম মজার গল্পগ্রন্থ 'ওডিসি' পড়ো নি। লংগিনাস এর বিরুদ্ধে যাই ইংগিত করে থাকুন না কেন, এর মধ্যে পৃথিবীর সূক্ষ্মতম কাব্যের অনেকটাই পাওয়া যাবে। তাঁর 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসির' সঙ্গে মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্নের তুলনা চমৎকার হলেও, আমার মতে সঠিক নয়। এর চমৎকারিত্বের বোধই তাঁর বিচার নষ্ট করেছে, না হলে তাঁর মত বিবেচক হোমরপাঠকের এমন করা সম্ভব ছিল না। শেষ গ্রন্থটিতে (ওডিসিতে) আমি কোন নষ্ট-যোগ্যতার আভাস পাই নি, বয়সের ছাপও দেখি নি; অপর পক্ষে, আমি নিশ্চিত যে হোমর যদি যৌবনে 'ওডিসি' লিখতেন তাহলে এর চেয়ে ভালো কখনোই লিখতে পারতেন না; এবং ইলিয়াডও যদি বৃদ্ধ বয়সে লিখতেন, তাহলে যা লিখেছেন তাইই লিখতেন।...

১৯. য়োহান ভোলফগাং ফন গোয়েটে ১৭৪৯-১৮৩২ শিলারকে ২২ জুন ১৭৯৭

আমার বর্তমান অস্থৈর্যের মধ্যে যেহেতু কিছু করা একান্ত দরকার, সেকারণে আমি 'ফাউস্ট'এর কাজে লাগবো মনস্থ করেছি—শেষ না করলেও অন্তত যেটুকু ছাপা হয়েছে সেটুকু ভেঙে ফেলে সম্ভসমাপ্ত বা উদ্ভাবিত অংশের সঙ্গে মিশিয়ে বড় বড় খণ্ডে সেগুলি সাজাবো; আমি নিশ্চিত যে ঐভাবেই আমি নাটকটিকে —যা এখন শুধু একটি চিন্তা মাত্র—বাস্তবে রূপায়িত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমি এখন এই ভাবধারা গ্রহণ করেছি এবং সেটিকে প্রকাশ করবো ভেবেছি। আমার ইচ্ছে তুমি ব্যাপারটা তোমার কোন বিনিদ্র রজনীতে আগাগোড়া ভেবে দেখো ও সবটা থেকে তুমি কী চাও আমায় জানিও— এভাবেই তুমি এক প্রকৃত ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত আমার স্বপ্নগুলিকে বিরত করতে ও ব্যাখ্যা করতে পারো।

যেহেতু এই কবিতার বিভিন্ন অংশ—মেজাজের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের

হবে, যদিও তারা সমস্ত কবিতাটির মূল সুর ও বক্তব্যের অধীন হবে, এবং এ ছাড়া সমস্ত রচনাটিই যেহেতু মন্ময়, সেকারণে আমি যখন তখন এটা লিখতে পারি এবং সেভাবেই আমি কিছুটা কাজ করতে পেরেছি।

আমাদের গাথা-পাঠ আমাকে আবার এই কুয়াশাচ্ছন্ন পথে নিয়ে গেছে এবং একাধিক অর্থে পরিবেশ আমাকে আরো কিছুদিন এই পথে বিচরণ করার উপদেশ দিয়েছে।

২০. রবার্ট বার্নস ১৭৫৯-৯৬ হেনরি এর্সকিনকে ? ২২ জানুয়ারি ১৭৮২

আমার বিশ্বাস যে আঘাতে আমার অস্তিত্ব নির্মূল হয় একমাত্র সেই আঘাতেই দুটি জিনিস ধ্বংস হতে পারে: কবিতার প্রতি আমার সহজপ্রবণতা ও আত্মীয়তা এবং আপনার উদারতার প্রতি আমার ঋণবোধ।...মানুষ সাধারণত যা খুব প্রিয় বলে মনে করে তাই উপহার দিয়ে নিজের আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব অথবা প্রীতি জানায়। কবির চরিত্র সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞানও আছে সে জানে কবি তার কবিতার চেয়ে পৃথিবীতে আর কিছুর ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করে না—আমিও আমার সেরকম কিছু রচনা আপনাকে পাঠাচ্ছি।...প্রজ্বালক সামঞ্জস্য ও অনায়াস সৌকর্যের মিথ্যা আভ্যন্তরিতায় আমার তেমন আস্থা নেই। চারু লেখনের কর্কশ উপাদান অবশ্যই প্রতিভার অবদান; কিন্তু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে শিল্পকর্ম বেদনা, মনোযোগ ও পৌনঃপুনিক পরীক্ষার সম্মিলিত প্রয়াস।

২১. স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ ১৭৭২-১৮৩৪ জোসেফ কটনকে এপ্রিল ১৭৯৭

'মান্থ্লি রিভিউ'-এ ওরা যে সাদের কবিতা ও আমার ওডের রিভিউ করেছে তা আমি দেখেছি। রিভিউগুলি সত্ত্বেও, আমি, যে কি না রবার্ট সাদের প্রশংসায় অন্তরের গভীরে ঈর্ষাবোধ করি, এই সংখ্যাটির প্রকাশে দুঃখিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঠিকই দুঃখ করেছেন যে সাদে অনায়াসে খুব লেখে—সে কদাচিৎ তার আচ্ছন্নকারী দেবতার নীচে তার ভারনম্র বুকের ওঠানামা অনুভব করে'। যেরকম অবাধ গতিতে সে লেখে ও যেরকম সহজে সে নিজেকে খুশী করে তাতে সে অবশ্যই সাহিত্যকে নিজের কাছে লাভজনক করতে পারবে কিন্তু আমার

আশঙ্কা, ভবিষ্যতের কাছে তার মালা খুব বেমানান লাগবে—এই এখানে একটা সদাপ্রস্ফুট পারিজাত, আবার এর পাশেই কোন আগাছা, যার আয়ু এক ঘণ্টা, শুকনো, হলুদ, কিম্ভূতকিমাকার—প্রথমটির অপরূপ সৌন্দর্য খারাপ সঙ্গের ফলে অর্ধেক সৌন্দর্য হারাবে। তা ছাড়া আমার ভয় যে সে তার কবিতায় খুব বেশি কাহিনী ও ঘটনার ওপর নির্ভর করতে আরম্ভ করবে, সেই মহৎ কল্পনাগুলিকে অবহেলা করে যেগুলি কবির বৈশিষ্ট্য ও কবিকে চিহ্নিত করে। মিলটনের কাহিনীগুলি দু পাতায় বলা যেতে পারে—এই গুণেই মহাকাব্য (এপিক কবিতা) ছন্দে রচিত রোমান্স থেকে পৃথক। মিলটনের পদক্ষেপ দেখুন—তাঁর কঠিন প্রয়োগ, শ্রমসাধ্য পালিশ, গভীর আধিভৌতিক অনুসন্ধান, তাঁর মহান কবিতার প্রারম্ভে ঈশ্বরেব প্রতি প্রার্থনা, যা কিছু তাঁব বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতো সবই তাঁব নিত্যপ্রয়োজনীয় ছিল। কোন মহাকাব্য লিখতে আমি যে কুড়ি বছরের কম সময় নেব তা মনে হয় না। দশ দশ বছর ত উপাদান সংগ্রহ করতে ও আমাব মনকে বিশ্ববিজ্ঞানে শিক্ষিত করতে লাগবে। আমাকে একজন চলনসই গণিতবিদ হতে হবে, খুব ভাল করে যন্ত্রবিদ্যা, সরল পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র জানতে হবে—তারপরে সমস্ত ভ্রমণকাহিনী, সমুদ্রযাত্রা ও ইতিহাস থেকে একজন ও বহু মানুষের মন জানতে হবে। এভাবে আমার দশ বছব কাটবে—পরের পাঁচ বছর যাবে কবিতাটি লিখতে—এবং শেষ পাঁচ বছব যাবে এটি সংশোধন করতে।

এভাবেই আমি হয়ত সেই ঐশ্বরিক ও সঠিক-উচ্চার ধ্বনি না শুনে লিখবো না, সেই বিশাল মানসিকতাব সঙ্গেই কথা বলে যাবো যার জন্যে নক্ষত্রখচিত ও অম্লান মালাগুলি পূর্বনির্ধারিত।

শেষ কথা

কবিদের উপরিউদ্ধৃত চিঠিগুলিতে আমরা কাব্যপ্রকরণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাঁদের অন্তরঙ্গ মতামত শুনতে পাই। কবিতা যে একটা মনোযোগী এবং আবেগগম্ভীর আত্মপ্রকাশ সেকথা বারবার বলেছেন কবিরা।

পাস্তেরনাক চিকোভানিকে লিখিত একটি পত্রে (৬ অক্টোবর ১৯৫৭) বলেছিলেন যে তিনিও মনে করেন কবিতায় উপমাবিহীন সরল ঋজু ভাষা বা অলঙ্কারবহুল ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যবিচার জরুরি নয় কারণ দুরকমের ভাষাই স্বতোৎসারিত। তিনি বলেছেন, পুশকিনের অনেক কবিতার ভাষা কথ্যভাষা

থেকেই নেওয়া হয়েছে যা শিল্পের মার্জিত ভাষার চেয়ে অনেক বেশি যথাযথ: এবং যা অলঙ্কারবহুল শব্দও সমানভাবে ব্যবহার করে। পাস্তেরনাক এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ঋজু উক্তি ও অলঙ্কার পরস্পর বিপরীতধর্মী নয়, বরং একই চিন্তাধারার বিভিন্ন সময়ের পর্যায়বিশেষ। তাঁর মতে কোন কবিতা তীক্ষ্ণ, গভীর, ভাবসমৃদ্ধ বা শক্তিশালী না হলে কবি শুধ সেটুকুই লিখতে পারেন যেটুকু ভাষার চরিত্র অনুযায়ী বা বাক্যের ব্যবহারে আপনা থেকেই কবির হাত থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যায় অনিচ্ছায়, অখণ্ডভাবে, তর্কাতীত আকস্মিকতায়। তিনি আরও বলেছেন, কোন কবিতার খসড়ায় শেষ স্পর্শ দেওয়ার জন্যে বা তাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে, নির্বাচনের কোন ভূমিকা নেই, শুধু শক্তির জোরেই কবিতার কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে প্রকাশ পায় এবং কবিতার নবীনতা ও স্বাভাবিকতার জন্যে তেমন ঘটনা বা আকস্মিকতা ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল।

ওয়ালেস স্টিভেন্‌স্ জোসেফ বেনেটকে একটি পত্রে (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫) জানান যে হুইটম্যান অনেক লোকের কাছেই জীবন্ত। তিনি যে-কবিতাগুলিতে অনেক বিষয়প্রধান বস্তুর সমাবেশ করেছেন, বিশেষত যে-বস্তুগুলির প্রত্যেকটি নিজেই কাব্যিক, সেগুলির এমন এক উপযোগিতা আছে যার ফলে সেই কবিতা অনেকের কাছেই যথেষ্ট শক্তি ও প্রাণের প্রকাশ বলে মনে হবে।

তাঁর মতে হুইটম্যান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, ঠিক এই পৃথিবীর মত যার একটি অংশ তিনি নিজেই। তাঁর 'ক্রসিং ব্রুকলিন ব্রিজ'-এ এই বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে। হুইটম্যানের প্রাণশক্তি দেখা যায় 'সং অব দি ব্রড এ্যাক্স', 'সং অব দি এক্সপোজিশন' প্রভৃতি কবিতায়—সেই সব কবিতাতেই দেখা যাবে তিনি কী কী জিনিসে গভীরভাবে আন্দোলিত হতেন।

তিনি আরও বলেছেন যে হুইটম্যানের সব রচনাই সমান গুণের নয়। অনেক সময় নিজের মত প্রকাশের জন্যে তিনি নিজেকে চালিত করেছেন। তাঁর সেই লেখাগুলিই ভাল, অতীব সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী যেগুলি আবেগের বেগে অবাধে স্বতোৎসারিত। ··

পল ভালেরি এক ব্যক্তিকে এক পত্রে (১৯৪২) লিখেছিলেন যে তাঁর এনাত্তর বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছেন কবিতা তথা সব শিল্পকলা সম্পর্কেই মতামত পর্যালোচনা রোমাঞ্চকর; নিষ্ঠাবান চিত্রশিল্পী যেমন সারা জীবন ধরে রং খোঁজেন, নিষ্ঠাবান কবিও তেমনি খোঁজেন কাব্য এবং তা কোন নির্ধারিত কর্ম

নয় ; নির্ধারিত কর্মের মধ্যে প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও উপায় থাকে। তিনি বলেছেন যে দেখতে হবে শিল্পরূপ যেন ফ্যাশন, রীতিবিহীনতা ও সময়ের প্রভাবের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, এবং সাময়িক সাফল্য, সমালোচক ও জনসাধারণের প্রশংসা কোন শিল্পকর্মেরই বিশেষ উপকার করে না কারণ সে-সবই অনিশ্চিত, পরিবর্তনশীল, মাঝে মাঝে মরণশীলও বটে। তিনি বলেছেন, কিছুই তাঁকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, সৃষ্টিকর্মে তিনি একই বিষয়ে নিজেকে পুনঃসৃষ্টি করতে পারেন—তাঁকে প্রাণচর্যা ছাড়া আর কিছুই বেশি জীবন্ত করে না।

এলিয়ট এজরা পাউণ্ডকে মজা করে লিখেছেন (২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) যে তাঁর 'এক মহিলার পট' কবিতার কথা শুনে ইতিমধ্যে আরো দু তিনজন মহিলা আবির্ভূত হয়েছেন যাঁরা এই কবিতাটি ছাপা হলে এর মডেল হিসেবে বসেছিলেন এমন দাবি করে পরস্পর লড়াই করবেন। তিনি দুঃখ করেছেন যে 'প্রায়াপিজম,' 'নার্সিসিজম' ইত্যাদি মঞ্জুর করা হয় না এবং এই নির্দোষ মিলটিকেও ডেকাডেণ্ট মনে করা হয় :

…pulled her stockings off
With a frightful cry of 'Hauptbahnhof" !!

এলিয়েটের শিল্পচিন্তার কিছু চুম্বকও পাওয়া যায় এখানে। তিনি বলেছেন যে বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন ও শূন্যে বাষ্পীভূত সৌন্দর্যতত্ত্বকে তিনি অবিশ্বাস ও ঘৃণা করেন। তিনি আশ্বস্ত যে পাউণ্ড সেরকম নন ; তাঁর পাউণ্ডের 'ভর্টেক্স' ('বৃত্ত')-এর ওপর রচনাটি ভাল লেগেছে। তাঁর মতে শিল্পীর নিজের প্রকরণসম্পর্কিত আলোচনার ওপর যত বেশি নজর দেওয়া যায় ততই ভাল ; যে শিল্প কারুর ভাল লাগে সেই শিল্প সম্পর্কেই সে কথা বলতে পারে। তাঁর মতে বুদ্ধিগ্রাহ্য বা 'ইজিচেয়ার' সৌন্দর্যতত্ত্ব বলে কিছু নেই, যে কিছু করতে চলেছে তারই কেবল সৌন্দর্যতত্ত্ব থাকতে পারে। তিনি লক্ষ করেছেন 'ভর্টিসিজম' (বৃত্তবাদ) কোন দর্শনতত্ত্ব নয়।

রবার্ট ফ্রস্ট লুই উনটারমেয়ারকে লেখেন (১৫ অক্টোবর ১৯১৯) বিবিধ বাস্তবতার মধ্যে অন্তত কয়েকটি না দেখে কেউ কোন শিল্পে সাফল্য অর্জন করে না। রোমান্সের প্রত্যেক ধরনের রূপই কোন না কোন ধরনের বাস্তবতার উৎসার। রোমান্টিকধর্মী ও বাস্তববাদীর মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রথমজন দ্বিতীয় জনের চেয়ে বেশি রোমান্টিক। যেখানে বাস্তববাদী ছেড়ে যায় সেখান থেকেই

সে সুরু করে। সে সুচারুতাকে আরো চারু করে এবং অবিরাম চারুতা প্রমানই তার কাজ। তার সুচারু স্পর্শ বহুকাল আর বোঝা না গেলেও সে সেই কাজ নিয়েই থাকে।

ডিলান টমাস ভেরনন ওয়াটকিনসকে এক পত্রে (৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) জানিয়েছেন যে ভেরননের 'মানা,' 'ব্যালাড,' 'দুঃখগুলি,' 'সূর্যাস্ত' প্রভৃতি কবিতাগুলি সফল কবিতা, ওয়েলসে তাঁর কবিতার কয়েকজন প্রশংসাও করেছে, বিশেষত 'সূর্যস্নানার্থী' কবিতাটি সেখানকার পাঠকদের মন ভরিয়েছে। ভেরননের প্রতি ডিলানের এই বন্ধুবাৎসল্য আজকাল সহসা অন্যত্র দেখা যায় না।

নিজের সম্পর্কে ডিলান বলেছেন যে তিনি কতকগুলো চাঁচাছোলা, যুক্তিহীন কবিতা লিখেছেন, সেগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই মিল এসে গেছে যদিও মিলের ওপর তাঁর আস্থা নেই।

এজরা পাউণ্ড ডবলিউ. এইচ ডি. রাউজকে এক পত্রে (৪ নভেম্বর ১৯৩৭) লিখেছেন যে স্বরের ওঠানামার গুরুত্বের ওপর অনুবাদের ভালমন্দ নির্ভর করে, তাতে সম্ভবত শব্দের পরিবর্তন দরকার করে না, শুধু যথেষ্ট স্বরবৈচিত্র্য ও বাক্যহিল্লোলের দরকার। তাঁর মতে স্বরশব্দ ও উচ্চারণের বিচিত্র গতি থাকা দরকার এবং সে-ব্যাপারে ফ্লবার, জেমস বা আর কেউ হোমারকে ছাড়াতে পারে নি; কিন্তু এসব করতে গেলে এক বা বহু জীবনের প্রকরণ আয়ত্ত করা দরকার।

তাঁর মতে অপভাষার (স্ল্যাং) ব্যবহার অসম্পূর্ণ প্রকরণের পরিচায়ক; অপভাষাব্যবহারকারী কথ্যভাষার প্রকৃত শব্দ শুনতে চান, কিন্তু তাৎক্ষণিকের ভাষা ব্যবহার করে শুধুমাত্র তার কাছাকাছি পৌঁছোতে পারেন। তিনি বলেন যে অজ্ঞ ব্যক্তি ভাবে যে সে কুৎসিত অপভাষা ব্যবহার করছে যখন সে প্রকৃত শেক্সপীয়রের ভাষাই ব্যবহার করছে, যেমন 'boosing' 'bowsing' ইত্যাদি।

ইয়েটস তাঁর এক পত্রে (২৬ জুলাই ১৯৩৬) ডরোথি ওয়েলেসলিকে জানিয়েছেন যে তাঁর মতে তাঁর 'নীলকান্তমণি' (লাপিস লাজুলি) কবিতাটি তাঁর সেই সময়কার কবিতাগুলির মধ্যে সর্বোত্তম। তিনি সেসময় তাঁর 'অক্সফোর্ড বুক অফ মডার্ন ভার্স' সংকলনটি সম্পাদনা করছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর সংকলনটি জনপ্রিয় কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে না, তিনি সামঞ্জস্যের চেহারা ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রত্যেক কবির কবিতা

দিয়েই তাঁর সংকলনটি সাজাতে চান। কে একজন 'প্রতিনিধিস্থানীয়' কবিতার সংকলনের দাবি করেছিল, কিন্তু ইয়েটস চাইছিলেন সামঞ্জস্যের প্রতিরূপ ফুটিয়ে তুলতে—সেকথা তিনি বলেছেন।

এই রকম আরো কত কবি তাঁদের কাব্যচিন্তা, কবিকর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক দিকের আলোচনা করে গেছেন তাঁদের পত্রাবলীতে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিককালে অমিয় চক্রবর্তীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সুচারু রচনা দেখা গেছে 'কবি ও কবিতা' পত্রিকার 'পত্রালি' শীর্ষক পত্র-সাহিত্যে—তার গদ্যভাষা নিপুণ, বক্তব্য ধারালো, হয়ত মাঝে মাঝে প্রবন্ধেরই নামান্তর।

মোট কথা, বিদেশে চিঠির সংকলন প্রকাশের যে বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে, সেরকম ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদনের পরে আমাদের দেশে তেমন আর গড়ে ওঠে নি। একেবারে সাম্প্রতিককালে চিঠি আর লিখছেই বা কে?—বাংলা কবিতা ও কবিরা ক্রমশই গোষ্ঠীগত, কিছু কলকাতায় নিজের নিজের গোষ্ঠীতে সঞ্চরমান, কিছু মফঃস্বলের লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের সঙ্গে কেন্দ্রীভূত। চিঠি লেখার সুদূরতা আর নেই; কবিতা প্রকাশের ব্যাপারেও গোষ্ঠীভুক্তি এবং লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের অন্তরঙ্গতা সুদূরতার সঙ্গে বিবাদীসম্পর্কে সম্পর্কিত। মুদ্রণ ও রচনার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আটপৌরে গৃহিণীপনার দাপটে প্রেমিক পত্রটি উবাও হয়ে যাচ্ছে।

কবিতা : দ্বিতীয় পাঠ

১. জীবন-মৃত্যু ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কপাটে আমার
হাওয়া নয়, তোমার আত্মার করাঘাত
বাইরে নয় তো অন্ধকার
আমার অতীত যেন ছিল সারা রাত।
কী দুর্জয় ভয়ে, মৃতা, কেঁপে উঠেছিল এই বুক!
তোমার মৃত্যুর দিন হ'তে
আমার এ আত্মার অসুখ।
দিন যায় জীবনের স্রোতে
সারা রাত মৃত্যু নিয়ে থাকি
বিনিদ্র, হঠাৎ ডেকে ওঠে ভস্ম হ'তে ভোর, পাখি।

১৯৬৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্রে নির্বাচন-যুদ্ধের সমসময়ে উপরিলিখিত কবিতাটি যাঁর—সেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য—রজনীগন্ধা-আচ্ছাদিত একটি পালঙ্কে শুয়ে সাদার্ন এভিনিউ-এর বিস্তীর্ণ পথ দিয়ে এসে কেওড়াতলার শ্মশানে নীত হলেন। রাজকুমারের মত ষাট বছরের সেই চিরযুবাটির বরতনুর কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না, যেমন ভুলতে পারছি না সেই তেজী ব্রাহ্মণের ঢাকুরিয়ার নির্জন প্রকোষ্ঠে আত্মনিবাসের কথা। একদা তাঁকেই দেখেছি কর্মব্যস্ত গণেশ এভিনিউ-এ—আবার দেখলাম শান্ত ঢাকুরিয়ায়। ঘরের এক কোণে একটি নাতিউচ্চ কাগজের স্তূপ দেখিয়ে একবার বলেছিলেন : ওর মধ্যে আমার অনেক কবিতা রইল, আমার মৃত্যুর পর ওগুলো এরা ব্যবহার করতে পারে।

তাঁর কবিতায় ইতিহাসচেতনার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে তাঁর মৃত্যুচেতনা। ইতিহাস যে জীবনমৃত্যুর এক নিরবচ্ছিন্ন লীলা সেই সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞা তাঁর প্রথম দিকের কবিতাতেও উপস্থিত। উপরিলিখিত কবিতাটি কিন্তু তাঁর পঞ্চাশোত্তরকালের রচনা যখন মন স্মৃতিভারাতুর আর দৃষ্টি মৃত্যুমুখী দার্শনিকতায় লীন হয়ে যায়।

পঞ্চাশোত্তরেও কিন্তু তাঁর মন ভেঙে পড়ে নি, জীবনের প্রতি বিশ্বাস

তাঁর অটুট, মৃত্যুর পশ্চাদ্‌পটে জীবন জাজ্জ্বল্যমান। এই কবিতাটিতে জীবনমৃত্যুর কাঙ্ক্ষণীয় সহাবস্থানে একজন মানুষ কিংবা প্রেমিকের জীবনসঙ্গীতই ধ্বনিত হয়েছে। কপাটে যে হাওয়া লাগছে—সে কপাট হয়ত সমাজের বন্ধন কিংবা জীবনমৃত্যুর আপাতবিচ্ছেদের গণ্ডী—তা মৃত প্রেমিকারই আত্মার করাঘাত, অচরিতার্থ প্রেমের নিষ্ফল হাহাকার। সেই অন্ধকারে কপাটের বাইরে যে দাঁড়িয়েছিল সে বক্তারই অতীত প্রেমের স্মৃতি, সেই অচরিতার্থ, অপূর্ণ প্রেমের বেদনা। আর সেই অতীত স্মৃতির বেদনায় ভীত, ত্রস্ত বক্তা কেঁপে উঠেছিলেন। প্রেমিকার মৃত্যুর পর থেকেই বক্তার হৃদয়ে 'গভীর গভীরতর অসুখ'। জীবনের স্রোতে সারারাত বিনিদ্র মৃত্যুমগ্ন হয়ে কাটিয়েছেন তিনি—তবু আশা আছে ফিনিক্স পাখির মত ভস্ম থেকে আবার জীবনের, প্রেমের, বিশ্বাসের আবির্ভাব ঘটবে। আলোচ্য কবিতায় যে তীব্রতা পুঞ্জীভূত হয়েছে তা যে কোন সৎ কবিতায় আশা করা যায়। মাত্র দশটি পংক্তিতে সংযত ক্লাসিক দার্ঢ্যে জীবনমৃত্যুর এক বিস্তীর্ণ চিন্তাধারাকে আটকে রাখা হয়েছে—যেন ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো। কিন্তু ভার নেই, চাপ নেই—জীবনের পাখিই আবার অর্গলমুক্ত হয়ে, ভস্মের বাশি থেকে উত্থিত হয়ে ডেকে উঠছে, ঘুম ভাঙাচ্ছে—এমন বিশ্বাসের কবিতা যিনি লিখেছেন তাঁকে জীবন-প্রেমিক ছাড়া আর কী বলবো।

২. আশ্চর্য ভাতের গন্ধ ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজও ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।
আর আমরা সারা রাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,
প্রার্থনায়, সারা রাত।

তাঁর অসংখ্য সমাজমনস্ক এবং প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ছোট কবিতার মধ্যে আলোচ্য কবিতাটিতে কবি সোজাসুজি নীরক্ত ভিক্ষুক দেশের কথা বলেছেন। প্রথম তিনটি পংক্তিতে ভাত রাঁধা, ভাত বাড়া, ভাত খাওয়ার মত সহজ কাজও অনেকের কাছে দুঃসাধ্য যারা তারই জন্যে শেষ তিনটি পংক্তিতে জেগে থাকে এবং প্রার্থনা করে কবে তাদের দুটি অন্ন জুটবে। প্রতিদিনের

এই ভাতের জোগানই ত মানুষের প্রধান কৃত্য—এর সঙ্গে অবশ্যই ভাত রাঁধা-বাড়ায় বাংলার রমণীর মমতার হাত মনে পড়ে। বাংলার দুর্ভিক্ষ উপলব্ধি করার জন্যে নব্য ফিল্মগুলি দেখার আগে এই কবিতার পয়ারের ধীর গতি প্রত্যেক পাঠককেই নিজের দিকে তাকাবার একটা সুযোগ দেবে! বাঙালী ত দুর্ভিক্ষের সামনে বারবার চুপ করে থেকেছে, লাখে লাখে মরেছে।

৩. রেস্তোঁরা (অংশ) ॥ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

খাদ্যাভাব নিয়ে নয় ক্রীস্টিন কীলার প্রসঙ্গেই
একটি টেবিলে কটি যুবকের মুখ
পরম সন্তোষে সমাহিত।…
তিনটি ভিক্ষুক ছেলে বাইরের অন্ধকার থেকে
বিষণ্ণ দৃষ্টির শরে বিদ্ধ করে আলোকিত ঘর॥

আলোচ্য কবিতায় কবি প্রজন্ম-ব্যবধান সম্পর্কে অবহিত। কয়েকটি যুবক যে ব্রিটেনের 'বিনোদিনী'র কথা বলে রেস্তোঁরায় হুল্লোড় করছে সেটা তাঁর সময়ের যৌবনের পরিপ্রেক্ষিতে বেদনাদায়ক। এই হুল্লোড়ের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি ভিক্ষুক, সমাজের উদ্বৃত্ত আবর্জনা। বর্তমান সমাজের চিত্র বর্ণনা করেছেন তিনি—সারা পৃথিবীতেই ত এই, একদিকে কালো টাকার বাড়ি গাড়ি, অন্যদিকে ভিক্ষুক, এবং অবশ্যই ঐ 'হিপি', বিশ্বাসহীন, বিদ্রোহী যুবকেরা। কবি এরই বর্ণনায় মুখর, ইতিহাস যারা গড়ে তারা ভাবুক কেন এমন হল!

৪. সমর্পিত শৈশবে (অংশ) ॥ অরুণ ভট্টাচার্য

বালকটি উঠতে চাচ্ছে পাহাড়-চূড়ায়।
পাহাড়-চূড়ায় সব স্বপ্নগুলি অক্ষত থাকবে বলে
হয়ত পারবে সে তার শৈশবকে ধরে রাখতে দুচার সেকেণ্ড।
… …
গাঢ়বর্ণ পাহাড়টাকে বারবার জড়িয়ে ধরছে।

আমরা জীবনে আঘাতের সম্মুখীন হয়ে বারবার সুন্দর শৈশবে ফিরে যেতে চাই—যদিও সারা পৃথিবীতেই বহু শিশুরই (শিশুশ্রমিক সহ) শৈশব বলে বিশেষ কিছু নেই, আছে প্রতিবাদহীন চোখের জল। এই ধনতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা-

যাদের যুগে সারা বিশ্বের, বিশেষত তৃতীয় জগতের সংকট এটা। ব্যাপকার্থে মানুষের অসম্পূর্ণতার কথাই এখানে বিবৃত। সিসিফাসের মত সে যত বারই উঠতে চাইছে, ততবারই গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। তবু মানুষ তার সংগ্রামের আদর্শেই অন্য প্রাণীদের থেকে আলাদা।

৫. তারার তিমিরে (অংশ) ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বস্তুত যেহেতু আমি দেবব্রত নই, সুতরাং
দীর্ঘকাল আমি এই অন্ধকারে আছি।
মনুষ্যপ্রতিম, কিন্তু বিকলাঙ্গ, অগণন মুণ্ডহীন মাছি
যেখানে রক্তের স্রোতে ডুবেছে নীরবে।
মনে হয়, ভুলে গিয়ে ফুল, পাখি, পরিচিত বন্ধুদের নাম
আরো কিছুকাল এই অন্ধকারে থেকে যেতে হবে।

কবি যেমন তেমনি পৃথিবীর অনেকেই এখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদের ভীমের মনোবল নেই, তারা দেখতে মানুষের মত, কিন্তু খঞ্জ ও মুণ্ডহীন মাছির মত। সব ভালবাসার জিনিস ভুলে যেতে হবে এখন। 'ডোভার সৈকতের' আর্নল্ডের মতই প্রত্যেক মানুষ এখন বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে বাস করছে।

৬. মোষ-না-মানুষ (অংশ) ॥ মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

'মোষ, মোষ, একটা মোষ কাটা পড়েছে চাকার তলায়'
'বেশ বলেছেন আপনি, কোটপ্যাণ্ট জুতো পরে মোষ যাবে মরতে কী ভেবে?'
... ...
কোটপ্যাণ্ট জুতো পরা···ভদ্রলোক···কোমর চাকার নীচে···
মানুষ—নিশ্চিত জেনে থেমে গেলো তর্কযুদ্ধ শীতল কামনায়
কাল আবার শুরু হবে অকস্মাৎ দুধ যেই বন্ধ হবে পিতৃহীন একটি সংসারে।

কলকাতা থেকে তিনশো মাইল দূরের এক পাহাড়ী সহরে রেলের কারখানায় দশটা-পাঁচটার আপিস করেন পঞ্চাশের এই কবি। তিনি একটি তাৎক্ষণিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শিশু আজ এমনিতেই পরাজিত, লাঞ্ছিত—দুর্ঘটনা ঘটলে ত কথাই নেই!

নির্দেশিকা

পৃঃ ১১১-র ১০ম পংক্তিতে অনুবেখিত স্থলে 'স্থুলাক্ষর' পড়তে হবে।